রঞ্জন

+

+

বেঙ্গল পাবলিশার্স

কলিকাতা-১২

রঞ্জন-রচিত অন্যান্য

শীতে উপেক্ষিত

অন্যপূর্বা

বইয়ের বদলে

বিকল্প

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ব্লকম্যান

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

সাড়ে তিন টাকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীচরণকমলেষু

Things fall apart ; the centre cannot hold ; .

—W. B. Yeats

বিজ্ঞপ্তি

এই কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্রই কল্পিত। কোনো কোনো স্থানে কোনো সরকারী পদের উল্লেখ আছে, তা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে সেই সমস্ত পদের বর্তমান বা পূর্বতন অধিকারীদের সঙ্গে আমার উপন্যাসের চরিত্রের কিছুমাত্র যোগাযোগ আছে।

"রঞ্জন"

দীর্ঘ প্রবাসের পরে কলকাতা ফিরতে হোলো। ঠিক ফেরাও নয়, কলকাতা থেকে বর্মা যাওয়ার পথে একটা দিনের জন্যে থামা।

এই কলকাতার পুরানো আবাস যখন ছেড়ে গিয়েছিলেম, তখন সত্যি মনে ভেবে মরেছিলেম কি জানি কী হবে। এখন সেই চেনা বন্দরে ফিরে এসে আমার মতো হালভাঙা পালছেঁড়া নাবিকের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবার কথা। কিন্তু তা হোলো না। হাওড়াতে নেমেই মন নানা অজানা আশংকায় ভরে উঠল। কলকাতায় ফিরছি বটে, কিন্তু এতে কি খুঁজে পাব আমার প্রিয় সেই পুরানো কলকাতাকে? সন্দেহী স্বামী যেমন বিদেশে বাণিজ্যের পরে স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের পূর্বমুহূর্তে যুগপৎ আনন্দে অধীর ও সন্দিগ্ধতায় দগ্ধ হয়, তেমনি হাওড়া স্টেশনে পা পড়তেই আমার মন বলছিল—তা মন কী বলছিল মনই জানে।

কলকাতা এমনিতেই অসতী নগরী। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে আমি দীর্ঘ ষোলো বছর এই শহরে অতিবাহিত করেছি। এখানে আমি কেঁদেছি, কাঁদিয়েছি; হেসেছি, হাসিয়েছি। কিন্তু এক দিনের জন্যেও বাইরে গেলে ফিরে এসে কলকাতাকে মনে হয়েছে অর্ধ-অপরিচিতা। মনে হয়েছে, ঘর যেন পর হয়েছে। বাইরে থেকে কিছুমাত্র বদল হয়নি। তবু, ঘর আর বাড়ি থাকেনি। আমার মাত্র আটটি প্রহরের অনুপস্থিতির সুযোগে আমার বাড়ির অন্তর অন্তর্হিত হয়েছে। আছে শুধু ইঁটের 'পরে ইঁট।

মাঝের মানুষ-কীটগুলির যেন আরো বেশি বদল হয়েছে। ইস্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছি আজ তাদের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেলে চিনতে পারি, হয়তো ঈষৎ আনন্দিতও হই; কিন্তু পরমুহূর্তেই বিব্রত হয়ে ভাবি, চিনতে না পারলেই বুঝি ছিল ভালো। তাহলে আজকের লোকটির সঙ্গে পুরানো বন্ধুকে মিলিয়ে দেখতে হোতো না। আগেকার সৌহার্দ্যের স্মৃতিসম্বল কংকালটা আমাদের মধ্যে অনচ্ছ হয়ে দাঁড়াত না। অতীতস্মৃতি বর্তমানকে বিড়ম্বিত করত না। কালের ব্যবধানে সব মানুষগুলি আর জিনিসগুলি একেবারে বদ্‌লে গেছে, অপরিবর্তিত

অতএব অবাক হবার কিছু নেই যে জুনিয়র ব্যারিস্টরদের মধ্যে তার প্রতিশ্রুতি নাকি অপরিসীম। অনেক সীনিয়রেরও সে ঈর্ষার পাত্র। কলেজে সে ছিল তর্কসমিতির সম্পাদক। প্রত্যেক বিতর্কে সে ছিল প্রথম ও শেষ বক্তা। আমরা পরিহাস করে বলতেম যে তর্কসমিতির নাম যুক্তি-সমিতি হলে বিমলের নির্বাচন বাতিল হয়ে যেত, কিন্তু তখনও মনে মনে জানতেম যে সে ব্যারিস্টর হলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জজেরাও মানুষ তো! তাঁদের সাধ্য কী বিমলকে অগ্রাহ্য করেন? তার বক্তৃতায় আইন না থাক, আবেদন আছে। তার কথার কোয়ালিটি না থাক, কোয়াণ্টিটি আছে। তার বেশে ও ব্যবহারে এমন একটা কিছু বরাবর ছিল যার জন্যে সে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠত, সবাই তাকে সহজে ও সানন্দে মেনে নিত। বিমল সেই দুর্লভ সামান্য ব্যক্তিদের একজন যাঁদের উচ্চাভিলাষ সহকর্মীদের ঈর্ষার উদ্রেক করে না, পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় তারা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছে, উপমন্ত্রী হয়েছে, শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হবে। পথে তখন দেখা হলে লম্বা গাড়ি থেকে লম্বা গলা বাড়িয়ে কলেজের পহেলা বেঞ্চির সহপাঠীদের বলবে, "ভালোই হোলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এত কাজ যে, আজকাল আর সময় পাইনে নিজে সব কিছু দেখবার। তাই আমার একজন ভালো সেক্রেটারি চাই। তা তুমি যদি এখন—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ফোর্ চিয়ার্স্ ফর ডিমক্রেসি!!!!

আমার আত্মসম্মানের উপর এমনি কোনো চপেটাঘাতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেম, কিন্তু বিমল অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমায় আশ্বস্ত করল। মহা খুশি হয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এসে সে নিজেই কুলি ডেকে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে তার গাড়িতে বসাল। বলল, "একেই বলে এক ঢিলে দু'পাখি মারা!"

"একটা না হয় আমি, দ্বিতীয়টি কে?"

"না, তোমার কথা বলছিলুম না।" আমার মতো নগণ্য লোকের কথার জন্যে যে বিমলের সময় হবে না তা আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। আমি চুপ করে রইলেম। বিমলেরও আমার দিক থেকে প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল না। সে প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল, "আমার

সীনিয়র যাচ্ছেন রাঁচিতে—না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়, বেড়াতে। আমি তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলুম, কিন্তু কেবলই ভাবছিলুম যে হয়তো তিনি আমাকে অন্যান্য মোসাহেবদের সগোত্র মনে করবেন। এখন আর তা হোলো না। আমি যে তোমাকেই নিতে এসেছি, তাঁকে সেলাম জানাতে নয়, একথা অন্যান্য যারা এসেছিল তারা জেনেছে। সীনিয়রও খুশি, চাটুকারিতার অপবাদও নেই। একেই বলি ফিনেস্!" আত্মতৃপ্ত বিমল এবার নিঃশব্দে আত্মাভিনন্দনের আনন্দ উপভোগ করতে থাকল।

আমি ভাবলেম, এবার 'দড়ি ধরিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।' আমাকে আর বিমলের দরকার নেই। কিন্তু সর্বদাই আমি আমার বন্ধুদের প্রতি অন্যায় করি এই রকমের অমূলক সন্দেহ করে। সত্যি ওরা সবাই সব সময়েই তত স্বার্থপর নয়। বিমল একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "তারপর, তোমার খবর কী?"

"খবরের কাগজের লোকদের খবর থাকে না। তোমার খবর বলো, আমি শুনে পুণ্যবান হই।"

বিমলের মতো লোকদের চরিত্রের প্রধান একটি ত্রুটি এই যে তাদের রসবোধ বড়ো পরিমিত। ওরা নিজেদেরকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করে যে লঘু পরিহাসকেও ওরা গম্ভীরভাবে নেয়। আমার কৃত্রিম বিনয়ে তাই সে একটুও লজ্জিত হোলো না। বরং আবার নিজের কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হোলো। বলল, "আমার খবর তো কাগজেই দেখে থাকবে। ইলেকশনে হেরে গেলুম মাত্র হাজার কুড়ি ভোটের জন্যে।"

"মাত্র হাজার কুড়ি! আশা করি টাকার অঙ্ক সম্বন্ধেও অনুরূপ অবজ্ঞা তোমার সহজেই আসে।"

"তা একেবারে না খেয়ে মরছিনে ঈশ্বরের কৃপায়।"

"ঈশ্বর নয়, বলো মক্কেলদের কৃপায়।"

"আহা, ওই হোলো। মক্কেলদের জুটিয়ে দেয় কে ঈশ্বর ছাড়া?"

"বেচারী ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত তোমার দালালের চাকরি নিয়ে তাঁকে বাঁচতে হচ্ছে?"

আলাপের জন্যে ঈশ্বর বিরক্তিকর বিষয়। ঈশ্বরের কথা তাই তোলা

রইল। তাঁর চেয়েও বড়ো বিষয়, অর্থাৎ বিমলপ্রসঙ্গ, আবার আমাদের, অর্থাৎ বিমলের, কথা জোগাল।

"হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আজ ক্লাবে এসো, দেখবে কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

"হবে না, কেননা কলকাতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক দিন ঘুচে গেছে। কারো সঙ্গে পত্রালাপ পর্যন্ত নেই। এখন দেখলেও হয়তো কেউ আমায় চিনবে না।"

"যেমন আমি চিনতে পারিনি, না? এসো, দেখা হবে পুরানো বন্ধু সুরেনের সঙ্গে। অবিশ্যি ও যা স্নব, আমাদের মতো গরিব লোকদের চিনবে কিনা জানিনে। লেট হিম্ স্ট্যু ইন্ দি জ্যুস্ অব্ হিজ্ ওন্ কন্সীট। কিন্তু খুশি হবে বীরেনকে দেখে।" একটু থেমে বলল, "তার চেয়েও বেশি খুশি হবে বীরেনের স্ত্রীকে দেখে। হে হে।" এই ইতর রসিকতাগুলি বিমলের বিশেষত্ব। তার সঙ্গে হাসি জুড়ে সে এগুলিকে আরো বেশি ইতর করে তোলে। "তা তুমি তো ওর বিয়েতে ছিলে না, না?"

"না। গত দশ বছরে আমি একটি মাত্র বিয়েতে উপস্থিত থেকেছি। সেটিতে না থাকলে সে বিয়েই হতে পারত না। এসমস্ত অনুষ্ঠানে আমি আজকাল যাইনে। বীরেনের বেলায় অবিশ্যি চমৎকার অজুহাত ছিল। বিয়ে হচ্ছিল কলকাতায় আর আমি ছিলেম এগারো শ কুড়ি মাইল দূরে।"

"য়ু ডোণ্ট নো হোয়ট য়ু হ্যাভ মিস্ড্। বিয়ে বটে। বলির পাঁঠা এর চেয়ে স্বেচ্ছায় মরতে যায়, বীরেন যেমন ভাবে বিয়ে করতে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমাকে লিখেছিল বিয়ের আগে। বিয়ের পরেও কয়েকটা চিঠিতে অভিযোগের অন্ত ছিল না। কিন্তু পরে আর কোনো খবর পাইনি, আমিও অবশ্য নিইনি। বিবাহিত লোকের বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস নেই, যেমন নেই বিবাহিতার প্রেমে।"

বিবাহিতার প্রেম বলতে আমি ঠিক কী বলছি বিমলের তা বোধহয় তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম হোলো না। তাই সে বলল, "না, না, তা নয়। সুরমা ইজ অ্যাবসল্যুটলি ডিভোটেড টু হার হাজব্যাণ্ড।" আমি ইঙ্গিতে জানালেম যে আমিও অন্যরূপ ইঙ্গিত করিনি। বিমলের মতো ইংরেজি-

বাঙলায় মিশিয়ে কথা বলতে আমার বাধে, পুরোপুরি বাঙলায় বললে আমার জবাব কুৎসিত শোনাতো এবং ড্রাইভারের কানে উঠত। যে আলোচনায় আমরাই অনধিকার চর্চা করছিলেম তার মধ্যে ড্রাইভারকে টেনে আনতে আমার আপত্তি ছিল।

ইতিমধ্যে লক্ষ্যই করিনি যে আমি আমার হোটেলের ঠিকানা বলতে ভুলে গেছি, বিমলও কোনো নির্দেশ দেয়নি। ড্রাইভার তাই আমাদের সোজা তার মালিকের বাড়িতে এনে হাজির করল। আমি বীরেন-সুরমার কথা ভুলে গিয়ে নিজের কথায় মন দিলেম। বিমলকে বললেম, "আরে, এ কোথায় নিয়ে এলো তোমার ড্রাইভার?"

"যেখানে তুমি থাকবে, অর্থাৎ আমার বাড়ি।"

"অসম্ভব। আমি যে হোটেলে জানিয়ে রেখেছি।"

"হোটেলকে আবার জানিয়ে দেয়া হবে যে তুমি যাবে না।"

বিমল আমার কোনো কথা না শুনে টেনে আমায় গাড়ি থেকে বের করে তার বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। জিনিসপত্তর রইল তার চাকরদের জিম্মায়। আমার হাতে ছিল শুধু টাইপরাইটারটা। মায়ের কোলে যেমন শিশু, সাংবাদিকের তেমনি এই বস্তুটি। হাতছাড়া করতে নেই।

এই আতিথ্যগ্রহণে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু বিমলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া মানে ওর হাতে সকল ইচ্ছা সঁপে দেয়া। ও নিজে দেয় অফুরন্ত অন্তরঙ্গতা, বিনিময়ে দাবি করে অনুগত বাধ্যতা। এ ভূমিকা আমার মনঃপূত নয়, কিন্তু উপায় নেই। পড়েছি বিমলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

আমাকে স্নান সেরে নিতে বলে বিমল নিজের দুয়েকটা কাজ করতে গেল। যাবার আগে আমার দৃষ্টি ঘড়ির দিকে আকর্ষণ করে জানিয়ে দিয়ে গেল যে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে।

আমাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল বিমলের নিজের ঘরটা। তার দেয়ালের ছবিগুলির মধ্যে একটা ছিল বীরেনের। জোড়া ছবি। বিয়ের পরে তোলা। সুরমা সত্যি সুন্দরী। বিমল কী বলতে চাইছিল ওদের সম্বন্ধে? এই অশোভন কৌতূহলটা আমার মনকে যেন অধিকার করে বসল। স্নান করতে করতে বীরেনের বিয়ের সময়কার চিঠিগুলি মনে

আনতে চেষ্টা করে ফল হোলো না। যা মনে ছিল তার সঙ্গে বিমলের রহস্যময় ইঙ্গিতের কিছুমাত্র মিল ছিল না। বীরেন আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গে অপরিচিত। তারপর অনায়াসে আই.সি.এস। তার পরে কিঞ্চিৎ আয়াস নতুন জীবনের সঙ্গে পুরানো জীবনধারার অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বে। এ বিরোধেরও ফল অবধারিত, পুরানো জীবনধারার শোচনীয় পরাজয়। অচিরেই আমাদের বীরেন মিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি আই.সি.এস. হোলো। বিদেশী শাসনের অংশ হয়ে বিদেশী হোলো। জীবনে এই জাত্যন্তর এত দেখেছি যে এতে আজকাল আর বিস্মিত হইনে।

কিন্তু পিছনের টান বড়ো সাংঘাতিক টান। বীরেনের বাবা সেই ইস্কুল মাস্টারই রয়ে গেলেন, বীরেনের মাও জুতো পরতে অস্বীকার করলেন। এদিকে তাঁরা কেউ বীরেনকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার নতুন জীবন যাপন করতে দিতেও প্রস্তুত নন। বীরেনের বিয়ের ভার তাঁরাই নিলেন। মনে আছে বীরেন আমায় লিখেছিল, "এ ভারের বোঝা যে আমায় বইতে হবে এটা তাঁদের খেয়াল নেই।" কিন্তু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না। বীরেনের মনে ছিল তার মা-বাবা কত কষ্ট করে তাকে পড়িয়েছিলেন। যদিবা সে অবাধ্য হতে পারে, সে অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। মনে আছে আমি বিজ্ঞের মতো—পরের ব্যাপারে বিজ্ঞ হওয়ার মতো সহজ কিছু নেই—বীরেনকে বুঝিয়ে লিখেছিলেম, "হোক সুরমা পুরুতঠাকুরের মেয়ে। তাকে তুমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। এলাইজা ডুলিট্‌লের কথা মনে নেই? ফুলওয়ালী তখন তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে দুলবে। সুরমা যোগ্যা সঙ্গিনী হবে। তুমি রেডি মেড্ মূর্তি পাওনি, তার জন্যে আক্ষেপ কেন? ক্লে পেয়েছ, স্রষ্টার মতো যেমন খুশি গড়বে।" আরো কত সদুপদেশ দিয়েছিলেম তার সব মনেও নেই। বীরেনকে লেখা সেই আমার শেষ চিঠি। বীরেন এর উত্তর দেয়নি। আমি ধরে নিয়েছিলেম, বীরেন জীবনে তার উত্তর খুঁজে পেয়েছে। তার পর কী হোলো?

আমি মন্থর গতিতে স্নান সমাপ্ত করে বাইরে আসতেই দেখি বিমল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষমান। বলল, "না, তোমার স্নানপর্ব যে এত দীর্ঘ তা তো জানতুম না। তুমি দেখছি মেয়েদেরও হার মানাও।"

আমি তখনও বীরেন-সুরমার কথা ভাবছিলেম। মনে মনে আলোচনা করছিলেম নানা সম্ভাবনা। কিন্তু সে আলোচনায় বিমলকে যোগ দিতে বলতে দ্বিধা ছিল। বিমল বীরেনের চাকরির কথা বলতে পারে, সুরমার শাড়ির নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে। তার বেশি ওর কাছ থেকে আশা করাই ভুল। মানুষের বাইরের ব্যবহারিক অস্তিত্বের তলায় যে মন বলে অত্যন্ত জটিল একটি বস্তু থাকা সম্ভব, ওর সে জ্ঞান নেই, দৃষ্টিও নেই, কৌতূহলও নেই। ওকে দেখলেই আমার আজকালকার সফল একটি বাঙালী লেখকের কথা মনে পড়ে।

কিন্তু বিমল লেখক নয়, কথক। বিমল বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করো। আগারওয়ালাকে আমি অফেন্ড্ করতে চাই না। হী ইজ্ এ য়ুসফুল ম্যান।"

"কিন্তু সেখানে আমি কোন কাজে আসব?"

"আসবে, আসবে। ওরা আজকাল ডাইনে-বাঁয়ে কাগজ কিনছে দেখছ না? তোমার মতো সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা হলে সে খুশি হবে। ওদের প্রভূত অর্থ আছে। এবারে ওরা খুঁজছে প্রভাব ও প্রতিপত্তি। তার সোপান হচ্ছে প্রচার, অ্যান্ড দ্যাট'স হোয়্যার য়ু কাম ইন।"

"দ্যাট'স হোয়্যার আই ডোণ্ট কাম ইন।" আমাকে জোর দিয়ে এবারে প্রতিবাদ জানাতে হোলো। "আমি তোমার সঙ্গে তোমার ক্লাবে যাব, কিন্তু দু'টি সর্ত আছে।"

"যথা?"

"আমি যে সাংবাদিক বা লেখক তা কাউকে বলতে পারবে না।"

"দুই?"

"আমার ওখানে একমাত্র পরিচয় হবে তোমার বন্ধু হিসাবে, এবং তাও সীমাবদ্ধ থাকবে তোমার ও আমার পুরানো বন্ধুদের মধ্যে।"

"আমি যেতে প্রস্তুত।"

"আমি না যেতে প্রস্তুত, যদি আমার সর্ত না মানো।"

"তথাস্তু। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি না করলে কারো সঙ্গেই দেখা হবে না।"

আমার স্পষ্টভাষণে বিমল নিরাশ হয়েছিল, আহতও হয়ে থাকবে।

তার গাম্ভীর্য লঘু করবার আশায় আমি বললেম, "তুমি এমন কাল-ধর্মবিরোধী ড্রেস স্যুট পরেছ কেন?"

বিমলের মুখে হাসি ফুটল। বলল, "তা জানো না বুঝি? মাড়োয়ারি আর কন্‌গ্রেসীদের পার্টিতে যেতে হয় সাহেবী ড্রেস স্যুট প'রে, পুরানো অভ্যাসবশে সেলাম করে। আর সাহেবদের পার্টিতে যাবে মহারাজা কোট প'রে, সুবিধাবাদী ইংরেজরা এখন তাকে সমীহ করে। সেই নেগেটিব পজিটিবের যোগাযোগ, তবে আলো জ্বলবে।"

বিমল মিথ্যা বলেনি। কিন্তু আমি আমার একমাত্র আনুষ্ঠানিক পোষাক প'রে তার সঙ্গে রওনা হয়ে ক্লাবে যখন পেঁছোলেম তখন বিমলের মূর্তি যেন নিমেষে বদ্‌লে গেল। ফুটবল মাঠে নামা মাত্র খেলোয়াড় যেমন মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বিমল তেমনি ক্লাবের বারান্দায় পা দিয়েই তৎপর হয়ে উঠল। এখানে সে আমার বন্ধু বিমল নয়, মঞ্চাবতীর্ণ অভিনেতা। ভূমিকাঃ মিস্টার বি. বি. বসু, ব্যারিস্টর-অ্যাট-ল। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমলের অভিনয়পটুতা প্রত্যক্ষ করতে করতে তার সঙ্গে এগিয়ে চললেম।

একজন কার সঙ্গে দেখা হতেই বিমল তার অমায়িকতা বর্ষণ করল, যেন একটা বড়ো চৌবাচ্চা ভর্তি করতে জলের কলটা পুরো খোলা হয়েছে। "হ্যাললো, গোয়েংকা। এক যুগ পরে আপনার সঙ্গে দেখা। এতদিন ছিলেন কোথায়? আমি তো রোজই ভাবি—" বিমলকে দেখে সত্যি মনে হচ্ছিল গোয়েংকাবিহনে তার বিভাবরী জাগরণেই অতিবাহিত হয়েছে। গোয়েংকা বিমলের হাত ধরে একটু আড়ালে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল। কথার শেষে আমার কাছে ফিরে এসে বিমল সগর্বে বলল, "কেমন অভিনয় করলুম? সত্যি মনে হয়নি যে আমি ওর শোকে আকুল হয়েছিলুম?"

"নিখুঁত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে বাঙলা দেশে এক অভিনেতারা ছাড়া আর সবাই অভিনয়ে পারদর্শী। কিন্তু সে যাক, ও তোমার কানে কানে কী এমন গোপন কথা বলছিল?"

"মাড়োয়ারি আবার কী বলবে ব্যবসার কথা ছাড়া? জিগেস করছিল বীরেন কমার্স সেক্রেটরি হবে বলে যে গুজব ও শুনেছে সেটা সত্যি

কিনা, আর সত্যি হলে আমি তার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব কিনা। আর বলো না এ ব্যাটাদের কথা। ক্লাবটাকে ওরা ফাটকা বাজারের অ্যানেক্স করে তুলেছে।”

ঠিকই বলেছে বিমল। চতুর্দিকে নানা ব্যবসায়ীর ভীড়। একটু এগিয়ে গিয়ে উপরে উঠতেই ঘৃণ্য দৃশ্যটার তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হোলো। এখানে এক ঝাঁক শকুন মাড়োয়ারিবেশে, ওখানে এক দল বীমার দালাল। এক দল আছে যারা সরাসরি দালাল, অর্থাৎ বিশেষ কিছুই বেচে না। আত্মবিক্রয়ে রাজী, কিন্তু তার ক্রেতা নেই। এরা হচ্ছে আমেরিকানরা যাকে বলে ‘ফিক্সার’—ক নামক উপমন্ত্রী আর খ নামক ব্যবসায়ীর মধ্যে এরা হাইফেন, মিলনে উভয়েরই লাভ। বখড়া থেকে হাইফেনরাও বাদ যায় না। যুদ্ধের আগে একবার আমি এই ক্লাবটাতেই এসেছিলেম; তখন এখানে নকল সাহেবদের ভীড় ছিল, আসল মোসাহেব আর দালালদের এমন ছড়াছড়ি ছিল না।

কিন্তু বিমল গেল কোথায়? ‘একটু দাঁড়াও’ বলে সেই যে উধাও হোলো তারপর কোথায় সে কার সঙ্গে জুটে গেছে কে জানে! আমি অসহিষ্ণু হয়ে ইতস্তত তাকে, বা পরিচিত আর কাউকে, খুঁজে মরছিলেম। ঘুরতে ঘুরতে ডানদিকের খোলা বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমল এক হাতে একটা গ্লাস আর আরেক হাতে একটা সিগারেট নিয়ে অনর্গল কী যেন বকে চলেছে জনকয় শ্রোতা ও শ্রোত্রীর কাছে। এই রকমের পরিবেশেই তার ফর্ম খোলে ভালো। তার এই সাফল্যে কোহলের দান কম নয়। এজন্যে শুধু তাকে দোষী করা অবশ্য অন্যায় হবে।

কাছেই একটা টেবিলে প্রবীণ এক ভদ্রলোক চমৎকার ইংরেজিতে এই প্রসঙ্গই আলোচনা করছিলেন বোধহয়। আমার কানে এলো তাঁর বক্তৃতার একটা অংশ, “সেদিনও এই শৈথিল্য বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল। সেদিনও হিন্দু কলেজের সামনে বাঙালী ছেলেরা গোমাংস-ভক্ষণ ও মদ্যপান করেছে। আজ যেমন তোমাদের চতুর্দিকে দেখছ। কিন্তু একটা বৃহৎ প্রভেদ আছে। সেদিন এই অমিতাচারিতা ছিল দুঃসাহসিক একটা বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। সজ্ঞান একটা সামাজিক বিপ্লবের অংশ। সে উন্মাদনার উৎস বোতলে যতটা ছিল, বইতে তার চেয়ে কম ছিল না।

সে নেশায় জোগান শুধু জন হেগ্ দেয়নি, দিয়েছে জন মিল্টন। সে নেশা শক্তি জুগিয়েছিল হিন্দুসমাজের অচলায়তন ভাঙবার, সনাতনী ঊষরতায় নতুন একটা সংস্কৃতির প্লাবন ডেকে আনবার। আর আজ?" ভদ্রলোক এক চুমুক খেয়ে গলা ভিজিয়ে আবার বলতে লাগলেন, "আজ ওরা ওসবের সব কিছু করছে। কিন্তু তার পিছনে নেই কোনো আদর্শবাদ, নেই কোনো বিদ্রোহ, এমনকি বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ। আজকের মদ্যপান শুধু মদ্যপানের জন্যে। জাগবার জন্যে নয়, ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে।" বক্তা আবার এক চুমুক খেলেন।

গ্লাস হাতে করে মাদকতাবর্জনের পক্ষে বক্তৃতা দেয়া হাস্যকর, কিন্তু ভদ্রলোকের স্বরে এমন একটা ব্যথিত আন্তরিকতার নির্ভুল সুর ছিল যে আমি ঘুরে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেম ভদ্রলোককে। চেনা গেল না। বিমল এলে জিজ্ঞাসা করলেম। বলল, "আরে, তুমি কলকাতার সব ভুলেছ দেখছি। উনি হচ্ছেন সেই কনগ্রেসী নেতা। একদিন যাঁর বক্তৃতার সময় সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে পিন পড়লে শোনা যেত। এঁকে বলতে পারো এই ক্লাবের সর্বশেষ বিদগ্ধ ও অভিজাত সভ্য। দি লাস্ট অব দি মহিকান্স্।" বিমলের কণ্ঠেও আক্ষেপের সুর বাজল, "সেই অতুল চাটুজ্জের আগুন কবে নিভে গেছে, এখন যা দেখছ সে শুধু তার ছাই। চিতাভস্মে গঙ্গাজল ঢালতে যে ত্রুটি হচ্ছে না তা তো স্বচক্ষেই দেখছ। এই দুটিই আছে; লাইব্রেরি আর সেলার। তৃতীয় নেশা নেই।" একটু থেমে বলল, "চলো। ওঁর বক্তৃতায় আজো একটি মোহিনী শক্তি আছে। একবার শুনতে বসলে আর উঠতে পারবে না, যদিও, অ্যাট টাইমস, হী ইজ অ্যাপ্ট টু বি এ বিট অব্ এ বোর্।"

অতুল চাটুজ্জের মতো লোকের সম্বন্ধে বিমলের মতো অর্বাচীন ব্যারিস্টর অনুকম্পা প্রদর্শন করবার ঔদ্ধত্য পোষণ করে দেখে সত্যি কষ্ট হয়। হোক ভূপাতিত, বিরাট মহীরুহকে প্রণাম জানিয়ে আবার আমি বিমলের অনুগামী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, "কিন্তু বীরেন কোথায়?"

"আমিও তো তাকেই খুঁজছি। কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে যে!"

"আর তোমার আগারওয়ালার পার্টিরই বা কী হোলো?"

"বারে, আমি সেইখানেই তো ছিলুম এতক্ষণ। তোমায় নিয়ে যাইনি

তোমার সর্তের কথা মনে করে। বাট্, য়ু মাস্ট বি ভেরি লোন্লি। এসো আমার সঙ্গে, দেখি কার সঙ্গে তোমায় বসিয়ে দিতে পারি।” আবার আমি আর বিমল এগুতে থাকলেম। অর্থাৎ বিমল আগে, আমি তার পাশে, একটু পিছনে। বিমল একে বলছে, “ভালো সার জে. সি.?” উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে না। ওকে বলছে, “কী খবর সেন?” খবর সেনও শোনায় না, বিমলও শুনতে চায় না। দু'জনেই যান্ত্রিকভাবে একটু হাসে। তার বেশি নয়। এর বেশি কেউ দেয় না, এর বেশি কেউ চায় না। এ-ই নাকি ওদের আলাপ।

একটা টেবিলের কাছে এসে টেবিলের অধিকারীকে বলল, “গুড ইভনিং, রাণা। একা যে?”

রাণা বললেন, “কী আর করি? আজ সবাই তো ওই আগারওয়ালার পার্টিতে। আসুন, আপনি আর আপনার বন্ধু আমাকে সঙ্গ দিন।”

সাংবাদিকের ছুটি তো বাস্ম্যানের ছুটি। ভাবলেম, বসা যাক এখানে। হয়তো নেপাল সম্বন্ধে দু'য়েকটা খবর মিলতে পারে। পরিচয়ান্তে বসা গেল। পুরো দশ মিনিটের মধ্যে একবার নেপালের নাম উচ্চারিত হোলো না। আমি অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, “নেপালের এখন খবর কী?”

রাণা বললেন, “ও বিশেষ কিছু নয়। মাঝে একটু-আধটু গোলমাল হয়েছিল। এখন আমার রেমিট্যান্স্ ঠিক আসছে। বয়—!”

নেপাল সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কৌতূহল তাঁর নিজের ছিল না। তাই আমার মতো অ-নেপালীর থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা তাঁর মনেই এলো না। বিমল এক সুযোগে আমায় আড়ালে বাঙলায় বলল, “এ'রাই হচ্ছেন এখন মাড়োয়ারিদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সামাজিক পর্যায়ে অবশ্য ওদের চেয়ে অনেক ভদ্র! এই লোকটি বিশেষ করে।” সত্যি তাঁর ভদ্রতায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই মহানুভবতার মূল্য দিচ্ছে দূর দেশের অগণ্য নেপালী, এই কথা ভেবে আমার সাংবাদিকোচিত সীনিক্ হৃদয়ও একটু মৃদু বেদনা অনুভব না করে পারল না। এদিকে ওদিকে আরো কয়েকজন রাণাকে দেখে বিরক্তি বাড়ল। গ্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে বিমলকে ইঙ্গিত করলেম বিদায় নেবার ব্যবস্থা করতে।

বিমল রাণাকে বলল, "এবার আমাদের ক্ষমা করতে হবে। আমরা একজন পুরানো বন্ধুকে খুঁজছি।"

রাণা বললেন, "ওই আগারওয়ালার ওখানে দেখুন। সবাই তো আজ ওখানে জড়ো হয়েছে।"

বিমল সহাস্যে সম্মতি জানিয়ে বলল, "তা যা বলেছেন। আজ ক্লাবের রোম ওই মাড়োয়ারির পার্টি, সব রাস্তা ওমুখো।" প্রত্যেকটি পুরানো রসিকতা বিমলের জিহ্বাগ্রে। বিচিত্র নয় যে কুশলী সংলাপী বলে তার খ্যাতি ক্লাবজোড়া। মেয়েরা নাকি ওকে পেলে সিনেমায় যেতে ভুলে যায়।

আমি বললেম, "কিন্তু বীরেন কোথায়?" আমার বায়না আমি ছাড়িনে।

"আঃ, তোমার কথা শুনলে কেউ ভাববে আমি যেন বীরেনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি। চলো, বার্‌টা একবার ঘুরে আসি।"

এখানেই ভীড় বেশি। একটু দূরে কয়েকজন বিলিয়ার্ড্‌স্‌ খেলছে, আর বারম্যানকে ঘিরে আছে তৃষিত সভ্যমণ্ডলী। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা লম্বা স্টুলে বসে। একজন যেন আর বসে থাকতে পারছে না। সামনে গ্লাস, কাউণ্টারের উপর হাত, তার উপর অসাড় মাথাটা। আমি বিমলকে জিজ্ঞাসা করলেম, "কে ও?"

"রেলওয়েতে কী যেন বড়ো অফিসার। এখন বুঝি পার্চেজে আছে।"

"এমন দশা কেন?"

"আজ নতুন নয়। সাতটায় ও মদ ছোঁবে না। স'সাতটায় একটার বেশি খাবে না। সাড়ে সাতটায় সে দ্বিতীয় ও সর্বশেষ পেগটি খাচ্ছে। পৌনে আটটায় রাস্তার জন্যে এক ফোঁটা সঞ্চয় করে নেয়া, মরুযাত্রী উটের মতো। আটটা-পাঁচে জীবনের শেষ ড্রিংক, তাই ডাব্‌ল্‌। এমনি করে দশটায় বেহুঁশ। রোজ এই ঘটনা। পুয়োর মজুমদার! ভাগ্যেস ক্লাবেই থাকে।"

সুখের সন্ধানে এসে এতগুলি লোক এত অর্থ ব্যয় করে এত দুঃখ কিনছিল দেখে আমার মন সমপরিমাণে বেদনা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

এমন জায়গায় বিমল আমাদের বন্ধু বীরেনকে খুঁজতে এসেছে ভেবে খারাপ লাগল। আশঙ্কা গোপন না করে বিমলকে বললেম, "এইখানেই কি বীরেনকে আশা করছিলে?"

"দু'দিন আগেও এখানে তাকে রোজ মিলত। তবে কিছুদিন তাকে দেখিনি, আজো দেখছিনে। কী হোলো কে জানে।"

"বীরেনও কি—"

"ঠিক আর সবাইয়ের মতো নয়। অনেক, অনেক আই. সি. এস. আর আই. পি.দেরই এখানে দেখবে প্রতি সন্ধ্যায়।"

"এরা তো দেখছি এমনভাবে খাচ্ছে যেন জল, যেন পয়সা লাগে না।"

"তা ভুল বলনি। পয়সা সত্যি ওদের নিজেদের লাগে না। ব্ল্যাক-মার্কেটের রাজা মহারাজারা থাকতে পয়সার ভাবনা কী?"

"এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের কাছ থেকে সিভিলিয়ানরা আর পুলিশ অফিসারেরা আতিথ্য নেয়?"

"নেয় না আবার! ওই দেখ নর্থ না সাউথ না সেণ্ট্রালের ডি. সি., খেয়ে চলেছে যেন ওমরের আজ শেষ রাত্রি। পাশে রয়েছে ইন্দরচাঁদ।"

"মাড়োয়ারিরা এত মহানুভব হোলো কবে থেকে?"

"নির্জলা মহানুভবতা নয়। ইন্দরচাঁদের বিরুদ্ধে এখন কী যেন একটা তদন্ত চলছে।"

"আর তদন্তকারী তার কাছ থেকে দয়া নিতে দ্বিধা করছে না!"

"আহা, দ্বিধা করলে চলবে কী করে? ওরা আমাদের মতো প্রোফেশনে নেই, কালোবাজারীদের মতো অনন্ত অর্থও নেই। বাঁধা-ধরা মাইনে। কী করে অ্যাফোর্ড করবে এ সমস্ত অভ্যাস? চলো রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। লোক মন্দ নয়।"

আমার ইচ্ছা ছিল না রায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে। পুলিশে আমার আগে ছিল দূর থেকে ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, আজ তা কাছে থেকে দেখে প্রীতিশূন্য অশ্রদ্ধায় পরিণত হোলো। তবু বিমল টেনে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল শুধু রায়ের সঙ্গে আর ইন্দরচাঁদের সঙ্গে নয়, চৌধুরীর সঙ্গেও, যে নাকি এখন লেবর সেক্রেটারি। পরিচয়ের ছেদ শেষ হতেই তারা তাদের আলোচনা আবার সুরু করল।

চৌধুরী বলল, "বিটুইন য়ু অ্যান্ড মি অ্যান্ড দি গেটপোস্ট, আমি যে প্রফুল্ল ঘোষের আমলে ডিস্ট্রিক্ট থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় আসিনি আমার ভাগ্য ভালো।"

রায় বলল, "উঃ! সে এক নাইট্‌মেয়ার। তুমি তো ছিলে না, জানো না। উনি যেন মনে করতেন আমরা ইস্কুলের ছেলে। সিগারেট খাওয়া দুর্নীতি, চুল আঁচড়ালে তুমি বকে গেছ, তোমার জামায় ইস্ত্রী থাকলে তোমার উৎসন্নে যাবার আর বাকি কী!"

সবাই হেসে আকুল রায়ের নরক-বর্ণনায়। ইন্দরচাঁদ তার ভাঙা হিন্দি আর ভাঙা বাঙলায় মিশিয়ে বলল, "তা যা বলিয়েছেন রায়সাব্‌। প্রফুল্লবাবু ছিলেন কি হামরা যাকে বলি হিন্দু বিধবা! প্রফুল্লবাবু বড়া শরীফ্‌ আদমী। কিন্তু হামি বোলে কি, অত্তো ভালো লোক দিয়ে গোভ্‌মেণ্ট চোলে না।"

ইন্দরচাঁদের মতামত বুঝি। কিন্তু রায় আর চৌধুরী এমন বর্বরের সঙ্গ সহ্য করে কী করে? ওর সঙ্গে এদের মতে মেলে কী করে? যোগসূত্রটা কি শুধুই পার্সস্ট্রিংস? না, গভীরতর কোনো আত্মীয়তা, কোনো ঐক্য আছে এদের মধ্যে? ভেবে পাইনে।

শুধু একমত নয়। রায় আরো জোর গলায় বলল, "শেঠজী ঠিক প্র্যাকটিক্যাল লোকের মতো কথা বলেছেন। অমন ভালো মানুষের ইস্কুলমাস্টারিই যোগ্য কাজ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্যে চাই বিশেষভাবে শিক্ষিত শাসকশ্রেণী, ওটা অ্যামেটরের কাজ নয়।"

আমার কাছে রায় তার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা ও মতের সমর্থন চাইছিল চোখের জিজ্ঞাসায়। বিরক্তিগোপনের বিশেষ চেষ্টা না করে আমি ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেম। চৌধুরী তাকে নিরাশ করল না। সে ছিল পলিটিক্‌সের ছাত্র। বলল, "প্লেটো আমাদের বলতেন অক্সিলিয়ারি।"

এত সব বিদ্যা ইন্দরচাঁদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, যদিও সে মাথা নাড়ছিল চাবি-দেয়া পুতুলের মতো। একটু আগে আরেকজন এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রায় তারই রায় চাইল, বলল, "কী বলো গুপ্ত সাহেব? ঠিক বলিনি?"

গুপ্ত রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অনাহারে থাকেননি, অপানেও নয়। তাঁর জড়ানো বাচনভঙ্গিতে তার ইঙ্গিত ছিল। বললেন, "পারহ্যাপ্স্, পারহ্যাপ্স্ নট্। প্লেটনিক প্রেমে বিশ্বাস অনেক দিন হারিয়েছি। প্লেটোও ভুলেছি। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, তিনি বোধ হয় শাসক-শ্রেণীর ব্যারাকবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। না রায়, তোমার ওই অক্সিলিয়ারির মধ্যে আমি নেই, তুমিও বোধ হয় নেই।"

"আহা, ভুল করছ গুপ্ত। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, সে অনুযায়ী বিধিব্যবস্থার, আইনকানুনেরও একটু আধটু অদলবদল করতে হবে বৈকি। তখনকার—"

গুপ্ত গ্লাসটা সশব্দে নামিয়ে বললেন, "কাম, কাম, রয়, লেট'স নট ডিসীভ্ আওয়ারসেল্ভ্স্। আমরা চাকুরে। কাল বিদেশীর চাকরি করেছি, আজ স্বদেশীর চাকরি করছি। চতুর আমরা, এতদিন গাছের খেয়েছি, এখন তলার কুড়োচ্ছি। সোজা ব্যবসা, তা এইচ.এম.-এর ঘরে যাই বলি না কেন। দোহাই তোমার, এর মধ্যে আর তোমার থিয়োরি-টিয়োরি এনে ব্যাপারটা জটিল করে তুলো না।"

এমন অনমায়িক সত্যভাষণে রায় আর চৌধুরী খুশি হোলো না, চুপ করে রইল। কিন্তু গুপ্তর পেটে হুইস্কি জমেছে, কথা জমেছে তার চেয়ে বেশি। তিনি বলে চললেন, "তোমরা আমার অনেক পরে সার্ভিসে ঢুকেছ। আমার আর এক বছরও বাকি নেই, তাই বেশি দিন আর ভণ্ডামি করতে হবে না; আর অসাধুতার সহায়তাও করতে হবে না। আমার দেনা শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের কী গতি হবে?" এক চুমুকের পরে গুপ্ত নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন, "এখন যে ট্রানসিশন চলেছে তার শেষ তোমাদের দেখতে হবে। সেই অনারব্ধ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী স্ট্রাগ্লের শেষে দুপক্ষের মধ্যে কৃত্রিম শুভেচ্ছার বন্যা বইবে না, যেমন বয়েছিল পনেরই অগস্ট। এর পরের বার বিচার হবে, সাজা হবে। এবারে ল্যাম্পপোস্টে কেউ ঝোলেনি, কেননা সত্যি কোনো বদল হয়নি, বদল হলে আমি থাকতুম কোথায়? বদল হলে আমার গলায় দড়ি না থেকে টাই থাকবে কেন?—কিন্তু এর পরের বার তা হবে না, রায়। তোমরা আমাদের মতো পার পেয়ে যাবে না।"

একটু থেমে হিংস্র হাসির সঙ্গে গুপ্ত যোগ করলেন, "এবং সেজন্য আমার হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা বললেও মিথ্যা বলা হবে। হা—হা—হা—।" বিকট সে হাসি।

রায় আমার কানের কাছে এসে বলল, "কিছু মনে করবেন না, আজ একটু বেশি পড়েছে গুপ্তর পেটে।"

আমি রায়ের সঙ্গে গুপ্তর ব্যাধি সম্বন্ধে একমত না হলেও কিছু বললেম না। শুধু ভাবছিলেম গুপ্তর কথাগুলি। উনি যে দুপক্ষের কথা বলছিলেন, তার কোন পক্ষে আমি? ওই রায় আর ইন্দরচাঁদের দলে, নাকি, নাকি,—দ্বিতীয় দল কোনটা? কার কথা বলছিলেন গুপ্ত সাহেব?

কাছাকাছি কোথায় যেন একটা গ্লাস কার অবশ হাত থেকে মেজেতে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। সবাই একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার যার যার পানাহারে মন দিল। যেন কিছু হয়নি। আমার মনে কিন্তু গ্লাস ভাঙার শব্দটা অনেকক্ষণ বাজতে থাকল। যেন ওটা রোগীর ঘরের বাইরে কুকুরের ডাক। যেন ওটা সধবার শাঁখা ভাঙার শব্দ।

আমার আর ভালো লাগছিল না। এবারে এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। আমি বিমলকে জানালেম আমার যাবার বাসনা।

সে বলল, "এখন তো সবে এগারোটা। এখনই যাবে কী? এখানে ভালো লাগছে না তো চলো, ক্লাবেরই অন্য দিকে গিয়ে দেখি।" বার্ থেকে চলে এসে অন্য দিকে যেতে যেতে বিমলকে বললেম, "আমার ভালো লাগছে না বিমল। এই লোকগুলিকে নির্লিপ্ততার সঙ্গে উপভোগ করবার মতো মতামতশূন্য সহিষ্ণুতা আমার নেই। তাই আমি গল্প-লিখিয়ে হতে পারলেম না এ জীবনে।"

বিমল তার সুযোগ হারাল না, বলল, "তোমার সমালোচকরা তো তাই বলে।"

"তারাও জানে না তারা কী সাংঘাতিক সত্য কথা বলে। কোনো মানুষই আমার কাছে মানুষ নয়; একটা টাইপ, একটা আইডিয়ার প্রতীক। সে আইডিয়াটি আমার বিশ্বাসের বিরোধী হলেই আমি তার প্রতি এমন বিরূপ হয়ে পড়ি যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। সেই সঙ্গে মানুষ হিসাবে তার সম্বন্ধে কৌতূহলও নিঃশেষিত হয়ে যায়। গল্পও বেরিয়ে যায় জানলা দিয়ে।"

বিমল কী বুঝল সেই জানে। হয়তো আমার কথা শোনেও নি। তার মন ছিল ডাইনে বাঁয়ে। কখন কোন সীনিয়রকে দেখে হাসতে হবে সম্মানভরে, আর কখন কোন ছোটো চাকুরেকে দেখে দৃষ্টি এড়াতে হবে অবজ্ঞাভরে। আমাকে বলল, "ধৈর্য ধরো। টাইপ ছাড়াও মানুষ মিলবে। খুঁজতে হয়, দেখতে জানতে হয়।" তার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে।

হঠাৎ একেবারে দূর একটা কোণে কাকে যেন দেখতে পেয়ে বিমল প্রায় সেদিকে দৌড়োতে থাকল। আমি আস্তে আস্তে তার অনুসরণ করলেম, যেমন করেছি সারাটা সন্ধ্যা। একটি টেবিলে একটি মহিলা একা বসেছিলেন। বিমল তার সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে মহা-সমারোহের সঙ্গে কুর্নিশ করল, যেন মারী আঁতোয়ানেতের সামনে কোনো ফরাসী অভিজাত। মাথা তুলে সাবলীলভাবে বলল, "আরে, আজ হোলো কী? চাঁদ আছে চকোর নেই, শোধ আছে বোধ নেই, পেয়ালা আছে পিরিচ নেই, হাসি আছে খুশি নেই, বাঁয়া আছে তবলা নেই, সারী আছে শুক নেই,..." এক নিশ্বাসে এত বলে বিমল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হে বলো না, এই, মন্ত্রী আছে উপমন্ত্রী নেই, কাগজ আছে সাপ্লিমেণ্ট নেই,..."

মহিলা আস্তে হেসে বললেন, "এত উপমা না খুঁজে আসল কথাটা বলে ফেলুন না।"

"অর্থাৎ বীরেনবিহনে আপনি একা এখানে কতক্ষণ এবং কেন?"

"সেই সাড়ে সাতটা থেকে।" ম্লান হাসিটুকুও মুছে নিয়ে বললেন, "আর দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমি নিজেও জানবার প্রতীক্ষায় বসে আছি।"

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই সুরমা। বিমল আমাদের

পরিচয় করিয়ে দিলে সুরমা বললেন, "উঃ, বীরেনের কাছে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার কান এক কালে ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল।"

আমি তার স্বামীর মুখে আমার অপবাদের কপট আশংকা নিয়ে রসিকতাটা করতে পারবার আগেই বিমল বলল, "কিন্তু বৌদি, শার্লক হোম্‌স্‌ তো সন্দিহান।"

"তার মানে?"

বিমল সদর্পে টেবিলের দু'টি গ্লাসের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলল, "এদের দ্বিবচনে তো আপনাদের একবচন সূচিত হচ্ছে না।"

সুরমা বলল, "ওরই সংগে এসেছিলুম। এসে আমি দুটো হুইস্কি চাইতেই হঠাৎ ও উঠে বলল, 'একটু বসো। আমি এখনি আসছি একটা কাজ সেরে। তুমি খাও।' সেই থেকে আর দেখা নেই।"

বিমল চিন্তিত হবার ভাণ করল। কিন্তু সুরমার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। বরং চাপা রাগের আগুনের আভার আভাস ছিল সুরমার সুন্দর মুখখানির কোথায় যেন। আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। কিন্তু সারা সন্ধ্যার সঞ্চিত অবসাদে, আর অশোভনতার ভয়ে, কিছু জানতে চাইবারও উপায় ছিল না। বিমল বলল, "বলেন তো আমার গাড়িতে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।"

আমি সেই সুযোগে বিমলকে বললেম, "আমাকেও কিন্তু এবার উঠতে হবেই। কাল সকালে আমার প্লেন ধরতে হবে।"

সুরমাই এবার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, "এলেন কবে যে কালই যেতে হবে?"

"আজই বিকেলে এসেছি।"

"আর কালই যাওয়া?"

বিমল যোগ দিয়ে বলল, "আপনিই বলুন বৌদি, এর কি কোনো মানে হয়? এখনও তো তোমার কারো সংগে দেখাই হোলো না। এমন কি বীরেনের সংগে পর্যন্ত নয়।"

সুরমা বলল, "সত্যি গাড়িটা দিচ্ছেন তো বিমলবাবু? তাহলে আমি বাড়ি যাব।"

বিমল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বিলক্ষণ! আমার গাড়িতে

আপনি পদার্পণ করবেন, এ তো আমার জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য। আমি এক্ষুনি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।" আমার দিকে তাকিয়ে যোগ করল, "তুমিও বরং সঙ্গে যাও। আর তারপর ইচ্ছে হয় ফিরে এসো, নয়তো বাড়ি চলে যেও। আমার জন্যে গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। ইফ্ অ্যান্ড হোয়েন আই গো, আমি আর কারো গাড়িতে চলে যাব।" বলতে বলতে সে নীচে নেমে গেল গাড়ি ডাকতে।

সুরমা বলল, "এক চুমুকে একটা আপনি শেষ করুন, আরেকটা আমি। তারপর চলুন যাওয়া যাক।" যেই কথা সেই কাজ। যদিও পুরুতের মেয়ের এমন কৃতিত্বে একটুও বিস্মিত হইনি, এমন কথা বলতে পারব না। আমার কথা আলাদা।

যথাবিহিত বিদায় নিয়ে সুরমা আর আমি গাড়িতে উঠে বসলেম। সুরমাই রাস্তায় বেরুবার পরে ড্রাইভারকে বলল ডানদিকে যেতে। তারপর আমাকে, "সত্যি, এতদিন পরে কলকাতায় এলেন, অথচ বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবেন, এ কেমন বন্ধুত্ব?"

"সত্য বলতে কি মিসেস চ্যাটার্জি, বীরেনের খোঁজেই আমি ক্লাবে এসেছিলেম বিমলের সঙ্গে।"

"আর দেখা হোলো কিনা শুধু তার অযোগ্যা স্ত্রীর সঙ্গে!"

"আদৌ নয়। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি খুশি হয়েছি।"

"যাক, বাঁচা গেল। আচ্ছা, আপনার কি খুব তাড়া আছে?"

"তা নেই, কিন্তু কেন বলুন তো?"

"তাহলে একবার চেষ্টা করি আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর দেখা করিয়ে দিতে।"

"ও! তাই বলুন। আপনি তাহলে জানেন বীরেন কোথায় গেছে। আমি তো ভাবছিলেম কিছু একটা—"

"এক কাজ করা যাক। ড্রাইভারটা ছেড়ে দেয়া যাক।"

আমি যে গাড়ি চালাতে জানিনে এই লজ্জাকর স্বীকৃতিটা প্রকাশ করবার আগেই সুরমা ড্রাইভারকে বলে গাড়ি থামিয়ে তাকে বিদায় করে, তার জায়গায় নিজে বসে, আমাকে সামনে এসে বসতে বলল। ধন্য নিবারণ পুরুতের মেয়ে!

"বলুন এবার কোথায় যাবেন?"

"বা রে, আপনিই তো বললেন বীরেনের কাছে নিয়ে যাবেন।"

"দি নাইট ইজ ইয়ং। সে পরে হবে। এখন চলুন কোথাও একটু গিয়ে বসা যাক।"

"এই রাত দুপুরে?"

"হোলোই বা।" আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে সুরমা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে চলতে থাকল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে সুরমার এ আচরণ অনুমোদন করতেন না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

একটা দেয়ালের পাশে বসতে বসতে সুরমা বলল, "আশা করি আপনি অন্য কিছু ভাবছেন না।"

হ্যাঁ, এ প্রশ্নের অন্য কোনো মানে নেই।

আমি একটা গল্প বলার সুযোগ পেলেম। "না, মিসেস চ্যাটার্জি। আমার নিজের সম্বন্ধে এমন মোহ আর নেই। একবার এক জায়গায় এক কাস্টমস্ অফিসাব জেরা করল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' আমি বললেম, 'না।' সে বলল, 'কোনো বান্ধবীর জন্যে কোনো উপহার?' আমি বললেম, 'একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো। তার পরেও বিশ্বাস করতে পারো যে কোনো মেয়ে আমার বান্ধবী হতে রাজী হবে?' কাস্টমস্ অফিসার আমার মুখের দিকে চেয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে আমায় রেহাই দিল!"

সুরমা উচ্চহাস্য দিয়ে আমার গল্প পুরস্কৃত করল।

ক্লাবের কোলাহল আর বদ্ধ আবহাওয়ায় আমার নিশ্বাস এতক্ষণ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কোনো ভীড়ের সঙ্গে আমি নিজেকে কখনো একেবারে মিলিয়ে দিতে পারিনে, যাতে করে পাশের লোকগুলিকে আমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন, অতএব বিভিন্ন, অতএব আলোচ্য বলে আর মনে হবে না। সদ্যপরিচিতদের, এমন কি বন্ধুদের পর্যন্ত, এমন আপন করে নিতে পারিনে যে তাদের ত্রুটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। ছোটোখাটো কথা বা ঘটনাও তাই আমার মনকে অনেকক্ষণ ধরে একান্ত

অনাবশ্যকভাবে পীড়িত করে, তার উপর বন্ধুত্বের প্রলেপ পড়ে না সহজে। ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে তার শ্রেণীর লেবেল লাগিয়ে দূরে রাখি, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে প্রথমে ব্যর্থকাম ও পরে তিক্ত হই। দশে মিলে উপভোগ তাই আমার চরিত্রবিরুদ্ধ। এদিকে দার্শনিকের মতো নিঃসঙ্গ ধ্যানানন্দও আমার আয়ত্তের বাইরে। একা আমি অসুখী, ভীড়ে আমার অস্বস্তি।

সুরমা তাই যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি আবার ক্লাবে ফিরে যেতে চাই কিনা আমি একটুও না ভেবে বললেম, "বন্য ঘোড়ারও সাধ্য নেই আমাকে আবার ওখানে টেনে নিয়ে যায়।"

"চলুন তাহলে থ্রি হাণ্ড্রেডে যাই। দি বেস্ট সাপার ইন টাউন।"

খোলা মাঠের শীতল হাওয়ায় আমার ক্লান্ত চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। বিমলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি, তবু আমি আমার আগের উত্তরের সুর চড়িয়ে বললেম, "বন্য হাতীরও সাধ্য নেই আমাকে থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবে নিয়ে যায়।" দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে যোগ করলেম, "আপনারও নেই।"

"কিন্তু এখানে বড়ো নিঃঝুম। এমনকি আপনি পর্যন্ত কিছু বলছেন না। কী ভাবছেন এত চুপ করে?"

"বললে হয়তো বাঙলা দৈনিকের সম্পাদকীয়ের মতো শোনাবে। তার চেয়ে আপনি বলুন, একটু আগে ক্লাবে যা সব দেখলেম এ সব কি সত্যি?"

"আপনি কী দেখেছেন জানিনে, তবে যদি সত্যি কিছু দেখে থাকেন তা সত্যি না হয়ে উপায় কী?"

"আমি তা বলিনি। আমি ভাবছিলেম ক্লাবের ওই লোকগুলির কথা। ওরা সত্যি কি মনে করে যে এর বাইরে কিছু নেই? ওদের একবারও কি মনে হয় না যে এ জীবন কৃত্রিম, এর সঙ্গে যোগাযোগ নেই বাইরের বৃহত্তর বাস্তবের? একবারও ওদের মনে এই ভয় জাগে না যে ওদের দিন আঙুলে গোনা যায়? সামাজিক সচেতনতার কথা বাদ দিলেও, ব্যক্তিগত সততাও কি একেবারে বিদায় নিয়েছে? শাসন

হয়েছে শোষণের বাহন, আর শোষক হয়েছে শাসকের পৃষ্ঠপোষক। চোর আগেও ছিল, কিন্তু এমন মাথা উঁচু করে তারা হাঁটতে সাহস পেল কবে থেকে? কে তাদের এই সাহস দিলে?"

"নাঃ, আপনি সত্যি আপনার বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন।"

বিরক্তির হাই তোলা বন্ধ করবার জন্যেই বুঝি সুরমা আমার কাছে একটা সিগারেট চাইল। আমার দেবার ভঙ্গিতে অনিচ্ছা বোধ হয় গোপন রইল না। না থাক।

বাইরে থেকে অনেক দিন পরে কলকাতা এসেছি বলেই হঠাৎ এই পরিব্যাপ্ত অবনতি দেখে আমি বোধ হয় এতটা আহত হয়েছি। এখানে আগাগোড়া থাকলে হয়তো এত দিনে অভ্যস্ত হয়ে যেতেম। এর সব কিছু স্বাভাবিক মনে হোতো। চোখে কিছু ঠেকত না, চমক লাগত না, আঘাত লাগত না। কিন্তু সারা সন্ধ্যার ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন তোলপাড় করছিল যে সুরমার তিরস্কার সত্ত্বেও আমি আবার বললেম, "আচ্ছা, আমরা বাইরে থেকে কাগজে বাঙলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে যা সব পড়ি সবই অতিরঞ্জিত, তাই না?"

সুরমা সিগারেট ধরিয়ে অনায়াসে বলল, "কাগজগুলির কাজই তো ওই।"

এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে গেল। হয়তো আমি একা নই দেখে সুরমাকে অভিশাপ দিয়ে গেল মনে মনে।

আমার জেরা থামল না। "আচ্ছা, এই যে বড়োলোক আর মেজো-লোকদের একটা লুট চলেছে, যার নগ্ন উদ্ধত চেহারা একটু আগে ক্লাবে দেখে এলেম, এটা সত্যি সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, না কি এখনো এটা একটা বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ? না কি সত্যি অবস্থা এত খারাপ নয়, শুধু আমি বাড়িয়ে দেখছি? দিল্লী থেকে বেশি টাকা আদায় করবার জন্যেই দৈন্যের এত প্রচার; সত্যি এত দুর্দশা নেই, তাই নয়?"

সুরমার এ আলোচনা ভালো লাগছিল না। বলল, "দোহাই আপনার, অন্য কথা বলুন। আপনার এই বিলাপ কাগজে এত পড়েছি ও বীরেনের মুখে সম্প্রতি এত শুনেছি যে আর ভালো লাগছে না। আমার

সমস্যা সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত। আমার জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরেকার সব কিছু সম্বন্ধে আমি নির্বিকার হতে শিখেছি। আমি বলি, what the eye does not see, the heart does not grieve over."

"কথাটাকে একটু বদ্‌লে নিলে আরো সত্য হয়। বলুন, what the eye does not see, the heartless do not grieve over."

সুরমা সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল, "বেশ, বেশ, আমি হৃদয়হীন। হৃদয়বান আপনারা তো আছেন দেশকে রক্ষা করতে, আমাকে আমার নিজেকে রক্ষা করতে দিন। আমি আমার ঘরের বাইরে কিছু দেখতে চাইনে, ক্লাবের বাইরে কিছু দেখতে চাইনে। আর কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই।" সজোরে সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেটার শেষ হতে অনেক বাকি ছিল।

অদ্ভুত জায়গা এই ময়দানটা। রাত্রির গভীরে এ একেবারে শান্ত, প্রায় মৃত। অথচ আপাতশান্তিতে এর উপর শয়ান লোকগুলির বুকের তলায় কী আদিম উদ্দামতা। যে মেয়েটি আরেকটু আগে আমাদের পাশ দিয়ে জোনাকির মতো মৃদু-আলো টর্চ জেবলে চলে গেল সে কি এখনো একা আছে? না কি লোক জুটেছে, অর্থাৎ খাদ্য? আমি একা থাকলে কী করতেম? একজনের সামান্য একটু সাহায্যে কতটুকু কমবে এই নগরীর বিরাট, জমাট গ্লানি? তবে কি কর্তব্যের পরিমাণের অজুহাতে ব্যক্তি বসে থাকবে নিষ্ক্রিয় হয়ে? আর কিছু নয়?

সুরমা বোধহয় এতক্ষণে বুঝতে পারল আমার প্রতি সে অন্যায় করেছে রূঢ় হয়ে। ক্ষমা চাইল। একটু পরে হেসে বলল, "আপনার দৃষ্টিটাই খবরের-কাগজী। ব্যক্তির দুঃখ আপনার চোখে পড়ে না, সব সমস্যার সামাজিক রূপ না দিয়ে আপনার শান্তি নেই, দেশের চিন্তায় আপনি এত আকুল যে কাছের লোকটির জন্যে আপনার এক ফোঁটা অশ্রুও অবশিষ্ট নেই। আপনারা খবরের কাগজের লোকগুলি পলিটিশানদেরও হার মানান এই চমৎকার ফন্দিটিতে। বহুর কথা বলে উঁচু গলায় বিলাপ করলে হাততালি মেলে, সামনের পড়ে যাওয়া লোকটিকে হাত ধরে তোলবার আর দায় থাকে না। আপনার নাম

আমি নন্দলাল দিলুম।" পরিহাসের আবরণেও এমন তিরস্কার গায়ে লাগে। বিশেষ করে এই জন্যে যে এর পুরোটা সত্যি আমার পাওনা ছিল না।

আমি বললেম, "আপনার অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আমি বলি কি, 'দে অলসো সার্ভ হু সিট অ্যাণ্ড উঈপ্।' সবাই কাস্তে ধরলে কলম ধরবে কে? আর কেউ কলম না ধরলে কাস্তেওয়ালা বাড়িতে ফিরে পড়বে কী? না, মিসেস চ্যাটার্জি, আমরা একেবারে অকর্মণ্য নই। জানেন? কিছু দিন আগে পর্যন্ত বিলেতের রেলওয়েগুলিতে একদল কর্মচারী ছিল ভোর হবার আগে অন্যান্য কর্মীদের সময়মতো জাগিয়ে দেবার জন্যে। ঘণ্টা বাজানো আর কড়ানাড়া ছাড়া দ্বিতীয় কাজ ছিল না এদের। শুধু জাগিয়ে দেবার জন্যে রেলওয়ে ওদের নিয়মিত মাইনে দিত। সম্প্রতি কেন ওদের 'অক্যুপেশন গন্' হয়েছে সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার ধারণা প্রত্যেক চলিষ্ণু সমাজকেই এমন একদল লোককে জীইয়ে রাখতে হবে যারা শুধু ঘণ্টা বাজাবে, শুধু কড়া নাড়বে, শুধু বলবে 'জাগো', অর্থাৎ আর সকলের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়ে, তাদের অভিশাপ কুড়িয়ে, সারা সমাজটাকে জাগিয়ে রাখবে। আমার সব সহকর্মীরা হয়তো নয়, কিন্তু আমার সব সহধর্মীরা আর আমি সেই কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছি। আমাদের বরখাস্ত করলেও আমরা কাজ করব।"

"হ্যাঁ, এখন করবেন। কম্যুনিস্টরা রাজত্ব পেলে আপনাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে দেবে ভোর বেলায় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। অথচ আজ যদৃচ্ছ সমালোচনা করে বর্তমান ব্যবস্থার ভিৎ নরম করে দিচ্ছেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল করে দিচ্ছেন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কোদাল চালাবার সময় অনুতাপ করবেন।"

সুরমার কাছে এত রাজনীতি আশা করিনি, তবু বললেম, "হয়তো করব। তবু, সেদিনও সেই নতুন-ব্যবস্থায় যে অন্যায় বা অনাচার দেখব, আশা করি তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে না। জহ্লাদের কাজ সে করবে, তার আগে আমার কাজ আমি।" সুরমা আমার কথা অনায়াসে উপেক্ষা করল। সে ভাবছিল তার নিজের কথা।

"অর্থাৎ, উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ থেকে প্রত্যেকের যার যার নিজের ক্ষেত্রে কাজ করা উচিত, তাই নয়?"

আমি জানতেম যে এই অতিসরল সূত্রটিতে সহস্র সুবিধাবাদিতার অবাধ প্রবেশ, কিন্তু আপত্তি করবার উপায় ছিল না। বললেম, "হ্যাঁ, তাই বটে, যদি না—"

সুরমা আমার কথা শেষ হতে না দিয়ে বলল, "এক্স্যাক্টলি, বীরেনকে আমি সেদিন ঠিক এই সহজ কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম। বলছিলুম, আই. সি. এস. অফিসার তুমি, ক্ষমতা তোমার অপরিসীম। ভালো করবার তথা মন্দ করবার। এই সুযোগ পায়ে ঠেলে তুমি কেন যাবে অনিশ্চিত সম্ভাবনার সন্ধানে? দশ টাকা দেবার সামর্থ্য নেই বলে যে এক টাকাও দেয় না, তার জন্যে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। আমি কত করে পায়ে ধরে বললুম যে—"

"কিন্তু বীরেন কী বলে এসব শুনে?"

"তর্কটা সুরু হয়েছিল বিয়ের বোধহয় সাত দিন পরে, আর গত কয়েক বছর ধরে তা সমানে চলেছে। সেদিন আমি বললুম, আমি তো বৃটিশ আমলে আই. সি. এস. স্বামী পাইনি। এখন তো সবাই ভারতীয়, এসো আবার ভারতীয় হও।"

"বীরেন কী বলে?"

"তখন বলত, আমি ঠিক বামুন পুরুতের মেয়ের মতোই কথা বলছি বটে। পরে, অনেক দিন পরে, ওকে বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি বটে যে ও ইস্কুলমাস্টারের ছেলে, কিন্তু তখন আমার এত সাহস ছিল না। তখন ছিলুম নিতান্ত ভালো মানুষটি।"

সুরমার স্বরে একটু বুঝি প্রচ্ছন্ন বিষাদের আভাস ছিল। তাই আমি বললেম, "তখন না হয় নিতান্ত ভালো মানুষটি ছিলেন। অ-ভালো মানুষটি হলেন কবে থেকে? আর কেনই বা?"

"সে অনেক দীর্ঘ ইতিহাস। তার কিছু মনে আছে, বেশির ভাগই ভুলে গেছি। প্রথম ঝগড়া সুরু হোলো আণ্ডার-সেক্রেটারি দিলওয়ারের বাড়ির নেমন্তন্নের পরে। হ্যাঁ, পার্টিকে তখন আমি নেমন্তন্ন বলতুম। বাড়ি ফিরে এসেই সে কি বকুনি! উনি বললেন—তখন উনি বলতুম,

নাম নিতুম না—বললেন মানে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি নাকি আণ্ডার-সেক্রেটারির স্ত্রীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত তা করতে পারিনি। বীরেন তখন ডেপুটি সেক্রেটারি, তাই আমার নাকি আয়েষার সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ হওয়া উচিত ছিল না। হ্যাঁ, প্লেজেণ্ট হতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌। করেক্ট, বাট্‌ কোল্ড। তাছাড়া দিলওয়ারের সঙ্গে নাকি তখন আমি ভালো করে কথাই বলিনি।"

"গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি কী করলেন?"

"হায়রে, তখন কি কথা বলবার সাহস ছিল ওর মুখের উপর? আমি আমার ঠাকুরঘরে গিয়ে কাঁদলুম প্রাণ খুলে আর গলা চেপে। বললুম, ভগবান, আই. সি. এস. স্বামীর ছদ্মবেশে এ কী অভিশাপ তুমি দিলে আমায়? এর শেষ কোথায় হবে? আমি বদ্‌লাব, না ও বদ্‌লাবে? একজন না বদ্‌লালে আমাদের মিল হবে কোথায়? মিলন হবে কী করে? এমনি করে কতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিলুম জানিনা। হঠাৎ—।"

হঠাৎ সুরমা থেমে গেল। আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে বলল, "না, ওসব আর মনে আনতে পারব না। যা ভুলে গেছি তা ফিরিয়ে এনে আর কাজ নেই। আজ যে জীবনধারা বেছে নিয়েছি তাকেই আঁকড়ে থাকব। প্লী—জ্‌, চলুন না থ্রি হাণ্ড্রেডে, ফর মাই সেক্‌।"

কলকাতার ক্লাবজীবনের যে চেহারা একটু আগে দেখেছি তার পরে আর আমার ওই রকমের অন্য কোনো জায়গায় যাবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। সুরমার করুণ আবেদনের পরেও না। অনীহা গোপন না করেই বললেম, "আপনার কি সত্যি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে?"

"ক্ষুধা নয়, তৃষ্ণা।"

কবুল করব এই বিভাগে আমার অভিজ্ঞতা পরিমিত, এবং দৃষ্টি-ভঙ্গী যৎপরোনাস্তি সংরক্ষণশীল, কিন্তু আরো অনেক প্রগতিশীল হলেও সুরমার এই নগ্ন স্বীকারোক্তিতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারতেম না। কী বিষম শূন্যতা সুরমার জীবনে কুৎসিত মুখব্যাদান করেছে যার জন্যে সে একা থাকার আনন্দ ভুলে গেছে? ভুলে গেছে নৈঃশব্দ্যের প্রগাঢ় প্রশান্তি? কোন গভীর তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে

হয়েছে এই অপরা তৃষ্ণার? আমার সাংবাদিক মন এতক্ষণে সাধারণ থেকে বিশেষে নামল, সমষ্টি থেকে ব্যক্তিতে উত্তীর্ণ হোলো। কিন্তু জিহ্বার জড়তা গেল না। অন্য কথা বললেম।

বললেম, "মিসেস চ্যাটার্জি, আজকের সমস্ত অসংলগ্ন সন্ধ্যাটা আমার মনের উপর বোঝা হয়ে আছে। থ্রি হাণ্ড্রেড তার উপর শাকের আঁটি হবে।"

হঠাৎ মনে হোলো সুরমা হিস্টীরিয়া রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু আবার আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে করুণ, প্রায় অশ্রুত, কণ্ঠে বলল, "আপনার শুধু একটা সন্ধ্যা অসংলগ্ন।" সুরমার দীর্ঘশ্বাসটি কিন্তু অশ্রুত রইল না।

আমার কৌতূহল বাঁধ ভাঙল।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললেম, "আপনি বলতে চান, আমি শুনতে। চলুন আমরা চায়না টাউনে ছোট্টো কোনো একটা দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। তারপর সেখান থেকে যাব বীরেন যেখানে আছে। তারপর বাড়ি। সেখান থেকে সোজা দমদম। তারপর বর্মা। আপনাদের এই ঘোরালো, প্যাঁচালো, ভগ্ন, রুগ্ন কলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরে। এ কলকাতা আমি বুঝিনে। বুঝতে আর চাইওনে। কী যেন হয়েছে এই শহরটার! শুধু প্রদেশটাই খণ্ডিত হয়নি, মানুষে মানুষে যোগ-সূত্রই যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। কুটিল স্বার্থ ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর। মাস্‌তুতো ভাইদের ছাড়া ভ্রাতৃত্ব নেই কোথাও। ওই যাদের দেখলুম ক্লাবে, প্রত্যেকটি লোক প্রত্যেকটি লোক থেকে বিচ্ছিন্ন। যদিও ক্লাবের উদ্দেশ্যই নাকি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, একত্রিত হওয়া, কাছে আসা, জানা, ভালোবাসা। আর হচ্ছে কী? একজন আরেকজনের কাছে আসছে, সবাই জড়ো হচ্ছে—যেমন জড়ো হয় এক পাল মাছি। কিন্তু মিলছে না, যেমন মেলে এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। অন্যায় অর্থে একে অসংগত বলব না—ন্যায়-অন্যায় আজকের দিনে নাকি মতামতের ব্যাপার,—কিন্তু সংগতি যে নেই সেটা স্পষ্টপ্রত্যক্ষ। সব যেন, ওই একটু আগে যা

বলছিলেম, অসংলগ্ন। মিল না থাক, কিন্তু মিলন নেই কেন বলতে পারেন একজন আর আরেকজনের মধ্যে?”

“পারি। কিন্তু বলতে দিচ্ছেন কই?” সুরমা হেসে বলল, “আচ্ছা, আপনার নিজের গলা শুনতে খুব ভালো লাগে, না?”

“খুব। তবে তার চেয়েও ভালো লাগে আরেকজনের গলা।”

“কে সে?”

“আপনি।”

“বটে?”

“ঠিক তাই। তবে কি জানেন, ওই একটু আগে আপনি যা বলছিলেন, আমিও তেমনি চোখ বুজে থাকতে চেয়েছিলেম। কলকাতার বাইরে তাই বেশ ছিলেম। বাঙলার বন্যার্তদের জন্যে সাহায্য-রজনীতে সখের অভিনয়ে টিকিট কিনেছি, বিদেশী কাগজের সতীর্থদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক করেছি। অবাঙালীদের অবজ্ঞা করেছি। তার বেশি নয়। কিন্তু এখানে এসে এই গত কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে যা কিছু শুনেছি, যা কিছু দেখেছি—তার চেয়েও বেশি যা কিছু দেখিনি আর যা কিছু শুনিনি—সব কিছু এমন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে যে বাচাল হয়ে উঠেছি।”

এতক্ষণে আমরা গাড়িতে এসে বসে চীনা উপনিবেশে প্রবেশ করবার সুড়ঙ্গ পথে এসে গেছি। পথের বড়ো রাস্তাগুলি নির্জন ছিল। কিন্তু ফীয়ার্স লেনে রিক্সর ঘণ্টা আর মালাইওয়ালার হাঁকের বিরাম ছিল না। সরু গলির এধার থেকে ওধার অবাধে ছুটোছুটি করছিল অসংখ্য অপরিচ্ছন্ন অভিভাবকহীন শিশু। গরমের দেশ। মাছি, মশা আর মানুষ এখানে জন্মায় সর্বত্র আর সর্বদা। সমান অনাহুবানে, সমান অনাদরে। ওদের এখন ঘুমিয়ে থাকবার কথা মায়ের কোলে। কোথায় মা? কোথায় বাবা? বোধহয় আরো কতগুলি অমনি শিশু আনতে ব্যস্ত।

গাড়ি কিন্তু আর এগুতে পারল না। থামতেই ঘিরে ধরল এক দল ছেলে। গাড়ি দেখবে। 'হ্যাঁ' বলার প্রয়োজন নেই। 'না' বলা নিরর্থক।

হেঁটে একটু আগে একটা দোকানের সামনে আসতেই দেখি খাকি ট্রাইজার্স আর নীল হাওয়াইয়ান শার্ট পরা একটি লোক ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে কী যেন লিখছে বা আঁকছে। হ্যাঁ, আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গেলেও চিনতে কষ্ট হয় না, ও আমাদের সুবল বোস। আর্টিস্ট। ওর ছবি সেদিন অ্যামেরিকা গেছে। যামিনী রায়ের মতো বিদেশী মুরুব্বী ওর জোটেনি, তাই বই লেখেনি কেউ ওর সম্বন্ধে। কিন্তু ওর ছবি আমার ভালো লাগে। সামান্য পরিচয় ছিল কলকাতায় থাকতে।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললেম, "চিনতে পারেন?"

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "সুবল বোস কাউকে ভোলে না। তাকেই সবাই ভোলে।" কথা জড়ানো। নিশ্বাসে, রুচি অনুযায়ী, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ। দৃষ্টিতে নগ্ন হিংস্রতা।

বললেম, "আসুন, কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ এ ড্রিংক উইথ মি।" ক্লাবের ওই মুখোসপরা লোকগুলির পরে সত্যি আমার সুবলের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল।

সুবল ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে বলল, "জানেন, একটা হাসির গল্প বলি। গত তিন ঘণ্টা থেকে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্কেচ্ করছি। তিন-তিনজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যেমন আপনার সঙ্গে হয়ে গেল। সবাই বলেছে, এসো, কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ এ ড্রিংক উইথ মি। অথচ, ডু ইউ নো, কেউ বলল না, কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ এ মীল উইথ মি। তিন দিনের অভুক্ত লোকটাকে কেউ খাবার দিতে চাইলে না। শুধু বলে কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ এ ড্রিংক উইথ মি! হা—হা—হা—! মজার, তাই নয়? হা—হা—হা—।" কান্নার চেয়ে করুণ সেই হাসি হাসতে হাসতে সুবল অনিশ্চিত পদক্ষেপে অন্য দিকে চলে গেল।

সুরমার ভালো লাগেনি দৃশ্যটা। শুধু বলল, "বোধহয় আপনাকে চিনতে পারেনি।"

আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেম, "কিংবা ঠিক চিনতে পেরেছে।"

এই বিরাট, বিকট দৈন্যের জন্যে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, কিন্তু এমন অপরাধী নিজেকে আর কখনো মনে হয়নি।

আবার চলতে চলতে সুরমাকে বললেম, "দেখলেন তো, না দেখে উপায় নেই। না শুনে উপায় নেই। এবারে তো আর সাংবাদিকের নামহীন জনতা নয়। নামী আর্টিস্ট। বিমলের ঘরে ওর ছবি আছে। হয়তো আপনারও।"

"ও কি—?"

"হ্যাঁ, সুবল বোস। কিন্তু সেটা অবান্তর। আমি ভাবছি ওর গল্পটা। হাসির গল্পটা। শুধু হাসতে পারছিনে।"

"আবার বক্তৃতা সুরু করবেন বুঝি?"

আমরা ততক্ষণে দোকানে পৌঁছে গেছি। আমি আমার ক্লান্ত, বিমুখ ঠোঁটের উপর তর্জনী স্থাপন করে বললেম, "এই আমি চুপ করলেম। আর একটি বর্ণও বলছিনে। এবারে আপনি বলবেন।"

সুরমা মুখ খুলল। ক্রমে মুখোস আপনি খসল।

সুরমার মনে নেই কতক্ষণ সে ঠাকুরঘরে ছিল সেই আয়েষাদের বাড়ি থেকে ফিরে। হয়তো দশ মিনিট, হয়তো তিন ঘণ্টা। বীরেন ততক্ষণে জামা-কাপড় ছেড়ে কী করছিল সে-ই জানে। হয়তো সুরমার পিছনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সুরমা দেখতেই পায়নি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছে সুরমা তার বিছানায় নেই। তারপর ঠাকুরঘরে খুঁজতে এসেছে। এসে দেখেছে সুরমা কাঁদছে।

"তুমি কাঁদছ কেন?" জিজ্ঞাসায় কৌতূহলের লেশমাত্র ছিল না, ছিল না সমবেদনার রেশমাত্র।

সুরমা কিন্তু প্রতিবাদ করল না। শান্ত স্বরে বলল, "বুঝতে পারিনি কত রাত হয়েছে। এখনি শুতে যাচ্ছি। তুমি চলো, আমি এখনি আসছি।"

"আমার প্রশ্নের কিন্তু জবাব দাওনি।"

"কাল হবে। রাত হয়েছে। চলো।" সুরমা উঠে দরজার কাছে আসতেই বীরেন সজোরে তার হাত ধরে তাকে থামিয়ে বলল, "কাল নয়। আমি অনেক দিন অপেক্ষা করেছি। আজ জানতে চাই তোমার ইচ্ছেটা কী।"

সুরমা তার মায়ের মেয়ে। বলল, "আমার আবার ইচ্ছে কী? তোমার যা ইচ্ছে, আমারও তাই ইচ্ছে। তুমি আমার স্বামী।"

"কিন্তু আমি জানতে চাইছি তুমি আমার স্ত্রী হতে প্রস্তুত কিনা।"

এ আবার কোন অলক্ষুণে কথা? সুরমা অসহায়ভাবে মায়ের দেয়া ঠাকুরের দিকে তাকাল। তবু বীরেনের প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল।

বীরেন প্রচণ্ড একটা কলহের জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল। এপার কি ওপার। কিন্তু প্রতিপক্ষ রইল প্ররোচনার ঊর্ধ্বে। পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ছদ্মবেশে বীরেনকে দিল চরম প্রতিরোধ। সে তার রূঢ় কথাগুলি আগে থেকে ঠিক করে এসেছিল। জানতো কোন উদ্ধত প্রশ্নের কী উদ্ধততর উত্তর দেবে। শুধু জানতো না সুরমার অসহায় অশ্রুসিক্ত দৃষ্টির অনুক্ত অভিযোগের যোগ্য উত্তর। বাকি রাতটা একজন কাটাল নিঃশব্দ ক্রন্দনে, কাউকে দোষ না দিয়ে, শুধু নিজের ভাগ্য ছাড়া। আরেকজন রোষে জ্বলতে লাগল; ঘুমের, আসলে নিদ্রাহীনতার, শেষে জেগে দেখল সুরমা তার বিছানায় নেই। বিছানায় পড়ে আছে একটা মরা চড়ুইপাখি। বুঝি খাটের উপরের পাখায় ধরা পড়েছিল।

দিনটা ছিল রবিবার। ছুটি। বীরেনের মনে পূর্বরাত্রির অসমাপ্ত তর্কটা অজীর্ণ খাদ্যের মতো যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তাই সে শুয়ে রইল। খবরের কাগজটা পর্যন্ত উল্টে দেখল না। ভাবতে লাগল কী করে আবার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে চরম মীমাংসা করবে।

এমন সময় সুরমা নিজেই চা নিয়ে এলো। সকাল বেলা স্নান করে পুজো সেরেই সে চা করতে গিয়েছিল। এসে দেখল বীরেন জেগে। বলল, "কতক্ষণ উঠেছ? চা আনতে আমার দেরি হয়নি তো?"

"না।" এর বেশি বলতে পারল না বীরেন। পিঠ ভর্তি এক রাশ ভেজা চুল, পরনে সাদা একটা মিলের শাড়ি, আঁচলটা গলা ঘিরে চাবির ভারে নত, কপালে উজ্জ্বল সিঁদুর। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু অমলিন শুভ্রতার নির্ভীক দীপ্তিতে সুরমা যেন উদ্ভাসিত। বীরেন ঝগড়া করতে পারল না সকালের এই সুরমার সঙ্গে। সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বীরেন তার পঙ্গু ক্রোধে জ্বলতে থাকল। চা শেষ করল। সিগারেট ধরাল। উঠে বসল। কাগজটা খুলে প্রথম পাতাটার উপর চোখ বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার সরিয়ে রাখল। উঠে পায়চারি করল দু'চার মিনিট। কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারল না। পরে ঠিক করে ফেলল। এই সন্দেহের দোলায় আর সে দুলবে না। তার স্ত্রী সেবাদাসী হবে না, তা সকালে তাকে সে বেশে যতই পবিত্র ও সুন্দর দেখাক। বাড়িটাকে সে মন্দির করে তুলতে দেবে না। এটা তার বাস করবার বাড়ি, সুখে থাকবার নীড়। এখানে তার প্রয়োজন নেই পূজারিণীর। তার চাই সঙ্গিনী। সুরমাকে সেই সঙ্গিনী হতে হবে।

আর যদি সুরমা তা হতে অস্বীকার করে? প্রশ্নটাকে বীরেন সজোরে মন থেকে সরিয়ে দিল। এমন সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। পরের কথা পরে হবে। আপাতত সুরমার কাছ থেকে তার নিজের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর চাই।

বীরেন জানতো সুরমা ঠাকুরঘরে গেছে। সে সোজা গিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। বাইরে জুতো রাখল না। এমনকি সুরমাকে নাম ধরে ডাকল না পর্যন্ত। রুক্ষস্বরে বলল, "আমি ঠিক করে ফেলেছি। এই যে তুমি সারা দিন পুজো আর্চা নিয়ে থাকবে এ আর আমি সহ্য করব না।"

সুরমা এতটুকু উত্তেজিত হোলো না। বলল, "বেশ, মার ঠাকুর আমি আজই ফিরিয়ে দিয়ে আসব।"

"না, না, না। এ ঠাকুর তোমার মার বাড়ি থাকলে তুমি দূর থেকে আরো বেশি এর কথা ভাববে। একে আমি ভেঙে চুরমার করব। তবে যদি এ আপদ যায়!" বীরেন নিজেকে আর এক মুহূর্তও সময় দিল না কথাটা ভেবে দেখবার। সুরমাকে সময় দিল না আবেদন করবার,

কাঁদবার। রুদ্ধপদে ছোটো আলমারিটার কাছে এসে আসনখানা দূরে করে দিল দেয়ালের দিকে। দু'হাতে ছোটো মূর্তিটি তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলল ডানদিকের খোলা জানালা দিয়ে। মাটির দেবতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সঙ্গে গেল শাঁখটা, গেল চন্দন ঘষবার সরঞ্জাম। সুরমা সোজা হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথা বলল না, একবার চেষ্টা করল না বীরেনকে বিরত করতে। যেন বুঝতেই পারেনি কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। বীরেন ফিরে গেল তার নিজের ঘরে।

সুরমা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল। কই, কিছু হোলো না তো? সত্যি, কী অসহায় এই ঠাকুরদেবতারা! হ্যাঁ, ঘরের ওই জায়গাটা একটু খালি-খালি লাগছে বটে, কিন্তু একটা টেবিল সরালেও অমনি দেখাতো। আর কোথাও খালি-খালি লাগছে কি? কই, না তো! বরং যেন মনে হচ্ছে একটা অনাবশ্যক বোঝা নেমে গেছে মনের উপর থেকে। সত্যি, ভগবানের কোনো প্রয়োজন নেই জীবনে। এ শুধু দুর্বলের যষ্টি। অজ্ঞের কুসংস্কার। বুড়োবুড়ীদের আশ্বাস। সুরমা দুর্বল নয়, অজ্ঞ নয়, বুড়ী তো নিশ্চয়ই নয়। সুরমার কী দরকার এ সবে?

মুক্ত সুরমা তার সাজবার ঘরে গেল। আয়নাটা তাকে দেখলেই আনন্দে উপচে পড়ে, ছাড়তে চায় না তার ছায়া। সুরমা বসল আয়নার সামনে। তার মনে সন্দেহ রইল না যে বীরেনের কাম্য যা কিছু আছে তার সব কিছু দেবার মতো সামর্থ্য তার হাতের মুঠোয়। একবার সে চুলটা খাটো করল লম্বা চুলটা ভাঁজ করে, দেখল আয়েষার চুলের চেয়ে তার চুল অনেক ভালো। রঙীন একটা শাড়ি বের করে গায়ের উপর রাখল। তার ফর্সা গায়ে শাড়ির রঙ খোলে। সুরমা ঠিক করল সে বীরেনের স্ত্রী হবে। বীরেন যেমনটি চায়।

সুরমা তার বান্ধবী ললিতাকে টেলিফোন করল। ললিতাই জবাব দিল, "হ্যালো।"

"আমি সুরমা। তুমি কী করছ এখন?"

"কেন বলো তো?"

"কিছু না করলে আমি এক্ষুনি তোমার ওখানে চলে আসব।"

"ডিলাইটেড্, কিন্তু কেন বলো তো?"

"এসে বলব। গুরুতর ব্যাপার। প্রচণ্ড বিপ্লব। যুগান্তকারী পরিবর্তন, প্রাণান্তকারীও বলতে পারো।" আর কিছু ভাঙল না সুরমা। টেলিফোন রেখে দিল।

জেনে নিল যে বীরেন বেরুবে না। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বলল, "লর্ড সিনহা রোড। ডাক্তার সাবকা কোঠি।"

সুরমা সোজা উপরে চলে গেল, ললিতার শোবার ঘরে।

ললিতা তখনো শুয়ে ছিল। চতুর্থ কাপ কালো কফি নিঃশেষ করেও তার মাথার যন্ত্রণা যায়নি। হাত তখনো কাঁপছে। তার উপর সুরমার রহস্যজনক টেলিফোন। 'প্রচণ্ড বিপ্লব,' কোথায় আবার দাঙ্গা বাধল? 'যুগান্তকারী পরিবর্তন', নতুন কোনো ফ্যাশন বের করেছে বুঝি ক্রিস্টিয়ান ডিয়র? কিন্তু সুরমার আবার এসব সম্বন্ধে কৌতূহল হোলো কবে থেকে? নাঃ, ললিতার মাথা এখনো পরিষ্কার হয়নি। আরো একটা কালো কফি, আর সঙ্গে একটা অপ্ট্যালিডন খেয়ে দেখা যাক।

কফি আর সুরমা একই সঙ্গে এসে পেঁছোল। দুটোর প্রয়োজন ছিল না। ললিতা কি জানতো সুরমা এত তাড়াতাড়ি এসে পেঁছোবে?

ললিতা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না, কিন্তু সুরমাকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, "আচ্ছা মেয়ে যা হোক। সন্ধ্যাবেলার 'অ্যাডভান্স'-এর হেডলাইনের মতো রোমাঞ্চকর কয়েকটা কথা বলেই টেলিফোন ছেড়ে দিলে। ভোরবেলায় এত সেজেগুজে, ব্যাপার কী?" একটু থেমে ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসি হেসে, "বেচারী বীরেনকে টেলিফোন করব কি?"

"তার দরকার নেই। কিন্তু তুমি এখনো শুয়ে কেন? আর, এত কালো কফিরই বা মেলা কেন?"

"কারণ তো জানো, সুরমা। কাল ভয়ানক বেশি দেরি হয়ে গেছে।"

"এত দেরি করো কেন রোজ রোজ?"

ললিতা কপালের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে বলল, "সুরমা, ইট'স্ দি জিপ্‌সি ইন্ মাই সৌল্!"

দু'জনে হাসল একসঙ্গে। কিন্তু ললিতার হাসিতে ছিল অভিজ্ঞতার কাঠিন্য, শুনতে কর্কশ। সুরমার হাসি ছিল সলজ্জ, ইস্কুলের ছেলে যেমন হাসে দেশলাইয়ের আলোয় জীবনের প্রথম সিগারেট ধরাবার আগে। সুরমা তেমনি ভয়ও পেল। ললিতার নাইট-ক্রীমাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভালো লাগল না। গালে, চিবুকে, চোখের তলায় অনেকগুলি দাগ বেরিয়েছে, অমিতাচার যেন তার পদচিহ্ন রেখে গেছে। সুরমা শিউরে উঠল নিজের মুখে অমন চিহ্নের আবির্ভাব কল্পনা করে। তাই আলোচনা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলো ললিতা-প্রসঙ্গে। নির্বোধের মতো বলল, "কেন এত খাও ললিতা?"

ললিতা অননুতপ্তা। জলভর্তি গেলাসটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে একটা বড়ি ধরে বলল, "প্রত্যক্ষ করো কেন খাই।"

"ম্যাজিক দেখাবে নাকি?"

"ম্যাজিকই বটে। দেখো।" ললিতা বড়িটা জলের গেলাসে ফেলে দিয়ে বলল, "এটা অ্যালকাসেল্‌ৎসার।" ফুলে ফুলে ফেনা উঠছিল জলের উপর। "দেখছ তো, কী রকম ফুলে উঠছে। বড়িটা কিন্তু এখনো ভাসছে। ওটা আমার ইচ্ছাশক্তি। এখনো বলছে, আর খাবে না। এবার বলছে, একটা মাত্র, কী আর হবে? তারপর হাসছে উচ্ছল হয়ে, এই জলের মতো। কিন্তু বড়িটা ইতিমধ্যে ক্ষত হয়েছে ধারে ধারে। এই—এই—এইবার ডুবে গেল। তলিয়ে গেল। জলে মিলিয়ে গেল। তারপর? তারপর গেলাসের পর গেলাস খেতে থাকো। এই এমনি করে।" ললিতা এক ঢোকে পুরো গেলাসটা খেয়ে নিল। তৈলহীন এলোমেলো চুলগুলি আবার কপাল থেকে সরিয়ে বলল, "দ্যাট'স্ বেটার। এইবার সারবে মাথা-ধরাটা। এবার বলো সুরমা দেবী, কী বিপ্লব ঘটেছে।" ললিতা সোজা হয়ে বসল পিছনের বালিশটাকে দাঁড় করিয়ে। তার বডিসের তলা দিয়ে মাংসল কোমরটা নির্লজ্জের মতো বেরিয়ে রইল।

সুরমা কিছুতেই নিজের কথায় আসতে পারছিল না। যতই সে স্থূলা ললিতার দিকে তাকায় ততই সে ভয়ে কেঁপে ওঠে। সুরমা চাইল

ললিতার কাছে দীক্ষা নেবার আগে ললিতার সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে। বলল, "আচ্ছা, তুমি যে এসব করো, ডক্টর মিত্র কিছু বলেন না?"

"মর‍্যালি, হী হ্যাজ্‌ন্‌ট্‌ দি রাইট। ফিনানস্যালি, অবিশ্যি, মাঝে মাঝে আপত্তি করে। আর আমারও বর্তমান সমস্যা তাই। বাট্‌—"

"কিন্তু উনি এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না নিশ্চয়ই?"

"ইফ্‌ হী ডাজন্‌'ট লাইক ইট্‌, হী ক্যান লাম্প্‌ ইট্‌," ললিতা পরম অবজ্ঞাভরে বলল। "বুড়ো বয়সে আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল কেন?"

সুরমা যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, "বুড়ো স্বামীর প্রতি এতই যদি বিতৃষ্ণা তবে তরুণ কাউকে বিয়ে করোনি কেন?"

"কারণ বাচ্চা ডাক্তারদের পসার হয় না, আর পসারহীন ডাক্তারকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন্‌ দুঃখে?" ললিতার তর্কটা ভালো লাগছিল না। স্বামীর নাম শুনতেই ওর ভালো লাগে না। বলল, "সমীর আমায় বিয়ে করেছিল ওর টাকার জোরে। ভেরি ওয়েল, লেট হিম পে দি প্রাইস্‌। ওর জন্যে এত সমবেদনা কেন?"

"না, না, সমবেদনা নয়।"

"গুড। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, আমি হয়তো বেশি দিন আর থাকব না ওর সঙ্গে। বাট্‌ অল দ্যাট ইজ ইন দি ল্যাপ অব দি ফিউচার। আপাতত, প্রথম কাজ প্রথমে। এবং তা হচ্ছে ম্যাডেলিনকে টেলিফোন করা।" ললিতা টেলিফোন তুলল।

সুরমা বেঁচে গেল। সে নিজেও তো এই জন্যেই এসেছিল, ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাডেলিনের কাছে যেতে। ভালোই হোলো। ললিতার কাছে সব কথা ব্যাখ্যা করবার আর প্রয়োজন রইল না। শুধু বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সুরমার গাড়িতেই দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটের দোকানটায় এলো। ললিতাকে দেখে ম্যাডেলিন একগাল হেসে "মাদা—ম" বলে যেন লুটিয়ে পড়ল। প্যারিসের হেয়ার-ড্রেসারের ব্যাঙগালোর

সংস্করণে কিছু যে অতি-অভিনয় থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অতি-অভিনয়ের দ্বিতীয় কারণ ললিতার সঙ্গে নবাগতা অনুগ্রাহিকার আবির্ভাব। ললিতা যখন সুরমাকে তার বান্ধবী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যোগ করল যে সে শুধু সঙ্গে এসেছে, ম্যাডেলিনের 'দ' আবার 'ড' হোলো, 'ত' আবার 'ট'। কিন্তু মিষ্টি হাসির সঙ্গে যোগ করতে ভুলল না, "অমন সুন্দর যার চুল তার দরকার কী আমাদের কাছে আসবার?" বলা যায় না কবে কে কাজে আসবে। খুশি রাখতে খরচা নেই।

ললিতা ম্যাডেলিনের সঙ্গে একটা কিউবিক্‌লে অন্তর্হিত হোলো। সুরমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হতে চাইল। সত্যি, হাঁটু পর্যন্ত এই এক রাশ সুন্দর চুল সে ছেঁটে ফেলবে? মায়া হোলো। বসবার ঘরে টেবিলের কাগজগুলি ওলটাতে ওলটাতে ভাবল, সুন্দর না ছাই! ম্যাডেলিন সুন্দর বললে কী হবে যদি বীরেনের ভালো না লাগে? সুরমা আর দেরি করল না। ম্যাডেলিনের একজন সহকারিণীকে নিয়ে সোজা ঢুকল একটা ঘরে। শিংল্‌, ওয়েভ, শ্যাম্পু—নির্দেশ দিয়ে চোখ বুজে রইল সারাক্ষণ। যেন চুলকাটা নয়, ফোঁড়া কাটা। অ্যানিস্থীসিয়া হলেই যেন ভালো হোতো।

শেষ হলে একবারও চাইল না আয়নার দিকে। তার নিজের মতামতের আর কোনো মূল্য সে দেবে না। ললিতা তার পরামর্শদাত্রী। সে-ই তার বিচারিকা হবে।

বিচারিকা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে অজ্ঞান আর কি! তাঁর কথা ফোটে না। ম্যাডেলিনেরও তদবস্থা। চোখ তাঁদের বিস্ফারিত, কিন্তু চোখকে যেন বিশ্বাস নেই। সুরমা হেসে বলল, "বা রে, বলো কেমন হয়েছে। সবাই চুপ করে আছো কেন?"

ম্যাডেলিন তাড়াতাড়ি মনে মনে তাঁর ফ্রেঞ্চ অভিধানখানা কুড়িয়ে নিয়ে হাত নেড়ে বললেন, "প্রিমা! মাইনিফিক্‌! শার্মিং!"

ললিতা ম্যাডেলিনের উচ্ছ্বসিত ফরাসীর সঙ্গে পেরে উঠল না। সুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "পাগলী। কী হয়েছে তোর আজ? সকালে সেই শক্ত শক্ত কী যেন সব বাঙলা কথা বলছিলি—বিপ্লব, যুগান্তকারী, প্রাণান্তকারী, এট সেটেরা, এট সেটেরা—সব তাহলে সত্যি দেখছি।"

সুরমার কান্না পেল। কিন্তু নিজেকে দমতে দিল না। নির্ভয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। ঘাড়টায় বারে বারে হাত বুলিয়ে দেখল। যেন ঠাণ্ডা লাগছিল। চেষ্টা করে হাসল। কিছুক্ষণ পরে আর তেমন যেন চেষ্টাও করতে হোলো না।

তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সুরমা সোজা বাড়ি চলে গেল। ললিতার অন্যত্র কাজ ছিল। তার আগুনে অনেক লোহা।

লম্বা চুলের অনাবশ্যক অংশটা ছেঁটে ফেলা। তার বেশি নয়। শুধু ঘাড়ে একটু হাওয়া লাগতে দেয়া। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয়ে গেল সুরমার। এ যেন প্লাস্টিক সার্জারিরও বাড়া। তাতে তো শুধু চেহারা বদলায়। সুরমার পরিবর্তন আরো অনেক ব্যাপক, আরো অনেক গভীর। কোথায় যেন সে একবার একটা তর্ক শুনেছিল এই নিয়ে যে মানুষের কর্মশক্তির কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক না হৃদয়। এখন সে তর্কটা নিরর্থক মনে হোলো। দেহের আসল জায়গাটি হচ্ছে ঘাড়। সুরমার হাত আবার চলে গেল তার সদ্য অনাবৃত স্কন্ধে। ঠাণ্ডা। হাল্কা। তার মনে হোলো সে যেন উড়তে পারে পাখা মেলে।

সুরমা সত্যি প্রায় উড়ে গেল বীরেনের ঘরে। বীরেন এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে শুয়েছিল। সেই সকালের কাণ্ডটা আর সুরমার বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ লাগছিল। একবার ভাবল বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বরানগর। কিন্তু যেন উৎসাহ পেল না। মা কাশী গেছেন মাসীমার ওখানে। বাবার সঙ্গে আজকাল তেমন যেন যোগাযোগ নেই। দু'জনে এখন যেন দু'টো আলাদা গ্রহের লোক। না, গ্রহ নয়। যেন দু'জনে একই নদীর দুই তীরে বাস করে। দু'জনে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিন্তু একের কথা অন্যের কানে পেঁছোয় না। দু'জনে হাত বাড়ায় পরস্পরকে ছুঁতে, কিন্তু নাগাল মেলে না। সত্যি যে ওরা এখন দু'টো আলাদা জগতের অধিবাসী এই অপ্রিয় সত্যটা বীরেন নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইল না। সুরমা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এইটেই বরানগর না যাবার পর্যাপ্ত কারণ বলে সে মেনে নিল।

একবার মাঝে সে ভূতপূর্ব ঠাকুরঘরে গিয়েছিল। ভালো লাগেনি। কেন ভালো লাগেনি? বীরেন স্পষ্ট বুঝতে পারল না। তার মনে এলো একটা বর্ণনা, এ সুপারস্টিশাস্ এথিস্ট্, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাস্তিক। কার যেন আত্মজীবনীতে পড়েছিল কথাটা। তবে সে কি তাই? ভালো লাগল না নিজের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে। এমনি সময় সুরমার প্রবেশ।

বীরেন হতবাক্ হোলো। মনের মধ্যে যত সব আত্ম-অনাস্থাজাত অনাবশ্যক চিন্তা-ভাবনা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল ঝড়ের ধুলোর মতো, সুরমার আবির্ভাবে তার সব কিছু স্তব্ধ হোলো, শান্ত হোলো। সেই মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবলুপ্ত হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সুরমার কাছে এসে শুধু মনে হোলো সে সুরমাকে জয় করেছে। সুরমা তার সঙ্গিনী হবে এবার থেকে। বীরেনের ক্লাবে সুরমা এখন আর ভিজে কম্বল বা বরফের বাক্স বলে চিহ্নিত ও উপহসিত হবে না। সবাই এবার সুরমাকে খুঁজে মরবে তাদের পার্টিতে প্রাণ জোগাবার জন্যে। বীরেন সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ধন্য হবে, গর্বিত হবে।

সুরমা বলল, "বা রে, কিছু বলছ না যে?"

বীরেন না বলে যে উত্তর দিল সুরমার কাছে তা আদৌ অপ্রীতিকর মনে হোলো না। বীরেন আবার লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, "নাউ, লেট'স সী হাউ উই'ল সেলিব্রেট দিস্!" সুরমা পাশে এসে বসল। বীরেনের খুশিতে সে নিজেও খুশিতে উচ্ছল।

হঠাৎ বীরেনের খেয়াল হোলো যে সুরমাকে সত্যি সুন্দর, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পাশে এসে বসা সত্ত্বেও বীরেনের মুখের উপর সুরমার চুলগুলি এসে উড়ছে না। বীরেন ওই জ্বালাতনটিতে অভ্যস্ত, প্রায় আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময় পেল না আরো ভাবতে। বেয়ারা এসে বলে গেল, বাসু সাহেব এসেছে, অর্থাৎ বিমল।

বীরেন আর সুরমা বাইরের ঘরে আসতেই বিমল চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, "বৌদি, আপনি সত্যি ব্রাহ্মণ।"

"মানে?" বীরেন আর সুরমা একই সঙ্গে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

"মানে আপনি সত্যি দ্বিজ। আপনার নবজন্ম হয়েছে।"

সম্মিলিত হাস্যে তিনজন যার যার আসন গ্রহণ করলে বিমল বলল, "ওদের দেশে কামিং অব্ এজ্ পার্টি আছে, কামিং আউট পার্টি আছে। বৌদির জন্যে তেমনি একটা পার্টি আজ চাই-ই চাই।" কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগ করল, "আজ তোমরা আমার সঙ্গে খাচ্ছ।"

বীরেন ইতস্ততঃ করছিল। সুরমারও বুঝি এত হৈ চৈ ভালো লাগছিল না। সামান্য ঘটনা নিয়ে এত কলরব কিসের? হ্রস্বকেশা সুরমা এমন কী বস্তু যে তাকে নিয়ে প্রদর্শনী না করলে চলছে না? হোক সে পুরুতঠাকুরের মেয়ে, তার নিজের চুল সে যেমন খুশি লম্বা বা খাটো করবে। নতুন ফ্যাশানে তার বুঝি অধিকার নেই? সমস্ত ব্যাপারটা সত্যি ইতিমধ্যে সুরমার কাছে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। যেন এর চেয়ে লম্বা চুল তার জীবনে কখনো ছিল না। বীরেনের পর্যন্ত বিস্ময়ের সীমা ছিল না যে এমন একটা বৃহৎ পরিবর্তন সুরমা এত সহজে কী করে আপন করে নিল। বীরেন ভাবল, সংরক্ষণশীল আসলে মেয়েরা নয়। ছেলেরা। ঈশ্বর ওদের চরিত্রে এই পরিবর্তনশীলতা না দিলে কী করে ওরা বিয়ের পরে ঘর করতো একেবারে অপরিচিত শ্বশুর-বাড়ির পরিবেশে? কী করে বাপের বাড়ির আদর, আদব সব কিছু অনায়াসে ভুলে গিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতো দেওর, ননদ আর জায়েদের সঙ্গে?

বিমল নাছোড়বান্দা না হলে সে কিছুই নয়। বলল, "তোমার টেলিফোন কোথায়? আমি এখনি ক্লাবে টেলিফোন করে টেব্‌ল্ ঠিক করব। ইফ্ দিস ডাজ্‌ন্'ট কল ফর শ্যাম্পেন, আই ডোণ্ট নো হোয়ট ডাজ্।" সে কারো উত্তরের প্রতীক্ষা না করে পাশের ঘরে চলে গেল নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে।

আবার একা থাকতে পেয়ে বীরেন বলল, "সত্যি তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

তবু প্রশংসার সুরটা যেন ভালো লাগল না সুরমার। বলল, "তুমি এমন ভাবে কথাটা বললে যেন শোনালো : তোমাকে আজ বড়ো রোগা দেখাচ্ছে।"

বীরেন বিব্রত হোলো। সে জানতো অভিযোগটা মিথ্যা নয়। গত

কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে কী যেন একটা সন্দেহ, একটা আশংকা তার মন বেয়ে উঠেছে; কোনো কোনো পোকা যেমন গা বেয়ে ওঠে খোলা মাঠে ঘাসের উপর শুয়ে থাকলে। বীরেন ভেবে পেল না কী বলবে। তার সব চেয়ে বেশি খুশি হবার কথা, সেকথা খুশি হয়ে বলবার কথা, কিন্তু—। বিমল ফিরে এসে সমস্যাটার সমাধান করল। বলল, "সব ঠিক। আমি সাড়ে সাতটায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।"। সে যেতে উদ্যত হোলো।

সুরমা বলল, "আপনি কেন এসেছিলেন তা তো বললেন না?"

"আমার উপর অন্যায় করবেন না, বৌদি। আমি আপনাদের এখানে কাজে আসিনে।"

বীরেনের মনে সন্দেহ রইল না যে বিমল বিনা কারণে আসেনি। সুরমাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে বলল, "আমি আর বিমল একটু গল্প করব।"

সুরমা বিদায় নিল। বীরেন নিজের কাছেও এ সত্য স্বীকার করতে পারত না, কিন্তু সুরমার অনুপস্থিতিতে সত্যি সে যেন একটু স্বস্তি বোধ করল। অপ্রীতিকর চিন্তাটা চাপা দিয়ে বিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর?"

বিমল সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবার মতো মূর্খ নয়। কে জানে কোন মুহূর্তে সুরমার পুনরাবির্ভাব ঘটবে। তখন আর বলা হবে না। বৃথা কালক্ষেপ না করে স্বগতোক্তির সুরে বলল, "না। বিধাতার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগই করা উচিত নয়। আমি প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় স্বাধীন। আমি—"

"প্রায় কেন হে? বিয়ে করবে নাকি শেষ পর্যন্ত?"

"নো, থ্যাংক য়ু। সে অভিসন্ধি নেই। কিন্তু ওদেশে ছেলেরা বয়স্থ হয়ে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়, নিজের স্বাধীনতার অল্পাংশ উৎসর্গ করে বৃহৎ সুখের অধিকারী হয়। ওই যেমন, অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ। কিন্তু," বিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের দায়িত্ব আসে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা আমাদের ছেলেদের পায়ে দশ মণ লোহা বেঁধে দিয়ে আশা করি যে তারা জীবনদৌড়ে প্রথম হবে।"

বীরেন এ-সমস্যার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নয়। কিন্তু বিমলের সঙ্গে তার নিজের কথা আলোচনা করতে সে প্রস্তুত ছিল না। বলল, "জীবনদৌড় কথাটা মন্দ বলোনি। কিন্তু তোমার আবার দশ মণ লোহা কোথায় পায়ে?"

"না, তা নয়। আমি ভাবছিলুম আমার ছোটো ভাইটার কথা। ওর একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আমার বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই। ওকে নিয়েই মুস্কিল।"

"মুস্কিল আবার কী? তোমার এত লোকের সঙ্গে পরিচয়, কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করে দাও।"

"তা পরিচয় আছে অনেকের সঙ্গেই। তোমার সঙ্গেও। কিন্তু বিপদ এই যে ভাইটি তেমন কথাবার্তা কইতে পারে না।"

"তাহলে তো কোনো ভাবনাই নেই। স্বচ্ছন্দে তার রেডিওতে চাকরি হবে। চাকরি না হলেও রোজ সন্ধ্যায় কথিকা প্রচার করে বিখ্যাত হবে।"

বিমল বীরেনকে রসিকতার আড়ালে আশ্রয় নিতে দিল না। বলল, "মুস্কিল হচ্ছে ও লিখতেও পারে না খুব ভালো।"

"তবে তো আরো ভালো। খবরের কাগজে নির্ঘাৎ ওর জন্যে চাকরি অপেক্ষা করছে।"

"লেট্‌স্ বি ফ্র্যাংক। ভাইটির আমার বুদ্ধিশুদ্ধিই কিছু কম।"

"তাহলে মন্ত্রিত্ব তো তার অবধারিত।"

বিমল ছাড়ে না। বলল, "বাট হী ইজ থরোলি অনেস্ট।"

বীরেন গম্ভীরভাবে বলল, "সেটা অবশ্য গুরুতর বাধা। সীরিয়স্ ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন।"

এবারে বিমলও না হেসে পারল না। কিন্তু ভ্রাতৃসমস্যায় সে সত্যি উদ্বিগ্ন ছিল। তাই পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, "হাসির কথা নয়, বীরেন, হাসির কথা নয়। আমার সামনে আমার উচ্চাভিলাষের নিশ্চিত সাফল্য, কিন্তু পায়ে আমার অতীতের বেড়ি। আমার বুদ্ধি বলে, যুক্তি বলে, এসব দায়িত্ব তোমার নয়। তুমি কেন বইতে যাবে অপরের বোঝা? মন বলে, ভাই তো বোঝা নয়। তোমার কাছে ওর দাবি তো আইনের

দাবি নয়, স্নেহের দাবি ;—যে-স্নেহ বিলীয়মান। ইফ্ ওন্‌লি ইট ওয়্যার মিয়ারলি এ ম্যাটার অব ল!”

বীরেন জানতো না যে বিমলও এত গভীরভাবে কোনো কিছু ভাবতে পারে। অনুভব করতে পারে। বীরেন কখনো সন্দেহও করেনি যে ওই সদাচপল লোকটির অন্তরেও দ্বন্দ্বের বাসা আছে। ওখানেও অন্তর্বিরোধ অনুপ্রবেশ করেছে। বীরেনের মনে নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনার কথাটা উদিত হবার আগেই সুরমা চা নিয়ে এলো। নিমেষে বিষয়-পরিবর্তন ঘটল। আবার বিমল হাসল। বীরেন হাসল। সুরমা হাসল।

ললিতার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি সুরমার। দেখা হয়নি মানে দেখা হয়েছে একাধিক পার্টিতে, কিন্তু কথা হয়নি। কথা হয়নি মানে আবহাওয়া, বিশেষ করে তার আর্দ্রতা, ছাড়া আর কোনো আলাপ হয়নি। কোন পার্টিতে এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়?

ললিতাকে দোষ দিলে কিন্তু অন্যায় হবে। সত্যি সে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। গত কয়েকদিনের মধ্যে তাকে এক পিস্‌তুতো বোনের জন্যে একটা ফুলব্রাইট স্কলারশিপ জোগাড় করতে হয়েছে, একটি বন্ধুর জন্যে নানা জায়গায় তদ্বির করে যাদবপুর হাসপাতালে একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, একটি বান্ধবীর মেয়ে (যে কিনা বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিল) তার জন্যে ইংরেজি থার্ড পেপারে গোটা কুড়ি বেশি মার্ক্‌সের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, দিল্লীতে তার করে ফল না হলে টেলিফোন করে একজন বন্ধুকে জেনিভা-যাওয়া একটা ডেলিগেশনে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে (তার সত্যি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল),—এমনি আরো কতজনের কত ফরমায়েস। সবাই যে যার দরকারের সময় ললিতার দ্বারে উপস্থিত। ললিতার দরকারের সময় কেউ তার খবরও নেয় না।

শেষ পর্যন্ত তাকে সুরমারই শরণ নিতে হোলো। মেয়েটা ভালো। ‘মিড্‌লক্লাস মর্‌য়্যালিটি’ এখনো ওর মজ্জায় আছে। বন্ধুত্বের ও অন্তত মর্যাদা দেবে।

ললিতা এসেই বলল, "সুরমা ভাই, একটা কাজ করে দিতে হবে।"

সুরমা বলল, "নিশ্চয়ই। আমি পারলে নিশ্চয়ই করব।"

"কাজটা অবশ্য তেমন কিছুই নয়। এমনিতেই হওয়া উচিত, কিন্তু জানো তো, সুপারিশ ছাড়া আজকাল কিছুই করবার জো নেই। ন্যায্য পাওনা আদায় করতেও ঘুষ চাই, তার বেশি হলে তো কথাই নেই।"

ললিতার মুখে এই নীতিকথা শুনতে সুরমার ভালো লাগছিল না। কেন যেন এগুলো ওর মুখে ঠিক মানায় না। সুরমা তবু রূঢ়তা পরিহার করে বলল, "কাজটা কী তা কিন্তু এখনো বলোনি।"

"বিশেষ কিছুই নয়। একবার শুধু মিস্টার চ্যাটার্জিকে একটু বলে দেয়া।"

সুরমা এইখানেই ললিতাকে বাধা দিতে চাইল, কিন্তু পারল না। ললিতা বলেই চলল, "জানো তো, এই যে পূর্ববঙ্গ থেকে সব উদ্বাস্তুরা এসেছে, ওদের মধ্যে আমি কিছু কিছু কাজ করি। আগে যেমন ডব্লু. ভি. এস.-এ করতুম আর্মি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট। জানো না এই রেফ্যুজিদের মধ্যে কত মেয়ে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করতে পারে। ওদের কাঁথাগুলি দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তারপর কী সুন্দর সুন্দর পুতুল করতে পারে ওরা। আরো কত জিনিস যা আমরা কলকাতায় কখনো দেখিওনি। নিউ ইয়র্কে বা প্যারিসে এগুলি পাঠাতে পারলে কত লোক লুফে নেবে দেখবে। আমাদের গভর্নমেণ্টের তো এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই যে এই সমস্ত বাইরের বাজার আবিষ্কার করবে। আহা, গরিবদেরও কত উপকার হয় তাহলে। জানো না তো, আমি সেদিন শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার দিকে। বেচারীদের দুর্দশার দিকে তাকানো যায় না। এখানে এক রাশ লোক, ওখানে এক রাশ বাক্স পেঁটরা। দুয়ে যেন কোনো তফাৎ নেই। যেমন খুশি ছুঁড়ে ফেললেই হোলো। একটি মেয়ে—"

সুরমার ভালো লাগছিল না এই অজস্র কুম্ভীরাশ্রুর বন্যা। সে আগাগোড়া জানতো যে ললিতার কোনো স্বার্থ নিহিত আছে তার কপট সমবেদনার মধ্যে। বলল, "ললিতা, আমি যার জন্যে কিছু করতে পারি না তার জন্যে প্রকাশ্যে অশ্রুবিসর্জন করে বাহবা কুড়োতে আমার বাধে।"

হেসে যোগ করল, "কিন্তু তুমি তো রেফ্যুজি নও। তোমার জন্যে কী করতে পারি বলো।"

"ওই যে বলছিলুম, মিস্টার চ্যাটার্জিকে একটু বলে দেয়া যে আমাদের উদ্বাস্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিকে যেন একটু প্রেফারেন্স দেয়া হয়। উনি তো এখন রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টেই রয়েছেন। উনি একটু বলে দিলেই হয় ডিরেক্টরকে।"

"কিন্তু ডিরেক্টর নিজে কেন রাজি হচ্ছেন না? তাঁর সঙ্গে দেখা করোনি?"

"করিনি আবার? কিন্তু উনি কথাই বলতে চান না। উনি পাঠিয়ে দিলেন সোজা কে এক স্পেশ্যাল অফিসারের কাছে।"

"সে কী বলে?"

"বলে না কিছু। আর সেই তো হয়েছে মুস্কিল। যদি স্পষ্ট বলে কত পার্সেণ্ট তাহলে অনায়াসে তার ব্যবস্থা হতে পারে। তা তো বলবেই না, আমাকে শুধু ভয় দেখায়, বলে 'মিস্টার চ্যাটার্জিকে আপনি জানেন না। তিনি শুনলে আর রক্ষা থাকবে না।' তাই থেকেই তো জানলুম যে মিস্টার চ্যাটার্জিরই হাতে আমাদের ফাইলটা রয়েছে।"

সুরমা জানতো যে প্রতি দিকে নানা অনাচার চলেছে, কিন্তু তাকে যে কেউ সেই কাজে সঙ্গী হতে বলবে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। একবার তার ইচ্ছা হোলো ললিতাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু পারল না। নিজেও জানল না যে অন্যায়ের সঙ্গে সেই হোলো তার প্রথম সন্ধি। সন্ধির পরে আসে মৈত্রী, আরো পরে সক্রিয় সহযোগিতা।

সুরমা শুধু বলল, "আর যা করতে বলো করব। শুধু এইটে পারব না। আমি কোনো দিন বীরেনের সঙ্গে ওর অফিসের বিষয়ে কোনো কথা বলিনি। আজো বলতে পারব না। বললেও ও শুনবে না, ললিতা।"

ললিতা পুরানো পাপিনী। বলল, "কাম, কাম, মাই পেট্। বীরেন ডোট্স্ অন য়ু। তোমার কথা সে না রেখে পারবে না।"

একথার পরে সুরমা দুর্নীতির প্রশ্নটা একেবারেই বিস্মৃত হোলো। তার শুধু মনে পড়ল বীরেনের সাম্প্রতিক ঔদাসীন্য। কী যেন হয়েছে

বীরেনের। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। নিয়মমতো সব কিছু করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণ নেই যেন কোনো কাজে। আগে সুরমাকে দেখে বীরেনের ক্লাবের বন্ধুরা যেমন হঠাৎ জড়োসড়ো হয়ে যেতো—শীতের মধ্যে ঘরে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কোথা দিয়ে—, বীরেনের ব্যবহারে সে তেমনি কিছু একটা লক্ষ্য করেছে ক'দিন থেকে। আঙুল দিয়ে দেখাবার উপায় নেই ঠিক কোথায় বীরেনের স্খলন, এমনকি শৈথিল্য ঘটেছে—আসলে ঘটেনি, বরং সে অতিমাত্রায় কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে—কিন্তু এসব কথা বলে বোঝানো যায় না, ব'লে তার প্রতিকারও হয় না। মুখে কেটে গেলে বাইরের লোককে দেখানো যায়, দেখাতেও হয় না; আবর্জনায় মাছির মতো সকলের গৃধ্নু দৃষ্টি তার উপর অমনি পড়ে। কিন্তু যে ক্ষত দৃষ্টির অতীত, কাটাটা যখন মুখে নয়, তখন বাইরের কে বুঝবে ভিতরের দুঃসহ যন্ত্রণা?

অন্তত ললিতা যে বুঝবে না, সুরমার সন্দেহ ছিল না। তাই শুধু বলল, "না ললিতা, আমি জানি ও আমার কথা রাখবে না। ওকে আমি বলব না। বীরেনকে ছাড়া আর প্রায় যে-কোনো লোককে প্রায় যে-কোনো অনুরোধ করতে পারি, কিন্তু ওকে নয়।"

ললিতা জানতো এখন আর এটা নিয়ে কথা বলে ফল হবে না। বলল, "আচ্ছা থাক। পরে কথা হবে। এখন চলো আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবে। ফ্ল্যুরিতে আমার একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে এগারোটায়।"

সুরমার বাড়িতে থাকতেও ভালো লাগছিল না। ওর মতো মেয়েদের এই দুপুরগুলি সব চেয়ে দুঃসহ সময়। কিছুতেই কাটতে চায় না। কাজ নেই। ঘুমুতে পারে না মোটা হবার ভয়ে। পড়ার আনন্দ বহুকাল ভুলেছে। রেডিও তো খোলবারই উপায় নেই। আর বাকি থাকে কী, শুধু ঘড়িটাকে অভিশাপ দেয়া ছাড়া? কিন্তু বেরুতেও ইচ্ছা ছিল না সুরমার। বিশেষ করে ললিতার সঙ্গে। সুরমা নিজে যতই ললিতাদের মতো হচ্ছিল, ততই তার রাগ বাড়ছিল ললিতাদের উপর। আত্মধিক্কারের এই বিকৃত প্রকাশটা অচেতন প্রক্রিয়া। অচেতন বলেই আরো বেশি তীব্র।

ললিতা সুরমার অনিচ্ছা দেখে আবার বলল, "চলো। না এলে মনে করব তুমি আমার উপর রাগ করেছ ওই অনুরোধটা করার জন্যে।"

সুরমা সত্যি রাগ করেছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলতে হোলো, "না, না, রাগ করবার কী আছে? বরং অনুরোধ রাখতে পারিনি বলে আমিই দুঃখিত।"

শাড়িটা বদ্‌লে চটি পায়ে দিয়েই সুরমা বেরুবার জন্যে তৈরী হোলো। বাইরেটা নির্দয় রোদে পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল। তার হাতে ছিল কালো চশমা। কিন্তু যখন দেখল ললিতাও তার মোটা ফ্রেমের গগ্‌ল্‌স বের করে পরেছে, এবং তাকে রহস্যময়ী চিত্রতারকার মতো দেখাচ্ছে, তখন সুরমা তার চশমাটা আর নিল না। ললিতার সঙ্গে কোনো রকম সাদৃশ্য তার কাছে পরম বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দু'জনে যখন ফ্লুরিতে পৌঁছোল তখন সেখানে ভীড় ছিল। মেম-সাহেবদের ভীড়। সাহেবরা অফিস চলে গেলে ওখানে তাঁদের পত্নীরা জড়ো হ'ন মিলতে ও মেলাতে, খবর দিতে আর খবর নিতে। 'জানো না বুঝি, বিল্‌ যে কাল সকালে হোম্‌ লীভে চলে গেল। একই জাহাজে পেগি—টমসনের স্ত্রী গো—সেও যাচ্ছে। আমি কিছু বলছিনে, কিন্তু—।' হ্যাঁ, এর পরেই ডট্‌ আর ড্যাশ। আরেকজন বলে, 'পিটারকে ওরা পার্টনার করল না—ড্যাম্‌ড্‌ শেম্‌ আই থিংক—তবে কিনা ওর স্ত্রীটি যা একটি লায়েবিলিটি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাটারডে ক্লাবের ভাষায় বারো আনা—ওর এক বোন নাকি বর্মায় কোন রেলওয়ে কর্মচারীকে বিয়ে করেছে এবং রংটাও বেশ কালো। আমি অবিশ্যি দেখিনি কখনো। যা শুনেছি তাই বলছি।' এমনি না-বলা ও তা না-শোনা ওখানে চলে বারোটা পর্যন্ত। ক্রমে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে শ্বেতপল্লীর কারো জানতে বাকি থাকে না যে জন্‌ কোনো কোনো দিন তার স্ত্রীকে ধরে মারে, যে ক্যাথলিন সম্প্রতি ওয়াকারের সঙ্গে একটু সন্দেহজনকভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, যে রিচার্ড আসলে ব্যাচিলর নয়, যে পলের বিয়েতে ঘুণ ধরেছে ইত্যাদি। এখানে কুৎসা রটনার শুধু একটি অলংঘ্য আইন আছে। কোনো কালা আদমীর কানে যেন এর এক বর্ণও না পৌঁছোয়।

ললিতা আর সুরমা গিয়ে বসল দেয়ালের ধারে একটা টেবল নিয়ে। ওদের কাজ নেই, তাই কাজের কথা নেই। বাজে কথা বলতে যে বহুশাখ কৌতূহল ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন, ওরা তা থেকেও বঞ্চিত। ললিতা আবার তার কাজের কথা তুলে আলাপটা মাটি করতে উৎসাহী ছিল না, সুরমার বাজে কথার পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সুরমা বলল, "উঃ, গরম পড়েছে বটে!"

ললিতা কপি-বুক অনুযায়ী তার উত্তর দিল, "ইট ইজ্‌ন্ট্‌ দি হীট সো মাচ্‌, ইট্'স্‌ দি বীস্ট্‌লি হিউমিডিটি দ্যাট গেট্‌স্‌ য়ু ডাউন।"

আবহাওয়াতত্ত্ব হচ্ছে কথকের সংলাপী ক্ষমতার শোচনীয় পরাজয়-স্বীকারের শ্বেতপতাকা। দু'জনেই জানতো একথা। তাই দু'জনেই সন্ধান করছিল পরিচিত আর কেউ আছে কিনা দোকানে, যে এসে ওদের দু'জনকে বাঁচাতে পারতো সসঙ্গ নিঃসঙ্গতা থেকে, সশব্দ নৈঃশব্দ্য থেকে।

ছিল, কিন্তু সে একা ছিল না। সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে আরেকটি মহিলা ছিলেন। সদানন্দের সঙ্গে ললিতার পরিচয় ছিল; সুরমা তার ছবি দেখেছে কাগজে, পরিচয় নেই। ললিতা বলল, "সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?"

"না, তবে নামে জানি। ওঁর সঙ্গে ওঁর স্ত্রী বুঝি?"

ললিতা তৎক্ষণাৎ বলল, "প্লীজ্‌, সদানন্দের নামে অনেক দুর্নাম আছে, কিন্তু এ অপবাদ তাকে কেউ কখনো দেয়নি যে সে কখনো তার নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়েছে।" ললিতা তার ক্লেদাক্ত হাসি থামিয়ে চশমাটা আবার চোখে তুলে চার দিকে তাকাল। রঙীন চশমার মস্ত সুবিধা এই যে তুমি সব দিকে তাকাতে পারো, কেউ জানবে না কাকে তুমি দেখছ। কিন্তু সদানন্দসঙ্গিনীকে চিনতে পারল না ললিতা। সংগ্রাহিকার কুৎসিত সুরে সুরমাকে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না কার স্ত্রী। নতুন কোনো রিক্রুট হবে।" কপট অনুকম্পার সঙ্গে যোগ করল, "সতীশ সরকারকে বোধহয় আবার আরামবাগ যেতে হচ্ছে!"

এই রকমের পরচর্চায় সুরমার রুচি ছিল না। সেও পরচর্চা করে, কিন্তু জানে যে অন্যায় করছে। অভ্যাসটা এখনো তার রক্তে মিশে যায়নি, যেমন গেছে ললিতাদের। তবু প্রায় ভদ্রতার খাতিরেই এই অভদ্র, আলোচনায় যোগ দিতে হোলো। বলল, "সতীশ সরকার আবার কে? আর সে আরামবাগেই বা যাবে কেন?"

ললিতা খুশি হোলো সুরমার কৌতূহলপ্রকাশে। সুযোগ পেল প্রমাণ করবার যে যাকে বলে ইনসাইড ইনফরমেশন সেই ভিতরের খবরের ললিতা একটি খনিবিশেষ। আর তার সব খবর একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা। গুজবের ভেজাল নেই কোথাও। বলল, "সতীশ সরকার এখন ডেপুটি সার্জেন জেনারেল বা অমনি কিছু। চারজনকে ডিঙিয়ে ওখানে এসেছে সদানন্দের কল্যাণে। সবাই অবিশ্যি জানে যে সতীশ সরকারের স্ত্রী ইলার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। ইলাকে তো তুমি মীট্ করেছ, করোনি?"

"না।" সুরমা ভাবল লোকের আলোচনার চাইতে জায়গার আলোচনা কম অনুপাদেয় হবে। বলল, "কিন্তু আরামবাগ যেতে যাবে কেন?"

"বা রে। সদানন্দের সঙ্গে যদি ইলার বিচ্ছেদ হয়ে থাকে, অর্থাৎ সদানন্দ যদি এখন অন্য কাউকে পছন্দ করে থাকে—যা ওর এখনকার পার্ফেক্টলি বোভাইন দৃষ্টি দেখে খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে—তাহলে সতীশ সরকারের আর দরকার কী কলকাতায়? আরামবাগে গিয়ে এবার ম্যালেরিয়ায় মরুক সতীশ আর ইলা! খুনী আসামীদের যেমন আন্দামান, পরিত্যক্তা প্রেমিকাদের স্বামীদের তেমনি আরামবাগ, পীনাল স্টেশন।"

একটার পর একটা এই রকমের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তি ললিতা অনর্গল করে যেতে পারে, যেন এর অসংখ্য ব্যতিক্রম নেই। একবারও তার বাধে না যে কোনো লোক সম্বন্ধে যে কোনো রকম কুৎসা রটাতে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তার স্বরে এমন একটা তিরস্কারের আভাস থাকে যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে নিজে এসব নোংরা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। যেন সে নিজে পুলিশ কমিশনার হলে এদের সবাইকে ধরে ধরে ফাঁসি দিত গড়ের মাঠে। সুরমা এই ভণ্ডামিটা সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু ললিতার অপর স্বরটা আরো অসহ্য। সেটা পরিতৃপ্ত সহিষ্ণুতার সুর। সক্রিয় সমর্থনের সুর। তখন ললিতার কথা শুনলে মনে হবে যে এর সব কিছুই একান্ত স্বাভাবিক, একান্ত সংগত। তখন মনে হবে, এইটেই যেন প্রকৃতির নিয়ম যে সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ নেবে এবং বাকি সবাই তা দেবে, যে মন্ত্রীরা তাঁদের অযোগ্য কর্মচারীদের মধ্যে অনর্জিত পদোন্নতি বিতরণ করবেন তাদের স্ত্রীদের দুর্লভ রূপের সুলভতার সুযোগ নিয়ে। যেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শুধু নিষ্ফলই নয়, নির্বুদ্ধিতাও। যেন এর সুযোগ না নিতে পারলে আজকের দিনে কারো বাঁচবার উপায়ও নেই, অধিকারও নেই। সুরমা অনেক দেখেছে এই গভীর ও ব্যাপক অনাচার। কিন্তু এখনো যেন পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। বোধহয় সেই ললিতা যাকে বলে মিড্‌ল্‌ক্লাস মর‍্যালিটি তারই জন্যে।

ললিতা কফি আসতে তার পুরানো রসিকতা করে বলল, "এমনিতে তো আর মা হইনি। কফি টেব্‌লেই সে ভূমিকা নেয়া যাক।"

ললিতা কফি ঢালতে উদ্যত হলে হঠাৎ পিছন থেকে সদানন্দ এসে দু'হাতে ললিতার চোখ বাঁধল।

ললিতা অনভিজ্ঞা হলে চমকে উঠত, চেঁচিয়ে উঠত, হাত থেকে কফির পাত্র পড়ে গিয়ে চুরমার হোতো, পরে রাগ করত। কিন্তু ললিতার কাছে এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। সে দেখেছিল সদানন্দ তাকে দেখেছে। তাই সে একান্ত অবিস্মিতভাবে হেসে বলল, "সত্যি, মিস্টার ঘোষ, আপনি ভীষ—ণ দুষ্টু। আমি তো ভয়েই মরে গিয়েছিলুম।"

ললিতার কথা শুনলে তখন মনে হোতো তার বয়স ছেচল্লিশ নয়, ছয়। যেন লুকোচুরি খেলছে সাত বছরের কোনো ছেলের সংগে। মনে হোতো সে সদানন্দ সম্বন্ধে কদাচ কোনো কটূক্তির কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। মনে হোতো, যেন দু'জনের মধ্যে একটা আজন্ম অন্তরংগতা আছে, আছে আত্মিক কোনো যোগাযোগ, অচ্ছেদ্য কোনো ঐক্য।

সত্যি তাই ছিল। নাবিকদের মধ্যে কোকেন-ব্যবসায়ীরা যে-কোনো বন্দরে যে-কোনো জাতির যে-কোনো ভাষার সতীর্থদের সংগে অনায়াসে লেনদেন করে; একে অন্যের ভাষা জানে না, তবু ব্যবসায় অব্যাহত;

এই নীচের জগতের একটা নিজস্ব এস্পেরাণ্টো আছে যা সত্যি আন্তর্জাতিক। কারো বুঝতে কষ্ট হয় না, কারো বোঝাতে কষ্ট হয় না। ললিতা আর সদানন্দের মধ্যে সেই রকমের যোগসূত্র ছিল। ওরা দু'জনে দু'জনকে বুঝত।

সদানন্দ ললিতার কপট বিস্ময়ে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "তা অবাক তো হবেনই। আমাদের তো আপনারা চেনেনই না।"

ললিতা বলল, "তাই বটে। আপনারা এখন সব দি অনরেবল মিনিস্টর হয়েছেন। আমাদের মতো নগণ্য ব্যক্তিদের সাহস কোথায় পূর্বপরিচয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার?"

"না, না, না, প্লীজ, এমন কথা বলবেন না। আমরা পুরানো কারা-বিহংগ। আজ মন্ত্রীই হই আর যাই হই সেই কয়েদী রয়ে গেছি, সেই পাগলা আত্মভোলা সদানন্দ যে স্বদেশী করবে বলে জমিদারবাড়ির সকল বিলাস, ওকালতির বিরাট প্র্যাকটিস্ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে বেরিয়েছিল বাবার শাসন আর মায়ের আকুতি উপেক্ষা করে। তার কানে ডাক পোঁছেছিল আরেক বাবার, রাষ্ট্রপিতার; তার কানে আকুতি পোঁছেছিল আরেক মায়ের, দেশমাতার। আমি সেই সদানন্দই আছি।" (বক্তার নিজের উচ্চহাস্য)

ললিতা জানতো এই ভূতপূর্ব দেশপ্রেমিকদের কী করে খুশি করতে হয়। বলল, "সেটা অস্বীকার করতে পারব না। অব অল য়োর কলিগ্‌স্, আপনি সত্যি একেবারে অপরিবর্তিত রয়ে গেছেন ক্ষমতা-প্রাপ্তির পরেও। সেই সদানন্দ ঘোষ আজো সেই সদানন্দ ঘোষ—দেশ-প্রেমিক, নিজের বলতে কিছু নেই, সব কিছু যেন দেশেরই কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত।" ললিতা জানতো এরা সহকর্মীদের নিন্দা শুনলে কী রকম খুশি হয়, জানতো এদের পরিবর্তিত সত্তা অপরিবর্তনের আশ্বাস শুনলে কী রকম পুলকিত হয়। আরো জানতো অপরিচিতা মহিলাদের সংগে পরিচয় না করিয়ে দিলে কী রকম মর্মাহত হয়, কিন্তু অপেক্ষা করল সদানন্দের স্পষ্ট অনুরোধের। বেশিক্ষণ দেরি করতে হোলো না।

সদানন্দ বলল, "আপনি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে আপনার

বান্ধবীর সঙ্গে—ইফ্ আই মে সে সো, আপনার মনোমুগ্ধকারিণী বান্ধবীর সঙ্গে—পরিচিত হবার সুযোগ দেননি।"

সুরমা লজ্জিত হোলো। নির্লজ্জা ললিতা তার সুবর্ণ সুযোগ হারাবার পাত্র নয়। সে যথারীতি দুঃখপ্রকাশ করে বলল, "ইনি হচ্ছেন দি অনরেবল মিস্টার সদানন্দ ঘোষ, মিনিস্টর ফর এডুকেশন অ্যান্ড এক্সাইজ্, আর এ হচ্ছে সুরমা, মিসেস বি. সি. চ্যাটার্জি, আমার বান্ধবী।"

সদানন্দ আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে জানতো আই. সি. এস. পত্নীদের হৃদয়হরণের জন্যে কী কী উপায় প্রয়োজন। প্রধানত দুটো। এক, সাহেবিতে ওদের পরাস্ত করা, অর্থাৎ আসল সাহেবি দিয়ে ওদের নকল সাহেবিকে হারিয়ে দেয়া। দুই, ওদের নকল সাহেবির খেলা খেলতে অস্বীকার করা। স্পষ্ট করে বলা যে ওই ছেলেখেলায় তোমার বিশ্বাসও নেই, দক্ষতাও নেই; যে ওই লুকোচুরি খেলাটায় তুমি লুকোতেও রাজি নও, চুরি করতেও রাজি নও।

সদানন্দের পক্ষে প্রথমটি অসম্ভব ছিল। সাহেবিয়ানার সে যা কিছু জানতো তা শুধু ফিরিঙ্গী জেলরদের কাছ থেকে শেখা। দ্বিতীয়টা কিন্তু তার মন্ত্রী হবার পর থেকে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে জানতো যে ক্লাইভ স্ট্রিটের যে কোনো বড়ো সাহেবকে সে তার বারো বছরের কারাবাসের কথা বললেই অপর পক্ষ নিমেষে নীরব হয়ে যায়। সুরমার উপর তাই সে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রয়োগ করল। বলল, "হে হে, ললিতার কথায় আপনি কিন্তু কান দেবেন না। উনি কেবলই বাড়িয়ে বলেন। আমি শুধু সদানন্দ, জনগণের দাস, সর্বসাধারণের সেবক।"

সুরমা এই বৈষ্ণবী বিনয়ে সন্দেহী হোলো, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কর্তব্য বিস্মৃত হোলো না। সহাস্য অমায়িকতার সঙ্গে বলল, "নমস্কার।" তার বেশি নয়। বলা বাহুল্য সদানন্দ এতে আনন্দিত হোলো না। কিন্তু সে জানতো কী করে আলাপ আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলল, "মিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি, হ্যাঁ, নামটা মনে আছে বৈকি। উনিই তখন বরিশালে অ্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ছিলুম পটুয়াখালি কনগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি। তৃতীয় নন্-কোঅপারেশন মুভমেন্টের কথা

বলছি। আমিও যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই আন্দোলনে। ধরা পড়লুম ১৪৪-এর দায়ে, বিচার হোলো মিস্টার চ্যাটার্জির এজলাসে।"

ভুল মুহূর্তে ঠিক প্রশ্নটি করতে ললিতা আজ পর্যন্ত একবারও ভুল করেনি। বলল, "তারপর কী হোলো বলুন না?"

"কী আবার হবে? ১৪৪ ও অন্যান্য গোটা তিনেক প্রাগৈতিহাসিক ধারায় আমি অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হলুম। মোটামুটি চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হোলো। মিস্টার চ্যাটার্জি এমনভাবে তাঁর রায় পড়ে গেলেন যেন সাধারণ কোনো চোর বা ডাকাতকে জেলে পাঠাচ্ছেন।"

সদানন্দ জানতো যে এই রকমের কথায় সুরমা বিব্রত হবে। তার উদ্দেশ্যও ছিল সুরমাকে বিব্রত করা। সদানন্দ যা জানতো না তা হচ্ছে এই যে সুরমা যতটা বিব্রত হবে ঠিক ততটাই বিরক্ত হবে বীরেনের অপবাদকের উপর। ম্লান হাসির সঙ্গে তাই সে সদানন্দকে বলল, "সত্যি, ভারতীয় বিচারকদের পক্ষে ওটা বড়োই সংকটের সময় ছিল। একেবারে উভয়সংকট। কন্‌গ্রেসীদের শাস্তি না দিয়েও উপায় নেই, আবার শাস্তি দেয়া মানেও নিজেকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া।"

এমন উত্তরে সদানন্দ একেবারে নিরাশ হোলো না। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল। বিনা আমন্ত্রণেই এখন সে একটা চেয়ার দখল করে সুরমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন। সত্যি ওটা উভয়সংকট ছিল। মিস্টার চ্যাটার্জি সেদিন আমায় জেলে পাঠিয়েছিলেন বটে, আমি তো সেজন্যে তৈরী হয়েই বেরিয়েছিলুম, কিন্তু কাঠগড়া থেকে হাকিমের দিকে তাকিয়ে সেদিন আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না যে আমার বিচারক নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী বলে মনে মনে কল্পনা করছিলেন। একবারও তিনি তাকাননি আমার দিকে। তাঁর চোখ ছিল সামনের কাগজের উপর। যেন শুধু আসামীর বিচার হচ্ছে না, হাকিমেরও।" সদানন্দ যেন অতীতস্মৃতিতে অবগাহন করে তৃপ্ত হোলো। সে মাথা নীচু করে চোখ বুজল। ভক্তির এই ভঙ্গিটা সদানন্দের অভিনয়কুশলতার শীর্ষ।

সুরমা এবার সুযোগ পেল লোকটাকে ভালো করে দেখবার, আর ভাববার যে বীরেন এর বিচারের সময় সত্যি কী ভেবেছিল। সদানন্দ

স্থূলকায়, ঠোঁটদুটো অশ্লীলরকম পুরু, গায়ের রং ময়লা, মাথায় টাক ও তা ঢাকবার করুণ ও হাস্যকর চেষ্টা। সব কিছু মিলিয়ে একটা একান্ত অপ্রীতিকর মাংসস্তূপ। তার উপর বেচারী স্যুট্ পরেছে, পোষাকটাও গায়ের উপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে, লেগে আছে। একটু আগে সদানন্দ বলছিল যে তার নাকি বিচার হয়েছিল সাধারণ চোর জুয়াচোরের মতো। সুরমা কিছুতেই মানতে পারল না যে বীরেন খুব ভয়ানক ভুল বা অন্যায় করেছে।

কিন্তু বীরেনের পক্ষে নিজেকে অকারণে অপরাধী মনে করা আদৌ বিচিত্র নয়। ওর স্বভাবটাই সেই গল্পের চাকরিপ্রার্থিনী বিলিতি ঝির মতো যে বলেছিল, শী ইজ নেভার হ্যাপি আনলেস্ শী ইজ আনহ্যাপি ফর সম্‌বডি। বীরেনের সুখ সর্বদাই পণ্ড করে বিপরীত একটা অশান্তি। সব সময়েই তাই সে তার সুখের মধ্যে অ-সুখের কারণ খুঁজে মরে। কখনোই মনটাকে বল্গামুক্ত হয়ে পুরোপুরি সুখী হতে দেয় না। সদানন্দের কথা শুনে সুরমার বীরেনের ইদানীন্তন ঔদাসীন্য ও অন্য-মনস্কতার কথা মনে পড়ল। হায়রে, কেন এমন হোলো? সুরমা তো বীরেন যা চেয়েছিল তা-ই করেছে। না কি বীরেন নিজেই জানে না সত্যি সে কী চায়? সুরমা আর পারে না ভেবে ভেবে!

ললিতা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আর না পেরে বলল, "সত্যি, চোখের সামনে কী বদল হয়ে গেল। কালকের আসামীরা আজকের শাসক।"

"শাসক নয়, ললিতা, সেবক।" সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল। "সেদিন চলে গেছে যখন মন্ত্রিত্বের অর্থ ছিল শাসন করা, শোষণ করা। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে আজ ইংরেজদের এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে—"

সুরমা প্রায় বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা পিছনে রেখে গেছে! কিন্তু পারল না। তবু সদানন্দের বক্তৃতায় বাধা দেবার জন্যেই ললিতাকে জিজ্ঞাসা করল, "কই, এগারোটায় না কার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার কথা? প্রায় যে সাড়ে এগারোটা বাজতে চলল।"

ললিতা বলল, "তাই তো। সময়-জ্ঞান যে কবে হবে আমাদের দেশের লোকের। কিন্তু সমরের যে সত্যি দরকার ছিল আমার সঙ্গে। সমর, মানে আমার ভাইপো। একেবারে কমরেড। ঘোর লাল। রেল-লাইনের পাশ দিয়ে গেলে গাড়ি থেমে যায়। হা—হা।"। কম্যুনিস্টদের নিয়ে এদের রসিকতার আর শেষ নেই। সদানন্দের শুধু পরিহাস নয়, গভীর বিদ্বেষ।

তাই সে একান্ত গম্ভীরভাবে বলল, "ললিতা, আপনার যে ওদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল তা তো জানতুম না? আপনাকে আমি বরাবর সত্যকার দেশপ্রেমিক বলেই জেনে এসেছি।" ললিতা 'সত্যকার দেশপ্রেমিক' হলে কম্যুনিস্টরা যে দেশপ্রেমিক নয় সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ললিতা বলল, "না, মিস্টার ঘোষ। সমরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ তো কম্যুনিস্ট হিসেবে নয়, আমার ভাইপো হিসেবে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, কী যেন বিপদে পড়েছে।"

সদানন্দের প্রতিক্রিয়াটা প্রায় যান্ত্রিক। বলল, "আমাকে কিন্তু মাপ করতে হবে মিসেস মিত্র, কোনো কম্যুনিস্টকে আমি কোনো রকমে সাহায্য করতে পারব না। বিয়াল্লিশের স্মৃতি আমার মনে এখনো জ্বলছে, দেশের মধ্যে তার পর থেকে ওরা যে অরাজকতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—।" ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই সব পুরানো অভিযোগ! নিজেদের অক্ষমতা গোপন করবার জন্যে অপরের বিরুদ্ধে এই যদৃচ্ছ দোষারোপে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে সকলের। সুরমারও। তাছাড়া সুরমা নিশ্চয় জানতো সমরের রাজনীতিক কোনো বিপদের জন্যে সে ললিতার শরণাপন্ন হবে না। বলল, "কী হয়েছে সমরের?"

ললিতা সুযোগ পেল বলবার। "হবে আবার কী? যা হবার তাই হয়েছে। প্রেমে পড়েছে।"

সুরমা বলল, "হাউ ইণ্টরেস্টিং! তারপর?"

সদানন্দ অট্টহাস্যে বলল, "ওই তো, প্রেম ছাড়া আর কী হয় ওপার্টিতে?"

সুরমা আরেকটু আগে ললিতার কাছে সদানন্দ সম্বন্ধে যা শুনেছে

মাঝখান থেকে আজটা মাটি হয়ে যাচ্ছে। সুরমা আরেক পাত্র কফি চাইল।

স্থূল-চেতন হলেও, সদানন্দও এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। তারও আন্দোলনের দিন গেছে, নতুন কাজে মন বসে না। আত্মোৎসর্গের দিন গেছে; কিন্তু ভোগও করতে পারে না সাহস করে, না লুকিয়ে। জেল থেকে এখন সে ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে এসেছে, কিন্তু শান্তি নেই মনে। তার গতকাল গৌরবের, কিন্তু সে গৌরব যেন হাতে এক টুকরো বরফ। প্রতি নিমেষে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগামী কাল কী হবে? সদানন্দ জানে না। জানতে চায়ও না। অত সাহস নেই তার। আজ, যতটুকু সময় বরফটা আছে, তার বেশি প্রয়োজন নেই। সে একবার তাকাল সুরমার দিকে।

ললিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অন্যে পরে কা কথা। আমি নিজে দেখেছি আমি নিজে কত দুর্বল। সবই করি, কিন্তু সর্বক্ষণ কে যেন ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে টোকা দেয় পিঠের উপর। গা যেন হিম হয়ে যায় সেই স্পর্শে। না পারি আমার দাদার মতো আন্তরিকভাবে পুরানো সবকিছুতে বিশ্বাস করতে, না পারি সমর আর লিলিকে তাদের নতুন জীবনযাত্রায় সাহস জোগাতে।"

এমনি সময় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ফ্ল্যুরিতে এসে ঢুকল। সুরমার ওদের দেখে মায়া হোলো। ললিতা বলল, "আমি এবার ওদের সঙ্গে যোগ দেব।"

সুরমা বলল, "দেরি করো না যেন। আমার এবার বাড়ি যেতেই হবে।"

ললিতা বিদায় নিতেই সদানন্দ চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসল, সুরমার মুখোমুখি হয়ে। ব্যাখ্যা করে বলল, "এই কম্যুনিস্টদের তো বিশ্বাস নেই। কালই সকালে হয়তো 'স্বাধীনতা'-র প্রথম পাতায় বেরুবে যে আমাকে এখানে দেখা গেছে—হে হে—আপনার সঙ্গে।"

হঠাৎ সুরমার খেয়াল হোলো। তাই তো! এ কী ভয়ানক বিপদের

মধ্যে এসে পড়ল সে? এখন? আতংকে সুরমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। থাকা বিপজ্জনক, কিন্তু হঠাৎ উঠবেই বা কী অজুহাতে? এ কী জালে জড়াল সে নিজেকে? ললিতা কখন ফিরবে? করুণ চোখে সে ললিতাদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

সদানন্দ জানতো যে ললিতা আর ফিরবে না। এমন অরসিকা সে নয়। ললিতার প্রয়োজন আছে সদানন্দকে খুশি রাখবার। সুরমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি এখন কোন ডিপার্টমেণ্টে আছেন?"

"রিহ্যাবিলিটেশন। জয়েণ্ট সেক্রেটারি।"

"ও হ্যাঁ। আমার ঠিক মনে ছিল না। তবে ওর সুনাম অনেক শুনেছি আমার মন্ত্রীভাইদের কাছে। খুব অনেস্ট এবং এফিসিয়েণ্ট। হায়রে, যদি আমাদের আরো অনেক ঠিক এত উঁচু দরের অফিসার থাকতো তবে এই দেশটার কী না করতে পারতুম!"

সুরমা কী বলবে ভেবে পেল না। বীরেনের নিন্দা শুনলে সে সহ্য করতে পারে না, বীরেনের প্রশংসা শুনলে তার গা জ্বালা করে। চুপ করে রইল।

সদানন্দ আবার বলল, "কিন্তু ওর মতো অফিসারের রিহ্যাবিলিটেশনের মতো ব্যাকওয়াটারে পড়ে থাকা কোনো কাজের কথা নয়।"

স্বামী সম্বন্ধে অত্যধিক কৌতূহলশূন্যতা হয়তো আবার নানা রকমের গুজবের জন্ম দেবে। তাই বলল, "রিহ্যাবিলিটেশন তো এখন অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তাই নয়?"

"আহা তা বৈকি, তা বৈকি। কিন্তু আমি ভাবছিলুম মিস্টার চ্যাটার্জির কেরীয়ারের কথা। সেটাও তো ভাবতে হবে। শুধু আপনারই নয়, আমাদেরও। ঈশ্বর জানেন, আমাদের দক্ষ কর্মচারীর সংখ্যা কী নগণ্য। ভলাণ্টিয়ারি করতে সবাই পারে, কিন্তু তাদের দিয়ে তো আর রাজ্য চলে না। সেজন্য চাই এফিসিয়েণ্ট ম্যানপাওয়ার। আমাদের ও বস্তুটিতে বৃহৎ দুর্ভিক্ষ।" তারপর খুব অন্তরঙ্গ সুরে আস্তে সদানন্দ বলল, "আমি বলি কি, মিস্টার চ্যাটার্জিকে আমি আমার

ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারি করে নেব। কালকের ক্যাবিনেট মিটিঙেই আমি এটা রেইজ্ করব।"

সুরমা এই অযাচিত অন্তরঙ্গতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সন্দিগ্ধ হোলো। ললিতার কাছে সে শুনেছিল সদানন্দের কথা। ভোলেনি। কিন্তু লোভও হোলো। সত্যি যদি সদানন্দ বীরেনকে সেক্রেটারি করে নেয়, আর বীরেন যদি জানতে পারে যে ললিতার পরিচয়েই সেটা সম্ভব হয়েছে, তাহলে কি বীরেন ললিতার উপর খুশি হবে না? চাকরি করে, অথচ পদোন্নতি চায় না, এমন কে আছে সংসারে? আর ইলা? সুরমা নিজেকে বোঝাল— সুরমা ইলা নয়। সে কিছু না দিয়ে কিছু পাবে। শয়তানকে সে তার নিজের খেলায় হারাবে।

সুরমা এতক্ষণে স্নিগ্ধভাবে হাসল সদানন্দের দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বলল, "ওঁর অফিসের কথা আমি কিছু জানিনে; উনিও বলেন না, আমিও জিগেস করি না।" সুরমা জানতো তার এই সলজ্জ দ্বিধা সদানন্দকে আরো বেশি পীড়াপীড়ি করতে প্রেরণা দেবে।

সদানন্দ বলল, "না, না, আপনার জন্যে তো আমি কিছু করছিনে। মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য আমাদের অফিসারদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা। কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন এখানে অবান্তর।"

সুরমা নিজের সাফল্যে খুশি হোলো। বলল, "আপনার কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর আপনি এই চীজস্টিক কিন্তু একটাও খাননি।" সুরমা থালাটা এগিয়ে দিল।

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হে হে।" সদানন্দের হাসি আর ধরে না। অদ্ভুত খেলা। দু'পক্ষই মনে করছে সে জিতেছে। হাসে অন্তর্যামী।

হঠাৎ সুরমা দেখল ললিতা ওরা কখন চলে গেছে। বলল, "আরে, ললিতা কোথায় গেল?"

"ওঃ চলে গেছে বুঝি?" সদানন্দের কণ্ঠে বিস্ময়ের সীমা ছিল না, যেন ললিতার এই আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বলল, "ললিতা ওই রকমই। বোধহয় স্টালিনে আর ট্রুম্যানে মিলন ঘটাতে গেছে! হে হে।" সদানন্দের রসিকতার অন্তত একজন বিশেষ অনুরাগী আছে। সে সদানন্দ নিজে।

সে সুরমাকে বলল, “তা কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে পেঁাছে দেব। আমি ওই দিকেই যাব।”

“কোন দিকে? আপনি তো জানেন না আমি কোথায় থাকি।”

সদানন্দ ধরা পড়ে গেল। কিন্তু ক্ষতিকে লাভে ও অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করতে না পারলে সদানন্দ পলিটিশান হয়েছে কেন? বলল, “জানবার তো দরকার নেই। আপনি যেদিকে যাবেন আমিও সেই পথের পথিক হবো।” সদানন্দ হাসল নিজের কৃতিত্বে।

সুরমাও হাসল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ললিতার সঙ্গে চশমাগত সাদৃশ্যের সম্ভাবনায় সে যেমন বিরক্ত হয়েছিল, এখনো সদানন্দের সঙ্গে এক পথের পথিক বলে বর্ণিত হতে তার ঠিক ভালো লাগল না। তবু মনকে বোঝাল, ললিতা জন্মনিন্দুক। হয়তো বাড়িয়ে বলেছে। সদানন্দ সত্যি হয়তো অত খারাপ লোক নয়।

বিল্‌টা এলে সদানন্দ তাড়াতাড়ি তার পার্স বের করল। সুরমা বিব্রত হয়ে ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল, “না, না। সে ভারি অন্যায় হবে। আমি আর ললিতা আগেই এসেছি। কিছুতেই আপনাকে এর দাম দিতে দেব না।”

এই রকম লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ ছাড়বার পাত্র সদানন্দ নয়। বললও তাই। “না, না, এই আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।” কথাটা নির্দোষ শোনাল। আরো বলল, “আপনার খাওয়াটা পাওনা রইল। আরেক দিন খাব।”

গাড়িতে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। ড্রাইভার বাঙালী হলে এই অসুবিধা। গাড়ি থেকে নামবার সময় সুরমা সদানন্দকে নমস্কার করে ধন্যবাদ দিল। সদানন্দ বলল, “ধন্যবাদের কিচ্ছু নেই। আমরা একেবারে স্বদেশী লোক, ওই সাহেবী থ্যাংক য়ু ট্যাংক য়ু বুঝিনে।” তারপর আবার কাজের কথায় এসে বলল, “হ্যাঁ, মিস্টার চ্যাটার্জির ব্যাপারটা আমি কালই দেখব। পরে আপনাকে টেলিফোন করে জানাবো। এ—এ— কখন টেলিফোন করলে আপনার অসুবিধা হবে না? দুপুরে এই এরকম সময়? আচ্ছা। অনেক আনন্দ দিলেন। আর হ্যাঁ, কখনো কিছু দরকার হলে আমাকে জানাতে যেন কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না।

ওই পণ্ডিতজী যা বলেছেন, আমাকে আপনি মিনিস্টার মনে করবেন না। আমি আপনাদের দাস। আপনার দাস।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুরমা ঠিক স্মরণ করতে পারল না যে নেহরু কখন ওই 'আপনার দাস' কথাটা বলেছেন। কিন্তু খুশি হোলো সদানন্দের অমায়িকতায়। ললিতার স্বভাবই অযথা কুৎসারটনা। ললিতার উপর রাগ হোলো সুরমার।

অন্য কারো উপর রাগ না করলে হয়তো নিজেরই উপর রাগ হোতো।

বীরেন তার নিজের মনের শিকড় খুঁজছিল।

এ তো চোর খোঁজা নয় যে দল বেঁধে ধাওয়া চলবে, যদিও চোরের কথা মনে পড়তেই বীরেনের মনে এলো, 'বাট দি ডে অব দি লর্ড উইল কাম অ্যাজ এ থিফ্ ইন দি নাইট'। কিন্তু সে এইটুকু বুঝেছিল যে এ সন্ধানে তার সাথী মিলবে না, এবং তার প্রয়োজনও নেই। অর্থাৎ জীবনে তার যেই মাত্র সঙ্গিনী মিলল প্রায় সেই সঙ্গেই জীবনের প্রধানতম সন্ধানে আর সঙ্গিনীর প্রয়োজন রইল না।

এতদিন সে বেশ ছিল। অর্থাৎ বেশ ছিল কিনা তাই নিয়ে মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি। তার মানেই কি বেশ থাকা নয়? নিশ্চয়ই। সুখটা পুরোপুরি সবজেক্‌টিভ, আত্মনিষ্ঠ অবস্থা। আমি যদি মনে করি, সত্যি মনে করি, যে আমি সুখে আছি, তাহলে কার প্রতিবাদ করবার অধিকার আছে? 'ও মনে করছে ও সুখী, আসলে তা নয়'—এর মতো অর্থহীন উক্তি আর নেই। যেমন অর্থহীন পেরেকের শয্যায় শয়ান চৌরঙ্গীর ভিখারী-সাধুর জন্যে অশ্রু বিসর্জন। ওর অসুবিধা হচ্ছে না, এইটেই যথেষ্ট। আমি ওকে বলবার কে যে তুলোর তোষক ওর বিছানার চেয়ে বেশি আরামের?

কিন্তু আপাতত এটা অবান্তর তর্ক। আসল, অনিবার্য কথাটা হচ্ছে এই যে বীরেন সচেতন হয়েছে যে সে ছিন্নমূল। মনের দিক থেকে সে উদ্বাস্তু, যেমন উদ্বাস্তু ওই লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী যারা পাকিস্তান থেকে এসে তার বিভাগের কাজ জুগিয়েছে। এখানে এই

পশ্চিম বাঙলার মাটিতে ওরা ডাঙায় তোলা কৈ মাছ, ওদের মন পড়ে আছে পূর্ববঙ্গের নদীতে আর ক্ষেতে।

কিন্তু বীরেনের মন কোথায় পড়ে আছে? সে নিজেই ভালো বুঝতে পারে না। এত দিন তো সে ছিল পরাশ্রিত, বিদেশী শাসনের পক্ষপুটে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট। কিন্তু তখন যেন একথাগুলি এমন স্পষ্টভাবে মনে হয়নি। দু'চারটে আন্দোলনের সময় ছাড়া ঠিক মনে হয়নি যে সে গোরা সৈন্যদের বেয়নেটের উপর কোনোক্রমে বসে আছে। কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। অধিকাংশ সময়েই তার পূর্বতন অবস্থায় নিরুপদ্রব নিরাপত্তা ছিল। ইংরেজ শাসনের অপরিসর কিন্তু পর্যাপ্ত টব্‌টিতে তার শিকড় ছিল। আজ মাটির সে টব্ ফেটে গেছে—তার নিজের বেড়ে ওঠার জন্যে নয়, তাহলে টব্‌স্বাধীন অস্তিত্বের সামর্থ্যও আসতো সেই সঙ্গে—শুধু টব্‌টি আর নেই, আর বীরেন যেন ছড়িয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে। নিজের দাঁড়াবার শক্তি নেই, মাটির তলা থেকে আপন চেষ্টায় প্রাণশক্তি আহরণ করবার ক্ষমতা নেই। এই দুর্বলতার চিন্তাটা প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে বীরেনের মনটা অধিকার করে আছে, তাকে আরো দুর্বল করে তুলেছে। আরো নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। প্রায় পঙ্গু করে তুলেছে।

অথচ কই, আর কারো তো এমন অবস্থা হয়নি। বীরেন মোটামুটি জানতো তার সতীর্থদের বক্তব্য। তবু একদিন সুযোগ পেয়ে কথাটা উত্থাপন করল এডুকেশনের বাগচীর সঙ্গে। বাগচী একদিন তার মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়েছিল কোন একটা সভায়। ফিরবার পথে বীরেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবীতে বাগচীকে বীরেন কখনো দেখেনি এর আগে। বলল, "কী হে, এ পোষাক কেন?"

বাগচী অতি কষ্টে কোঁচাটা সামলে বসে বলল, "যুগধর্ম। আবার কেন? যে কলেজে মিনিস্টার মশাই তিন বার বী. এ. ফেল করেছেন, সেখানে তিনি গিয়েছিলেন আজ সদুপদেশ দিতে!"

বীরেন বাগচীর রসিকতাটা উপেক্ষা করল। তর্কের অনেকগুলি ধাপ ডিঙিয়ে বলল, প্রায় স্বগতোক্তির সুরে, "আচ্ছা, কী করে পারলে অতীতটাকে একেবারে মুছে ফেলতে?"

আই. সি. এস. দের অনেক গুণ আছে, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ তার মধ্যে প্রধান নয়। ওটা শাসিতের সান্ত্বনা; শাসকের বিলাস হয়ে দাঁড়ালে তার ইচ্ছাশক্তি শিথিল হয়, শাসন ক্ষুণ্ণ হয়। ওটা অনাবশ্যক। বাগচীর কর্মদক্ষতার তলায় তার বিস্ময়বোধ যদি একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে না যেতো তাহলে সে বীরেনের প্রশ্নে চমকে উঠতো। বাগচী আদৌ দমল না, বলল, "ডোণ্ট য়ু বিলীভ ইট। আমাদের অতীত আমরা এতটুকুও মুছে ফেলিনি। আগে যা করেছি, এখনো তাই করছি,—ওনলি ফর এনাদার বাঞ্চ্ অব্ মাস্টার্স্।"

"—উইথ এনাদার সেট অব আইডীয়ল্স্।"

"আইডীয়ল্স্ মাই ফুট্!" বাগচী তার চটির সাহায্যে যতটা সম্ভব শব্দ করল। পদাঘাতটা যেন বীরেনের বুকে লাগল।

বাগচী কিন্তু বলেই চলল, "আদর্শের কথা তুলো না। ক্ষমতায় আসীন যে কোনো ব্যক্তির বা দলের শুধু একটি মাত্র আদর্শ আছে, এবং তা হচ্ছে ক্ষমতায় আসীন থাকা। ইংরেজের আমলে তাই ছিল, কন্গ্রেসীদেরও দ্বিতীয় কোনো অভিসন্ধি নেই, এবং এর পরে যারা আসবে তাদেরও ঠিক ওই একই উদ্দেশ্য থাকবে।"

"এবং সেই চক্রান্তে আমাদের কাজ হচ্ছে—"

"আমাদের কাজ হচ্ছে আনুগত্য, দক্ষতা ও সততার সঙ্গে যথাসম্ভব সাহায্য করা। উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের ভার আমাদের উপর নয়, আমরা শুধু উপায়।"

"কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে সেই উপায় নিয়ন্ত্রণেও তো আমাদের মানুষ বলে গণ্য করছ না। তোমার কথা ঠিক হলে আমরা তো যন্ত্র মাত্র। ইনস্ট্রুমেণ্ট্স্ অব্ টিরান্যানি।"

"কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। আমার মতে সিভিল সার্ভিসের আদর্শই হচ্ছে এই যে তা যতদূর সম্ভব যন্ত্রের মতো হবে।"

"যতদূর সম্ভব—দ্যাট্স্ দি অপরেটিভ ফ্রেজ্, এবং তুমি ভালো করেই জানো যে তা খুব বেশি দূর সম্ভব নয়। আমরাও আর সবাইয়ের মতো মানুষ।"

"না। তাহলে আমরা ভালো সিভিল সার্ভেণ্ট নই।"

হঠাৎ সুরমা আসাতে তর্কে ছেদ পড়ল। সে বলল, "আপনারা যে ভালো সিভিল সার্ভেণ্ট ন'ন একথা কে কবে অস্বীকার করেছে যে এত জোর গলায় কথাটা বারবার বলতে হচ্ছে?"

·বাগচী আশানুরূপ হাসল। কিন্তু বীরেন তার সমস্যার এই লঘুকরণে নিরাশ হোলো। মনে মনে বলল, বাগচীর সঙ্গে তর্ক করা মিছে। ও বদ্‌লে গেছে। কলেজ য়ুনিয়নে যে বাগচী বক্তৃতা দিতো তার মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন। আজকের বাগচী সীনিক, নিজেকে নিষ্প্রাণ নির্বিবেক যন্ত্রমাত্র মনে করতে আজ তার আপত্তি নেই। সিভিল সার্ভিসের জন্যে ওর মিলিটারি যুক্তি : আদেশ মানার জন্যে সাজা নেই, সে আদেশ যাই হোক। বীরেন সিভিল থাকতে চায়। তাই এযুক্তি ওর মনঃপূত হয় না।

বাগচী সুরমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, "তা আপনারা যাই বলুন না কেন, সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহরু তা মনে করেন না, অ্যাণ্ড দ্যাট'স অল আই নো অ্যান্ড অল আই নীড টু নো অন আর্থ।"

বীরেন ধৈর্য হারাল। বলল, "দ্যাট ইজন'ট। এখনো তোমার সেই পুরানো মা-বাপ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গেছে। মা-বাপ মানে অবিশ্যি এই নয় যে ওই সরকার কখনো প্রজাদের অপত্যজ্ঞানে স্নেহ করেছিল, আমি ইংরেজ সরকারকে মা-বাপ সরকার বলি শুধু এই জন্যে যে আমরা বরাবর ওদের মা-বাপ বলে মনে করেছি, নির্ভর করেছি ওদের রক্ষার উপর, চেষ্টা করেছি ওদের খুশি রাখতে, খুশি রেখে আরো অনুগ্রহ আদায় করতে। একবারও দেশের লোকের মতামতের কোনো খোঁজ নিইনি।" বীরেনের গলায় অভিযোগের চেয়ে অনুতাপের সুর বেশি ছিল।

বাগচী তাই রাগ করল না। হেসে সুরমাকে বলল, "আমি কোথায় সভা থেকে ফিরে এক মুহূর্তের জন্যে এসেছি বাড়ি যাবার পথে শুধু আপনাদের খবর নিয়ে যেতে, আর দেখুন তো, বীরেন কী বাজে তর্ক জুড়ে দিয়েছে।"

বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যাণ্ড নাউ টু টার্ন টু য়ু, আমরা যে দেশের লোকের দিকে তাকাইনে এটাই রক্ষে। নইলে আমরাও এই পলিটিশানদের মতো করাপ্ট্ হতুম। যেমন ওই বি. সি. এস.

থেকে প্রোমোটেড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা হয়ে থাকে। এবং, লজ্জার কথা, আমাদের মধ্যেও দু'চার জন হয়েছে। তারা বার লাইব্রেরির ওই উকিল-গুলোর পরামর্শ ছাড়া এক পা এগোয় না, সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে কে কখন কাগজে একটা চিঠি লিখে দেবে বা মিনিস্টারের কাছে বেনামী চিঠি পাঠাবে। কখনো কোনো ডিসীশন পাবে না ওদের থেকে। ওরা একটা কাগজ-পেন্সিলের দোকান চালাবার যোগ্য নয়, লেট এলোন রানিং এ ডিস্ট্রিক্ট।" বাগচী সুরমার দিকে চাইল সমর্থনের আশায়। নিরাশ হোলো না।

কিন্তু বীরেনের মুস্কিল এই যে, সে এই আই. সি. এস. ব্রাহ্মণ্যে আস্থা আর রাখতে পারছে না। ডিসীশন, এফিসিয়েন্সি,—এই নতুন দেবতাগুলিতে তার ভক্তি আর অটুট নেই। কিন্তু সে বুঝেছিল যে বাগচীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। মত ও বিশ্বাসের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব অনতিক্রমণীয় ও ক্রমবর্ধমান।

বাগচী চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। যাবার আগে তর্কে তার শেষ যুক্তিটা কলেজ-দিনের নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে বলল, "আর দেশের লোকের কথা বলছিলে না? ওদেরও খবর ঠিকই নেয়া হচ্ছে। ওরাই তো ভোট দিয়ে নেহরু-প্যাটেলকে ক্ষমতায় বসিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তাঁদের ইচ্ছাই ওদের ইচ্ছা। গণতন্ত্রের কাজ কি এমনি করেই হয় না? যদি বলো দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই তাহলে তুমি নেহরু-প্যাটেলের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করছ। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। আমরা মিনিস্টারদের খুশি রাখি মানেই জনতার হুকুম তামিল করি। তাই নয়?"

সুরমা আবার নিঃশব্দে তার সমর্থন জানাল। কিন্তু আপন মনে বীরেন কী ভাবছিল সেই জানে। বোঝা শক্ত ছিল না যে, উত্তর না দিলেও, বাগচীর মতের সঙ্গে তার বিশ্বাসের দুস্তর প্রভেদ। বীরেন ম্লান হাসির সঙ্গে বাগচীকে বিদায় দিল। আবার তার নিজের চিন্তায় মগ্ন হোলো। সে বুঝেছিল যে বাইরের লোকের সাধ্য নেই তার মনের বিরোধের মীমাংসা করা। নেহরু-প্যাটেল ক্ষমতায় আসীন হয়ে দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে, অন্য দু'টো মানুষ হয়েছে,

দেশপ্রেমিক বদ্‌লে গিয়ে ক্ষমতালোভী নেতা হয়েছে—এসমস্ত কথা তার ভাবতেও খারাপ লাগে। না কি আর সকলের মধ্যে সে তার নিজের পরিবর্তনের প্রতিফলন খুঁজে মরছে? সে নিজে ঠিক ভাবছে, আর পৃথিবীর আর সবাই ভুল, এমন কথা চিন্তা করবার মতো আত্মম্ভরিতা তার নেই, কিন্তু—।

বীরেনের এই পরিবর্তনটা যতই অন্তরের অন্তর্লোকের হোক না কেন, বাইরেও তার লক্ষণগুলি অন্যান্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাগচীও একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। সুরমার সঙ্গে বেরুতে বেরুতে আস্তে আস্তে বলল, "বীরেনের কী হয়েছে বলুন তো? কিছু দিন থেকে দেখছি ও একটু যেন মর্বিড, বড়ো বেশি ইন্‌ট্রস্‌পেক্‌টিভ হয়ে পড়েছে।"

সুরমার চেয়ে ভালো কে জানে এই বদলের কথা? ওরা দু'জনে একটা বাড়িতে আছে যেন একটা হোটেলে আছে—দেখা শুধু খাবার টেবিলে। ভদ্রতার অন্ত নেই, কিন্তু ভদ্রতা কোন স্ত্রী কবে চেয়েছিল তার স্বামীর কাছে? বীরেন অফিস থেকে বাড়ি আসে যেন আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে। কোনো পার্টিতে যায় যেন শুধু সুরমাকে নিয়ে যেতে হবে বলে। বাকি সারাক্ষণ কোনো না কোনো বই নিয়ে আছে। এত দিন তবু ইংরেজি বই আসতো, সুরমা একটু-আধটু উল্টে দেখতে পারতো। এখন আসছে কী সব সংস্কৃত বই, আর তা নইলে দর্শনের বই। গত কয়েক মাসের মধ্যে বীরেন সুরমার সঙ্গে যে ক'টি কথা বলেছে তা হাতের আঙুলে গোণা যায়, এবং তার সবগুলিই সুরমার প্রশ্নের উত্তরে। কখনো সুরমার দিকে চাইলে এমন করুণভাবে তাকায় যে সুরমার মায়া হয়। তাই ঝগড়াও করতে পারে না। সুরমা মর্মে মর্মে জানতো এসব, কিন্তু এ তো বাইরের লোককে জানাবার নয়। তাই বাগচীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, "কই, আমি কিছু লক্ষ্য করিনি তো। বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

বাগচী আর প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। বলল, "বোধহয় তাই হবে। তা—আজ আসছেন তো অ্যামেরিকান কনস্যুলেটের পার্টিতে?"

"হ্যাঁ যাবো। তবে একটু দেরিতে। আচ্ছা, পরে দেখা হবে।"

বাগচীকে বিদায় দিয়ে সুরমা বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখল বীরেন তখনো আপন মনে বসে আছে প্রস্তরমূর্তির মতো। সুরমা বুঝেছিল বাগচী তার ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেনি। সুরমা জানতো বাগচী এ সম্বন্ধে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবে, এবং ক্রমে কথাটা সর্বত্র কানাকানি হবে যে বীরেন আর সুরমার মধ্যে—ওদের পরিভাষায়—অল্ ইজ্ নট্ ওয়েল। তার পরে চলবে গবেষণা। তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?—এ জিজ্ঞাসা করবে ওকে। ও বলবে একে—আমি কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু সম্প্রতি সুরমা দেবীকে একটু ঘন ঘন যেন দেখা গেছে ব্র্যাংকের সঙ্গে। ও বলবে আরেক জনকে—বীরেন চাটুজ্জেকেও আমি দেখলুম সেদিন—এর সঙ্গে।

সুরমা তার অবহেলা নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু বাইরের এই কুৎসিত কানাকানি সে হতে দেবে না। বীরেন এর কিছুই জানবে না, শুধু সুরমাকে সহ্য করতে হবে নানা জনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। না, ঘরের ট্র্যাজেডিকে সে বাইরের প্রহসনে পরিণত হতে দেবে না।

সুরমা শব্দ করে পায়চারি করতে লাগল বীরেনের সামনে দিয়ে। অনাবশ্যকভাবে চুড়ির শব্দ করল বারকতক। বীরেন তেমনি নিরুত্তর। একটা বই হাতে নিয়ে ইচ্ছা করেই সেটাকে হাত থেকে পড়ে যেতে দিল। বীরেন একবার ওদিকে তাকিয়ে আবার তার নিজের বইয়ে মনোনিবেশ করল। সুরমার ইচ্ছা হোলো সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কী নিয়ে আমার ঘরের ট্র্যাজেডি অন্তত সেটুকু আমায় বলবে তো?

কিন্তু পারল না। যতটুকু অন্তরঙ্গতা থাকলে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় সেটুকুও যেন নেই ওদের মধ্যে। অথচ যতটা শত্রুতা থাকলে স্পষ্ট ঝগড়া করা যায়, সেখানেও ওরা পেঁছোয়নি এখনো। এমন এক সংজ্ঞাহীন শূন্যতায় ওদের অবস্থান সেখানে প্রশ্ন করার মতো স্পর্শযোগ্য নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। অথচ অনুত্তরতার দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হয়। মূক ব্যথা অন্ধ অধৈর্যে বধির বীরেনকে সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুরমা শুধু বলতে পারে, "আজ অ্যামেরিকান কনসালের পার্টির কথা তোমার মনে নেই বোধহয়।"

স্বপ্নোত্থিতের মতো বীরেন বলল, "ও হ্যাঁ, তাইতো। একেবারে

ভুলে গিয়েছিলুম।” আনন্দশূন্য হাসির সঙ্গে কৃতজ্ঞতাশূন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যোগ করল, “ভাগ্যিস মনে করে দিয়েছ। ক’টা বাজল?”

বরফজমানো কণ্ঠে সুরমা উত্তর দিল, “সওয়া ছ’টা।”

বীরেন তৈরী হয়ে নিতে পাশের ঘরে চলে গেল। সুরমা লক্ষ্য করল যে ওর চলে যাওয়ায় ঘরটার এতটুকু পরিবর্তন ঘটল না। যেন একটা জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে যায়নি ঘর থেকে। একটা চেয়ার এদিক থেকে ওদিকে সরালেও বুঝি ঘরটার বেশি বদল হোতো। এমন আসবাবের সঙ্গে সুরমা বাস করবে কী করে?

সুরমা নিজেও তার পোষাক বদলাতে গেল। কিন্তু এর জন্যে এক কণা উৎসাহও তার অবশিষ্ট ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল কখন তার চোখের কোণে দু’ফোঁটা জল এসে গেছে। নিজেও জানতে পারেনি। সুরমার ধারণা ছিল তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, কাঁদতে সে ভুলে গেছে। উল্টো দিকের ঘরটার পর্দাটা হাওয়ায় একটু উড়তেই সুরমা দেখল বীরেন পোষাক পরতে পরতে থেমে গেছে, মোজাটা হাতে নিয়ে কী যেন ভাবছে।

সুরমার এবারে সত্যি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। প্রসাধন স্থগিত রেখে বীরেনের ঘরের দরজার সামনে এসে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, “তোমার কী হয়েছে বলো তো?”

বীরেন চমকে উঠে বলল, “কই কিছু না তো!” আবার মোজা পরতে পরতে বলল, “কী আবার হবে? কী আবার হবে?” ইতস্তত করতে করতে এমন ম্লানভাবে আবার সুরমার দিকে চেয়ে হাসল যে আবার সুরমার করুণা হোলো। আবার ঝগড়া করা হোলো না। অভিযোগ, অভিমান জমতে লাগল। নিজের ঘরে ফিরে সুরমার মনে হোলো, আচ্ছা, বীরেনকে বিষণ্ণ দেখলে সুরমার এত মায়া হয়, আর সুরমার জন্যে একটু মায়া হয় না বীরেনের?

কিন্তু বীরেনের মনে সুরমার প্রশ্নটা কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। তার নিজের মনের অশান্তি—না, অশান্তি নয়, শুধু ধূসর একটা অনিশ্চয়তা

—সে ভেবেছিল তার মনের তলায় লুকানো আছে। বাইরের লোকের কাছেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ল কী করে? তাহলে সত্যি কি তার কিছু হয়েছে? সামনের আয়নাটায় প্রশ্নের উত্তর মিলল না, বীরেনের মনে সন্দেহটা রয়ে গেল।

অজ্ঞানকৃত কোনো অজ্ঞাত স্খলনের সংশোধনের জন্যে বীরেন সাজ সারা হতেই নিজে থেকে সুরমার ঘরে এলো। যতদূর সম্ভব চেষ্টা গোপন করে হেসে বলল, "আরে, তোমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তো?"

সুরমা বীরেনের দিকে তাকায়নি। নিরাবেগ কণ্ঠে পাউডার মুছতে মুছতে বলল, "আমার তাড়াতাড়ি হয়নি, তোমার দেরি হয়েছে।"

বীরেন বুঝেছিল সে অন্যায় করেছে। আস্তে আস্তে পিছন থেকে এসে সুরমার ঘাড়ে সে হাত রাখল সস্নেহে। সুরমা বীরেনকে দেখল আয়নায়। এত কাছাকাছি আসেনি ওরা অনেক, অনেক দিন। সুরমা নিজেকে অভিশাপ দিল বীরেনের উপর একটু আগে রাগ করবার জন্যে। এক মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল অতীতের অল্পসংখ্যক কিন্তু অবিস্মরণীয় তুলনীয় সুখের মুহূর্তগুলি।

কিন্তু সুখ তো একটা ঘটনা নয় যা বর্ণনা করে অপরকে বোঝানো যাবে। শুধু অপরকে কেন, নিজেকে বলাই কি সোজা? ঘটনা হচ্ছে, ওরা দু'জনে একদিন এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজেছিল। এমন কী অসাধারণ এই ব্যাপারটা? কিছুই নয়, তবু আজো সেকথা মনে পড়লে সুরমার মন পুলকে ভিজে যায়। একদিন ওরা পুরীতে সমুদ্রের একেবারে কাছে পাশাপাশি বসে ঝিনুক কুড়িয়েছে শিশুর মতো ভাবনা-হীন আনন্দে। এমন তো আরো কত লক্ষ লক্ষ নরনারী পুরীতে গেছে এবং ঝিনুক কুড়িয়েছে। তবু সুরমার জীবনে ওটা একটা অসামান্য ঘটনা হিসাবে স্মৃতিতে চিরতরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। আজো সেই ঝিনুক কুড়োবার কথা মনে এলে আনন্দের ঢেউ লাগে সারা গায়ে। কিন্তু

সুখ মাত্রেই অনির্বচনীয়। সে একটা হঠাৎ ভেসে আসা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ। সমুদ্রতীরের অজস্র বালুরাশির মধ্যে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এক কণা মুক্তো, হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করবার আগেই নিষ্ঠুর তরঙ্গরাশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

না, সুরমার আর কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে জীবনের দু'তিনটে মুহূর্তভগ্নাংশে সে এমন কিছু অনুভব করেছিল যার নাম বোধহয় সুখ। এর বেশি নয়। অন্তত বলার মতো এর বেশি কিছু নেই।

বীরেন বলল, "সুরমা, আজ পার্টিতে না হয় নাই গেলুম। চলো, তুমি আর আমি কলকাতার বাইরে নির্জন কোথাও গিয়ে বসি।"

সুরমা এর চেয়ে বেশি কী চাইতে পারতো? তাব ইচ্ছা হোলো সে উঠে দাঁড়িয়ে বীরেনকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু কী যেন হয়ে গেছে ওদের দু'জনের মধ্যে। কোনো উচ্ছ্বাসের উত্তাপকে ওরা যেন ভয় পায়। সুরমা শুধু বীরেনের হাতটা হাতে নিয়ে তার উপর মুখ রাখল আস্তে। পরে হাতটা বুলিয়ে নিল সারা মুখে।

বীরেনও যেন হঠাৎ অনেকক্ষণ সুরমার সঙ্গে একা থাকার সম্ভাবনায় ভয় পেল। কী বলবে সে সুরমাকে? তার কী যে সমস্যা সে নিজেই ভালো করে জানে না, সুরমাকে বলবে কী? আর যতটুকু জানে সে তো কাউকে বলবার নয়, সুরমাকেও নয়। আগেকার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবার জন্যেই বলল, "গিব্‌সন্‌ অবিশ্যি বারবার করে বলেছে, না গেলে অন্যায় হবে। তুমিও বোধহয় বাগচীকে কথা দিয়েছ, না?"

বাগচীর কথা মনে হতেই সুরমার মনে পড়ল বাগচীর ইঙ্গিত। তার উপর এখন যদি ওরা পার্টিতে না যায় তাহলে বাগচী নিশ্চয়ই ওদের অনুপস্থিতিতে তার সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পাবে। ডায়মণ্ড-হারবারে বা ব্যারাকপুরে বীরেন আর সুরমা যে পরস্পরকে পুনরাবিষ্কার করবার সুযোগ পেতো, সুরমার সেই অমূল্য পুরস্কারের কথা মনেও

এলো না। বাগচী কী ভাববে, সেইটেই হোলো সব চেয়ে প্রথম বিবেচ্য প্রশ্ন। সুরমার জীবনে এই পরিবর্তনটা ইতিমধ্যেই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল যে তার সমাজের আর সকলের মতো সেও আপন সুখের চেয়ে পরের মতের বেশি মূল্য দিতো। বীরেনের প্রশ্নের উত্তরে তাই সুরমা বলল, "হ্যাঁ। যেতেই হবে। তবে, বেশিক্ষণ থাকব না। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে আর কোথাও যাওয়া যাবে।" জীবনে পরম লগন সুরমা এমনি করেই হেলা করল।

অ্যামেরিকান কনস্যুলেটে পেঁাছে সুরমা হারিয়ে গেল তার নিজের দলে। বীরেন একা ভীড়ের মধ্যে এদিক ওদিক আসা যাওয়া করতে থাকল পরম অস্বস্তির সঙ্গে। পার্টিতে সমবেত প্রত্যেকের সঙ্গে সে তার নিজের ছন্দের এমন একটা ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ করল যে তার ইচ্ছা করছিল না কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে। বীরেন বেশি বিরক্ত হয়েছিল তাদের উপর যাদের সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য; বেশে, মর্যাদায়, ও শিক্ষায়। সে তাই সবাইকে এড়িয়ে এগিয়ে গেল ধুতী-পরা এক বাঙালী সাংবাদিকের কাছে। বেচারী যতটা সম্মানিত হোলো, তার বেশি বিব্রত হোলো। আলাপ সুরু করবার জন্যেই বীরেন বলল, "কী, আপনি এই শত্রুর সভায় যে?"

"হে হে, আমি সব জায়গায়ই আছি। রামগড়েও, রাবণগড়েও।"

বীরেন ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু হাসল। সম্পাদক মশাই নিজেই ব্যাখ্যা করে বললেন, "আপনার বোধহয় মনে নেই, না? সেই যে রামগড়ে যেবার কন্‌গ্রেস হোলো, আর সুভাষবাবু তাঁর নিজের কন্‌গ্রেস করলেন তারই অদূরে আরেকটা জায়গায়। আমি সকালে খেতুম এমহলে, আর বিকেলে ওমহলে। হে হে।"

বীরেন আর কিছু না পেয়ে বলল, "আপনি তাহলে সত্যিকার নিউট্রাল বলুন?"

"তা যা বলেছেন। আমি এখানেও আছি, চাইনিজ্ কনসালেটেও আছি, আবার য়ু. কে. হাই কমিশনেও আছি।"

এ কি সত্যকার সমন্বয়, না সুবিধাবাদ? বীরেনের মনে এই প্রশ্নটা নানা আকারে বহু দিন থেকে জেগে ছিল। বলল, "বিপরীতগুলির মধ্যে এই সামঞ্জস্য ঘটালেন কী করে?"

সাংবাদিক মশাই বিনামূল্যে মদ্য পেয়ে ইতিমধ্যে একটু অধিক পান করেছিলেন। বুদ্ধি তাতে একটু ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল—একটু মাত্র, এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না—কিন্তু সেই সঙ্গে হীনতাজাত লাজুকতাও কেটে গিয়েছিল। বীরেনের প্রশ্ন উপেক্ষা করে তাই তিনি একান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, "আমরা জর্নালিস্টরা ওই রকম। আমাদের সম্মান সব জায়গায়। আমাদের খুশি না রাখলে কারোই চলে না।"

বীরেন কিছুই বুঝল না। রূঢ় হবার ভয়ে জিজ্ঞাসাও করতে পারল না যে খুশি রাখলে কী হয়, বা খুশি করতে পারলে কী ভাবে সংবাদপত্রের মতের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরেই বলল, "তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

সম্পাদক মশাই বলে চললেন, "আপনাদের আমলে, অর্থাৎ ইংরেজদের আমলে, হে হে"—(বীরেনের আবার তার সমস্যার কথা মনে পড়ল)— "আমি একবার লিখেছিলুম এক কড়া প্রবন্ধ হিজলীর গুলির পরে। চীফ্ সেক্রেটারি আমাকে তাঁর বাড়িতে ডাকলেন, ডেকে গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার আমরা বন্ধু।' আমি বললুম, 'নো, তুমি আর আমি বন্ধু হবো কেমন করে?' সোজা চলে এলুম ওখান থেকে। আসবার আগে একবার প্রেস অফিসারের চাকরির কথাও বলল। কিন্তু আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলুম, চাকরির ঘুষ দিয়ে আমায় কিনতে পারবে না, সাহেব। সাংবাদিকতা আমার ব্রত, পেশা নয়; জাতীয়তা আমার বিশ্বাস, ওটা বেচাকেনার সামগ্রী নয়।" নিজের গৌরবের স্মৃতিতে অবগাহন করে যোগ করলেন, "আঃ—দিন ছিল বটে সেদিন!"

"আর আজ?" বীরেন জিজ্ঞাসা করল।

"আজকের কথা বলা নিরাপদ নয়। আমার কাগজের মালিকও এপার্টিতে আছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আজ আর সেই প্রেরণা নেই। এখনো সাংবাদিকতা করি বটে, কিন্তু আগে যেমন প্রতি সন্ধ্যায়

একটা প্রবন্ধ লিখে মনে হোতো, হ্যাঁ, দেশের কাজ করছি, আজকাল আর তেমন হয় না।" সাংবাদিকের স্বরে সত্যি দুঃখের রেশ ছিল।

বীরেন বলল, "আর, আজকাল কী মনে হয়?"

"আজকাল? মনে হয় চাকরি করছি। একটা প্রবন্ধ লিখছি, তার বদলে একটা চেয়ার তৈরী করলে, বা কারখানায় একটা সাইকেল তৈরী করলেও কোনো তফাৎ হোতো না।"

বীরেন দেখল এরও অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিরোধ। যে-স্বাধীনতার জন্যে সত্যি কাজ করেছে, জেলে গেছে, বিনা মাইনেয় মাসের পর মাস অর্ধাহারে খবরের কাগজে চাকরি করেছে, তবু প্রেস অফিসারের চাকরি নেয়নি,—আজ সেই স্বাধীনতা এলেও ওর কেন মনে হচ্ছে ওর জীবনের সার্থকতা শেষ হয়ে গেছে? তবু বীরেন সাংবাদিককে ঈর্ষা করল, ওঁর তবু নিজেকে অপরাধী মনে করবার কারণ নেই। যেমন বীরেনের আছে। বীরেন এদের জেলে পাঠিয়েছিল, আজ ওদেরই চাকরি করছে। বীরেনের কানে আবার তার চার দিকের কোলাহল বেসুরো শোনাতে লাগল—যেন কণ্ডাক্টর আর বাদকরা চা খেতে গেছে, আর সেই অবসরে একদল জানোয়ার ঘরে ঢুকে বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে যা খুশি তাই করছে—এ লাফাচ্ছে পিয়ানোটার উপর, ও বেহালাটাকে কাঁদাচ্ছে, আর কেউ ড্রামটা পিটছে প্রাণপণে। সঙ্গীতের পরিবর্তে শুধু গোলমাল হচ্ছে, কিন্তু বাঁদররা তাইতেই খুশি।

ঘর ভর্তি এক-হাঁটু হুইস্কি।

তাই বুঝি সবাইরই চলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। ঘরের আরেক কোণ থেকে ভীড় ঠেলে একজন বীরেনের দিকে এগিয়ে এলো। তারও পোষাক অধিকাংশ ভারতীয় অতিথির মতো। সাদা গলাবন্ধ কোট, কালো ট্রাউজার্স। বীরেন অন্যান্য প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই একটু হেসে বলল, "কর্নেল আজ সিভিজে কেন? আর্মি ছেড়ে কম্প্যানি-প্রোমোটার হয়েছ নাকি?" বলা বাহুল্য, এমন প্রশ্ন করার মতো অন্তরঙ্গতা ছিল দু'জনের মধ্যে।

কর্নেল লাহিড়ী সৈনিকোচিত অট্টহাস্যের পরে বললেন, "গেরুয়া যে পরায়নি বরাত ভালো। দু'দিন বাদে সেই ব্যবস্থা হলেও বিস্মিত হব না।"

একান্ত অকারণে বীরেন আবার আঘাত পেল। গৈরিকের সম্বন্ধে একান্ত নির্দোষ পরিহাসও বীরেনের এখন আর ভালো লাগে না। ওটা তার কাছে শুভ্রতার প্রতীক, চতুর্দিকের ঘন কালো থেকে পরমা নিষ্কৃতি। বীরেন চুপ করে রইল।

কর্নেল অফিসার'স মেসের রাম্-এর পরিবর্তে (ওটাই নাকি এখন সর্বাধিক বেশি চলে) ভদ্রতর পানীয় পেয়েছে। সুযোগের অপব্যবহার করেনি। সে তাই আপন মনে বলে চলল, "সিভিজ ইন্‌ডীড্! আমাদের যা করতে হচ্ছে তা ধুতি প'রেই করা সুবিধা। সারা জীবন যা শিখে এলুম তার সব কিছু এখন ভুলতে হবে। অথচ—"

বীরেনের তর্কে প্রবৃত্তি ছিল না। কর্নেলকে শান্ত করবার জন্যেই সান্ত্বনার সুরে বলল, "বদল হয়েছে, বদলাতে হবে বৈকি। তোমাদেরও, আমাদেরও।"

কর্নেল বীরেনকে শেষ না করতে দিয়ে বলল, "দ্যাটস হোয়ট আই উড্ লাইক টু নো। কোথায় বদল হয়েছে। বদল হলে তো কোনো কথাই ছিল না। ভারতবর্ষের জন্যে আগেও দুশ্চিন্তা ছিল না, আজো থাকতো না। স্বচ্ছন্দে এই ভেজিটারিয়ান আর্মি ছেড়ে দিয়ে ফরেন লিজনে গিয়ে নাম লেখাতুম। পেশাদার সৈনিক পেশাদার সৈনিকই থাকতুম।"

উত্তেজিত কর্নেলকে নিরস্ত করবার জন্যে বীরেন আবার বলল, "আহা, তাই থাকো না। কে তোমাকে বলছে আর-কিছু হতে?"

ফল বিপরীত হোলো। লাহিড়ী আরো উত্তেজিত হয়ে বলল, "কে বলছে না? সবাই বলছে।" সে সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন পর্যন্ত বিস্মৃত হোলো। গলা একটুও খাটো না করে বীরেনকে বলল, "সবাই বলছে। নেহরু বলুক। উনি পলিটিশান। কিন্তু কারিয়াপ্পা পর্যন্ত জোয়ানদের প্যারেডে বারবার বাপুজী বাপুজী করে হাততালি আর মালা কুড়োচ্ছেন। তুমিই বলো, আমরা লড়াইয়ের লোক, সূক্ষ্ম বুদ্ধির বালাই

নেই, দরকারও নেই। কিন্তু হয় বাপুজী ঠিক, নইলে ক্লাউজেভিৎস্ ঠিক। দুটোই একসঙ্গে ঠিক হতে পারে না। অথচ এরা নাকি আমাদের এই দু'জনেরই শিষ্য না করে ছাড়বে না। বলো, তুমিই বলো, আমি আমার জোয়ানদের কী বোঝাব। কারিয়াপ্পা তো বক্তৃতা দিয়েই চলে গেলেন, আমার ওদের সঙ্গে রোজ কাজ করতে হয়। আমি কি ওদের বলব কাউকে হত্যা করা অন্যায়, না ভালো করে শত্রুকে হত্যা করতে শেখাব? দামামা বাজাতে শেখাব, না মৃদঙ্গ বাজাতে বলব?"

মৃদঙ্গের উল্লেখে বীরেন আবার উদাস হোলো। সে নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারে না, কর্নেলকে কী বলবে? তার নিজেরই সমস্যার অন্ত নেই, সে কর্নেলকে কী সমাধান বলে দেবে?

কর্নেল বলল, "বুঝলে বীরেন, নতুন যারা এসেছে তারা বেশ আছে। আর্মি ওদের কাছে অন্য যে কোনো চাকরির মতো। কিন্তু আমি কিছুতেই পুরোপুরি মার্সিনারি হতে পারলুম না, তা গান্ধী যাই বলুন না কেন। আমি যুদ্ধ বুঝি, গান্ধীকেও বুঝি—অল্‌দো আই ডোণ্ট কেয়ার ফর হিজ ফিলসফি—কিন্তু বন্দুক হাতে নিয়ে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' অ্যাণ্ড অল দ্যাট ননসেন্স্—ইট মেক্‌স্ মি সিক্। এই ভণ্ডামি আমি সহ্য করতে পারি না। আমার কথা হচ্ছে—"

বীরেন কী একটা অজুহাত দিয়ে কর্নেলকে অন্য কারো কাছে সঁপে দিয়ে সরে এলো সেখান থেকে। কিন্তু সমস্যাটা অত সহজে সঙ্গ ছাড়ল না। বীরেনেরও মনে হয়েছে ওটা ভণ্ডামি। কিন্তু এখন তার নেহরুর জন্যেও একটু অনুকম্পা হোলো। হয়তো ভণ্ডামি নয়। হয়তো দুর্বলতা মাত্র, মনস্থির করতে অক্ষমতা। বীরেনও তো সেদিক থেকে পঙ্গু। সে কার গায়ে ঢিল ছুঁড়বে? সেও তো পারছে না তার বর্তমানকে প্রত্যাখ্যান করে দু'হাত দিয়ে নবাবিষ্কৃত ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরতে। তারও অবস্থিতি তো দু'নৌকায়।

বীরেনের ইচ্ছা হোলো তখনি বাড়ি ফিরে যেতে। তাই সে সুরমাকে খুঁজতে লাগল। দেখল দূরে একটা জায়গায় সুরমা মোটা

একটা শাদা খদ্দরের শেরোয়ানি পরিহিত কারো সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলছে। সামনে গিয়ে চিনতে পারল। সদানন্দকে রীতি অনুযায়ী অভিবাদন জানিয়ে সুরমাকে বলল, "চলো, এবার আমরা যাব।"

সদানন্দ তার নিম্বুপানির গ্লাসটা নেড়ে বলল, "না, না, এত শিগগির যাবেন কি?" সুরমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলেন? এখন বাড়ি ফিরে করবেন কী?"

সুরমা বলল, "না, কাজ কিছু নেই। তবে বীরেন আবার ভীড় পছন্দ করে না, তাই—"

সদানন্দ বলল, "ঠিক আমার মতো দেখছি। আমিও ভীড় একেবারে সহ্য করতে পারি না।"

বীরেনের এই তুলনাটা ভালো লাগল না। তবু হাসল, বলল, "না, ভীড়ের জন্যে ঠিক নয়। এমনিতেই আমার একটু মাথা ধরেছে।"

সদানন্দ তৎক্ষণাৎ বলল, "ওঃ হো, তাহলে তো আপনার যাওয়াই উচিত। ভীড়ের মধ্যে মাথাধরা তো আরো বাড়বেই। তা—সুরমা দেবী যদি এখন না যেতে চান, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি অনায়াসে ওকে পৌঁছে দেব। না, না, কিছু অসুবিধে হবে না। কী বলেন সুরমা দেবী?"

সুরমা কিছু বলল না, কিন্তু বীরেন অবাক হয়ে গেল যে সদানন্দের প্রস্তাবে তার যেন স্বীকৃতিই ছিল। বীরেনের অনুমতি পেলেই যেন সে খুশি হয়। বীরেন বলল, "তবে তাই হোক। আমি সত্যি আর থাকতে পারছি না।" বীরেন চলে গেল। যাবার আগে সদানন্দের কাছ থেকে ভালো ভাবে বিদায় পর্যন্ত নিল না।

সুরমা স্বামীর হয়ে ক্ষমা চাইল সদানন্দের কাছে, "ওর সত্যি ভীষণ মাথা ধরেছে। আমারও ওর সঙ্গে গেলে হোতো।"

"মোটেই নয়। মাথাধরার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে একটা অ্যাস্পিরিন খেয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে একা শুয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়া।"

সুরমার তবু যেন মনটা কেমন করতে লাগল, বলল, "মিস্টার ঘোষ, তার চেয়ে আপনি চলুন আমাদের বাড়ি। ওখানে বসে গল্প করা যাবে।"

সদানন্দ হাতে স্বর্গ পেল। অযথা কালহরণ না করে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলল, “তাই চলুন। মিস্টার চ্যাটার্জি অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন, দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা। আমার গাড়িতেই অ্যাস্পিরিন আছে।” হঠাৎ শংকার সুর সরাসরি পরিহার করে, “কিন্তু সুরমা দেবী, আপনি আজ আমাকে যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করছেন তার জন্যে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করলেও, আমি করব না।”

সুরমার সত্যি ইচ্ছা ছিল না বাড়ি যাবার। কিন্তু তার কর্তব্য-বোধের অবশিষ্টাংশ তাড়না করছিল। বলছিল, বীরেনের পাশে যাও। সে এখন একা। সে তোমাকে চায়। এই শেষের কথাটা সম্বন্ধে সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিল না। সত্যি বীরেন কি সুরমাকে চায়? তাহলে সুরমার আজ এদশা হবে কেন? কেন সে বীরেনের সঙ্গে থাকার চাইতে সদানন্দের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে? প্রায় বেপরোয়া সুরে বলল, “না, মিস্টার ঘোষ, আমিও বাড়ি যেতে চাইনে, কিন্তু—”

সদানন্দের সম্মুখে সুবর্ণ সুযোগ। বলল, “কিন্তু কী সুরমা দেবী?”

“কিন্তু কী তা কাউকে বলবার উপায় নেই, মিস্টার ঘোষ; আপনাকেও না।”

সদানন্দ বুঝল তার যুদ্ধ অর্ধেক জেতা হয়ে গেছে। বলল, “আমি এমন কথা জানতে চাইব না যা আপনি আমাকে বলতে চান না।” সদানন্দ জানতো কাউকে কিছু বলাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাকে তা বলতে বারণ করা, কৌতূহল গোপন রাখা।

সুরমা ভ্রাম্যমান বেয়ারার কাছ থেকে আরেকটা গ্লাস নিয়ে বলল, “কিন্তু আমি যে কাউকে বলতে চাই, মিস্টার ঘোষ। বীরেনকে বলতে পারিনে, তার শোনবার সময় নেই।”

সদানন্দ একটা রসিকতার সুযোগ পেল, বলল, “আমাদের মন্ত্রীদের কিন্তু সময় অফুরন্ত, কোনো কাজ নেই; আপনাকে বলছি, কম্যুনিস্ট-গুলো আমাদের সম্বন্ধে অন্তত এই একটা সত্যি কথা বলে।”

সুরমা হাসল না। সে ভালো করে শোনেইনি সদানন্দের কথা, তার

সমস্ত উদ্বেল বেদনা নিষ্ক্রমণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র খুঁজছিল। যেন জল খাচ্ছিল, সুরমা নিমেষে আরেকটা গ্লাস শেষ করে বলল, "লেট'স্ গেট আউট অব হীয়ার।"

সদানন্দ মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল তার লক্ষ্যবেধে এমন আশাতীত সহযোগিতার জন্যে। সুরমাকে বলল, "হ্যাঁ, তাই ভালো। চলুন এখান থেকে বেরুনো যাক।"

যথাবিধি বিদায় নিয়ে সদানন্দ ও সুরমা যখন পথে বেরুল তখন দু'জনের কারোই ধারণা ছিল না তারা কোথায় যাবে। সুরমার বাহু ধরে সদানন্দ যখন তার গাড়িতে উঠল তখন তার মনে নানা অভিসন্ধির অভাব ছিল না। কিন্তু তার বহুল অভিজ্ঞতা থেকে সে এইটুকু শিখেছিল যে লক্ষ্যে পেঁাছোতে গেলে অনেক সময় পরোক্ষ আক্রমণ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাই সে সুরমাকে বলল, "চলুন আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দিই।"

সদানন্দ বাজি রাখতে পারতো যে সুরমা প্রতিবাদ করবে; বলবে, 'না, চলুন আর কোথাও যাওয়া যাক।' কিন্তু শুধু মুনিদের ভুল হয় না, দুর্বৃত্তদেরও, তাই দুর্ভাগ্যক্রমে সুরমা গাড়িতে এলিয়ে পড়ে বলল, "হ্যাঁ বাড়িই যাওয়া যাক।"

সদানন্দের হৃদয় নিরাশায় নিমজ্জিত হোলো। কিন্তু সম্মতি না দিয়ে উপায় ছিল না। বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" বিরস স্বরে সদানন্দ ড্রাইভারকে যথাবিধি নির্দেশ দিল।

পথে সুযোগ পেয়ে সদানন্দ বলল, "ও হ্যাঁ, মিস্টার চ্যাটার্জিকে সেই আমার ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারি করে আনবার কথা বলেছিলুম না? আমি—"

সুরমা বলল, "তার বোধহয় আর দরকার হবে না। চাকরিতে বোধহয় ওর এক কণাও উৎসাহ আর অবশিষ্ট নেই। বীরেন যদি এর মধ্যে একদিন তার কাজে ইস্তফা দিয়ে বসে তাহলেও আমি অবাক হবো না।"

সদানন্দ বলল, "ওসব বাজে কথায় একদম বিশ্বাস করবেন না। পুরুষের জীবনে একটিমাত্র উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য আছে, সে হচ্ছে তার

কেরীয়ার। মিস্টার চ্যাটার্জির ব্যাপার আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। একমাত্র বাধা হচ্ছে হোম সেক্রেটারি, তা ওকেও আমি—।"

"হোম সেক্রেটারি তো মৈত্র, তাই না? ও আবার কী বলে?"

"না, না, বলবে আবার কী? আমরা মিনিস্টাররা অর্ডার দিলে না মানে এমন ক্ষমতা কার? তবে কিনা মৈত্র ফাইলে লিখেছে যে চ্যাটার্জি বড়ো জুনিয়র, ওর নাকি এখনো সেক্রেটারি হবার মতো—"

সুরমা রীতিমতো ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "আর মৈত্রেরই এখন বুঝি হোম সেক্রেটারি হবার কথা? ইংরেজ সিভিলিয়ানরা থাকলে ও তো এখন—"

"আহা, তা বৈকি। আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলেছি। তা আপনি কিছু ভাববেন না সুরমা দেবী। হোম মিনিস্টারের ভাইপোকে আমি আমার ডিপার্টমেন্টের একটা স্কলারশিপ দিয়ে অ্যামেরিকা পাঠিয়েছি—যা ওর পাবারই কথা নয়—, তাছাড়া মৈত্রের বোনকেও জুনিয়র এডুকেশন্যাল সার্ভিস থেকে তুলে নিয়ে নতুন কলেজটার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল করে দিয়েছি। ওরা দু'জনেই এখন রাজি হয়েছে যে মিস্টার চ্যাটার্জিকেও—"

"বাট বীরেন ইজ নট ইণ্টরেস্টেড্, মিস্টার ঘোষ।" সুরমা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে সদানন্দের হাঁটুর উপর মুখ রাখল। কোহল ব্যতীত এ অবস্থাটা অভাবনীয় হোতো।

এই ভণ্ডবৃদ্ধের ভূমিকায় সদানন্দের অভিনয়প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে। সে সুরমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ওই একটু আগে যা বলছিলুম, সুরমা দেবী। পুরুষের কাছে জীবনে উন্নতির চাইতে আর কোনো তীব্র কামনা নেই। প্রেম তার কাছে অবসরবিনোদন, আদর্শবাদ তার কাছে অলস মুহূর্তের বিলাস। আপনি যখন মিস্টার চ্যাটার্জিকে বলবেন সে এডুকেশনের সেক্রেটারি হয়েছে, সে কী করবে জানেন?"

"কী করবে?" সুরমা বিহ্বল অনিশ্চয়তায় জিজ্ঞাসা করল।

"সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলবে, 'সুরমা, আজ আমি ধন্য, আমি ধন্য। আমি জানি তুমি কী স্নেহের জন্যে ও কৌশলের সঙ্গে আমার

জন্যে এই পদোন্নতি অর্জন করেছ।' বলবে, 'সুরমা, এই দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্যে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।' আপনাকে তখন মিস্টার চ্যাটার্জি আরো বেশি ভালোবাসবেন।"

'আরো বেশি' কথাটা সুরমার ভালো লাগল না। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা ইতিমধ্যে বাড়ি পেঁৗছে গিয়েছিল। তাই, সুরমা ভাবল, তাকে আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু গেটের কাছে আসতেই চৌকিদার বলল, "সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন; বলেছেন, কেউ যেন তাকে না জাগায়, কোনো যেন গোলমাল না হয়।"

সদানন্দের সামনে এই রকমের কথা শুনে সুরমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে হঠাৎ গাড়ির পিছনের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরে হর্নটা বাজাতে থাকল। সদানন্দ বলল, "আঃ মিস্টার চ্যাটার্জির ঘুম ভেঙে যাবে যে? ওঁর আবার মাথা ধরেছে, আর—"

"মাথাধরা সারানো যায়। কিন্তু আমার যা ধরেছে তার চিকিৎসা কী? অ্যাস্পিরিন তো সেখানে কাজে লাগবে না। বীরেন আমাকে যেখানে আঘাত হেনেছে সেখানে কোনো ওষুধ পেঁৗছোয় না, সেখানে—"

"সুরমা দেবী, আপনি বোধহয় একটু বেশি ওই আপনাদের কী বলে সব তাই খেয়েছেন।" সদানন্দ জানতো নেশাগ্রস্ত লোককে 'নেশা হয়েছে' বলা মানে আরো খেতে বলা। কেননা তাকে প্রমাণ করতেই হয় যে তার নেশা হয়নি। অন্তত চেষ্টা করতে হয়।

সুরমা বলল, "দ্যাট'স হোয়্যার য়ু আর এনটায়ারলি রং। এবং এই মুহূর্তে আপনাকে তা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সদানন্দ, বলা বাহুল্য, যারপরনাই প্রীত হয়ে সুরমার অনুগমন করল। শুধু তাই নয়, সুরমা যখন লম্বা সোফায় বসে চেয়ারে উপবিষ্ট সদানন্দকে তার সোফায় আমন্ত্রণ করল, সদানন্দ সানন্দে সুরমার পাশে এসে বসল। তখন সদানন্দকে কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী করলেও সে এর চেয়ে বেশি খুশি হোতো না, হাতে চাঁদ পাওয়া তো সামান্য কথা।

সুরমা বলল, "মিস্টার ঘোষ, আই রাদার লাইক য়ু।" সুরমার এক হাত রইল সোফার বাইরে, আরেক হাত সদানন্দের হাতে। সদানন্দ

নিষ্ক্রিয় ছিল না, কিন্তু নিশ্চিন্তও ছিল না। বলল, "কিন্তু সুরমা দেবী, হঠাৎ যদি মিস্টার চ্যাটার্জির ঘুম ভেঙে যায়?" সদানন্দ সত্যি শংকিত ছিল।

সুরমা বলল, "যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে তো খুবই ভালো কথা। আমি আমার বিয়ের পর থেকে শুধু তো এই একমাত্র চেষ্টাই করেছি-- ওকে জাগাতে।" সুরমা হাসল। "কিন্তু পারিনি। আজো পারিনি।" সুরমা হাসল না। বলল, "প্লীজ, মিস্টার ঘোষ, অন্তত আমার জন্যে, আজ আপনাকে একটা খেতেই হবে।"

সদানন্দ বলল, "সুরমা দেবী, আপনার অনুরোধে না করতে পারি এমন কাজ তো সংসারে খুব বেশি নেই। একটু এসব খাওয়া? সে তো কিছুই নয়। রাত্তিরে, আপনার বাড়িতে, চতুর্দিকে খবরের কাগজের কোনো লোক নেই। তাছাড়া বাপুজী বলতেন,—"

এমন অবস্থায় বাপুজীর উল্লেখে সুরমা পর্যন্ত বিস্মিত হোলো। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে বলল না কিছু।

সদানন্দ বলল, "এইতো সেদিন এ. আই. সি. সি. মীটিঙে বম্বের চীফ্ মিনিস্টারকে বললুম, 'মোরারজি'— ও তো আমার পুরানো বন্ধু, একসঙ্গে আমরা যারবেদা জেলে কত দিন কাটিয়েছি তার গুণতি নেই— আমি বললুম, 'মোরারজি, তোমার এই প্রোহিবিশন পলিসি আমি একেবারেই বুঝিনে। যখন বিদেশী সরকার ছিল, হ্যাঁ, তখন এক্সাইজ ডিউটি ওদের হাতে না দেবার কারণ ছিল, কিন্তু আজ কেন? বিশেষ করে ওই আবগারী আয় যখন আমরা অন্যান্য বহুতর কাজে সদ্ব্যয় করতে পারি।"

সুরমা বলল, "তা মোরারজি কী বলেন?"

"কী আবার বলবেন? আপনাকে বলছি, আর কাউকে বলব না, মোরারজির মতো লোক হচ্ছে গতকালের, প্রায় গত শতাব্দীর, ভস্মাবশেষ। ওদের আদর্শবাদের শেষ নেই, কিন্তু সেই আদর্শের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বর্তমানের বাস্তবের। ওরা কালের গতির সঙ্গে চলতে শেখেনি এখনো।"

বীরেন বাড়ি ফিরে ঘুমোতে পারেনি। এতক্ষণ পাশের ঘর থেকে সব কিছু শুনছিল। তার ভালো লাগছিল না সুরমার এই সদানন্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। কিন্তু, সে তার নিজের মনকে বলছিল, তার আপত্তি করবার অধিকার নেই। সে নিজে সুরমাকে নানা দিক থেকে বঞ্চিত করেছে, সুরমা যদি অন্যত্র তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে তবে বীরেনের প্রতিবাদ করবার অধিকার কোথায়? তবু—

তবু, মনে লাগে। বীরেনের বইয়ের ঘরে—লাইব্রেরি বললে বাড়িয়ে বলা হবে—কত বই রয়েছে যা সে পড়বে বলে কিনেছিল, কিন্তু এখনো সময় হয়নি, যা হয়তো সে বছরে একবারও উল্টে দেখে কিনা সন্দেহ, তবু, তার কোনো একটা বই হারিয়ে গেলে মনে হয় গোটা সংগ্রহই যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে; যেন ওই একটা বইয়ের অভাবে তার জ্ঞানতৃষা অতৃপ্ত রয়ে গেছে; যেন শুধু পুস্তকাগারের গ্রন্থহানি হয়নি, বীরেনের নিজের অঙ্গহানি হয়েছে।

বীরেনের কিন্তু শুধু এই সম্পত্তি হারাবার শোক ছিল না। সুরমাকে কখনোই সে সম্পত্তি বলে মনে করেনি। সদানন্দের প্রশ্নের যেদিকটা তাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করেছিল তা হচ্ছে গতকাল আর আজকের অসমন্বয়। সদানন্দ শুধু উল্লেখ করেছিল মোরারজি দেশাইয়ের কথা। বীরেনের মনে ছিল তার চারি দিকের আর সকলের কথা, বিশেষ করে তার নিজের কথা।

তাই সে শোভনতা ইত্যাদি সব প্রশ্ন বিস্মৃত হয়ে হঠাৎ বসবার ঘরে প্রবেশ করে সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু, কালের গতির সঙ্গে এই সমান তালে পা ফেলে চলার মানেই কি সুবিধাবাদ নয়?"

সুরমা চমকে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময় গোপন করে সদানন্দের আরো একটু কাছে সরে এসে বলল, "ডিপেন্ডস্ হোয়াট য়ু মীন বাই সুবিধাবাদ।" এই গম্ভীরধ্বনি অর্থশূন্য উক্তিটা সুরমা শিখেছিল বি. বি. সি. প্রোগ্রামে জোডের কাছে। সরাসরি উত্তর এড়াবার এমন চতুর কৌশল আর নেই। কিছু বলতে হোলো না, তবু কিছু বলা হোলো। প্রশ্নের উত্তর দেয়া হোলো আরেক জিজ্ঞাসায়। শুধু তাই নয়, বীরেনের সন্দেহী চিত্তে (সুরমা কোথায় যেন পড়েছিল যে সব

পুরুষই ক্ষুদে অথেলো—কেউ বা কালো, কেউ সাদা, আর কেউ পীত।) সন্দিগ্ধতার আরেকটি বীজ বপন করা হোলো। আপন চাতুর্যে তৃপ্ত হয়ে সুরমা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সদানন্দের আরো একটু কাছে সরে বসল।

বীরেন এর সব কিছু উপেক্ষা করল। সে অথেলো নয়, হ্যামলেট। তার আসল প্রশ্ন ছিল কাকার সঙ্গে সে ভাব করবে কিনা। কাকা অর্থে কন্‌গ্রেস, এবং ভাব করলে তা অসততা হবে কিনা।

কাকা অর্থাৎ সদানন্দ সুরমার চেয়েও বেশি চমকে উঠেছিল। কোনোক্রমে গ্লাসটা হাত থেকে টেবিলের উপর রেখে সে চেষ্টা করল সুরমা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে বসতে। বলা যায় না কিছু, সন্দেহী স্বামী না করতে পারে হেন মূর্খতা নেই। আমতা আমতা করে বীরেনের দিকে তাকিয়ে হাসি আনতে ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, "আরে মিস্টার চ্যাটার্জি যে, আপনি এখনো ঘুমোননি বুঝি? এ—এ আমি একবার এলুম কেননা আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে কিছু অ্যাসপিরিন ছিল। তা—তা, একটু দাঁড়ান, আমি এখনি নিয়ে আসছি। এক্ষনি—" সদানন্দের বাকি কথা আর শোনা গেল না। প্রাণভীত পলাতকের মতো সদানন্দ তার গজবপু নিয়ে শশকের গতিতে বেরিয়ে গেল।

যেটা নাটকীয় পরিস্থিতি হতে পারতো তার এমন প্রাহসনিক পরিণতিতে বীরেন বা সুরমা কেউই সে মুহূর্তে কোনো কথা খুঁজে পেল না। বাইরে থেকে গাড়ি ছাড়বার শব্দ আসতেই সুরমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে ছুটে যেতে যেতে বলল, "আরে, মিস্টার ঘোষ কি চলে গেলেন নাকি?"

বীরেন এতক্ষণ তার নিজের সমস্যা নিয়ে, অর্থাৎ সদানন্দকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তাই নিয়ে, চিন্তিত ছিল। এবারে ব্যাপারটা বুঝে হাস্য সম্বরণ করতে পারল না। হো হো করে গলা ছেড়ে অট্টহাস্য করে বলল, "কী বোকা লোকটা! হা—হা—হা, দি অনরেবল মিস্টার, না মিস্টার তো নয়, শ্রী, শ্রীসদানন্দ ঘোষ—হা—হা—হা!"

ঘরে একটি ভৃত্য প্রবেশ করতেই বীরেন তার অসংযত হাসি থামাল। চাকরটি বলল, "ওই যে কাংগ্রেসী সাহেব এসেছিলেন তিনি এইটে দিতে বললেন।" ওর হাতে দুটো অ্যাসপিরিনের বড়ি। "আর বললেন কী যে সাহেবকে সেলাম জানাতে। হঠাৎ নাকি ওঁর কী কাজের কথা মনে হয়েছে।"

বেয়ারা বেরিয়ে গেলে বীরেন আবার প্রায় পাগলের মতো হাসতে সুরু করল। "বাই গড্, ইজন'ট ইট টু ফানি ফর ওয়ার্ড্স্!"

সুরমা বীরেনের এই অপ্রত্যাশিত প্রাণখোলা অট্টহাস্যে অন্য যে কোনো সময় খুশি হোতো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার নিজেকে একান্ত অপমানিত বলে মনে হচ্ছিল। বীরেনকে কিছু না বলে সে শুধু স্বগতোক্তি করল, "ভীরু কাপুরুষ কোথাকার!"

বীরেন তখনো এত হাসছিল যে সে লক্ষ্য করেনি সুরমা কোন দিকে তাকিয়ে কার উদ্দেশে তার ধিক্কার ঘোষণা করেছে। হঠাৎ বীরেনের হাসি থেমে গেল। তার মনে হোলো কথাটা তাকেই বলা। বীরেন যেন স্বীকারও করে নিল যে সে সত্যি কাপুরুষ।

পৌরুষ মানে তাহলে কী? পাশবিকতা, ওই মার্কিন উপন্যাসের নায়কদের মতো? বীরেন কী বলবে ভেবে পেল না। মনে মনে আবৃত্তি করল, 'কন্‌শেন্স্ মেক্স্ কাওয়ার্ডস অব আস অল।' বিবেক মানুষের চরিত্রপারুষ্যে এনে দেয় লজ্জাকর বেতসবৃত্তি। ওটাকে শৈশবে অ্যাপেণ্ডিক্সের মতো কেটে ফেলে আপদ বিদায় করাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো। কিন্তু বীরেনের বাবা যে তা করেননি। বীরেন কী করবে? তার কথা কোথায় হারিয়ে গেল। সে নিজের ঘরে ফিরে গেল। যেতে যেতে কারো দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকল, "আই অ্যাম্ সরি, সুরমা, আই রীয়্লি অ্যাম।" বাঙলার চাইতে ইংরেজিতে ক্ষমা-প্রার্থনা অনেক বেশি সহজ এবং লৌকিক বলে মনে হওয়াতে বীরেন তখনি তার পূর্বতন উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ করে বলল, "আমি দুঃখিত সুরমা, আমি বাস্তবিকই দুঃখিত।"

সুরমার নিজের চিন্তা নিয়োজিত ছিল সদানন্দের আকস্মিক অন্তর্ধানে। বীরেনের কথাগুলি তাই তার কাছে স্বভাবতই একান্ত

অপ্রাসঙ্গিক মনে হোলো। সে বোধহয় ভালো করে শোনেওনি বীরেনের কথা। বীরেনের কাছে একটু আগে যা উদরবিদারী প্রহসন বলে মনে হয়েছিল তা যেমন সুরমার কাছে আদৌ হাসির বিষয় ছিল না, তেমনি বীরেনের শেষ কথাগুলিও সুরমার কাছে হৃদয়বিদারীরূপে করুণ বলে মনে হোলো না। শুধু অস্পষ্টভাবে রহস্যময় ঠেকল। কিন্তু ক্লান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে সুরমার এই রহস্য ভেদ করতে চাইবার মতো উৎসাহ সামান্যমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। টেবলের উপর থেকে অ্যাস্পিরিনের বড়িগুলি তুলে নিয়ে সুরমা বীরেনের ঘরের সামনে এসে বলল, "তোমার অ্যাস্পিরিন।"

"না সুরমা, অ্যাস্পিরিন আমার চাইনে। তুমি শুয়ে পড়োগে।"

বীরেন যদি বলতো 'সুরমা, তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও' বা 'তুমি মরোগে যাও' তাহলেও বোধহয় সুরমা নিজেকে বেশি সুখী মনে করতো। কিন্তু বাড়িতে থাকতে দিয়ে বাড়িকে মরুভূমি করে তোলা, বেঁচে থাকতে বলে জীবন্মৃত অবস্থায় রাখা, ঘুমুতে যেতে বলে ঘুম কেড়ে নেয়া—এ কেমন বিধি? এ কোন বিচার?

কিন্তু বীরেনের সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা। সুরমা তাই ঘুমুতে গেল। অর্থাৎ শুতে। শুয়ে শুয়ে মনে মনে বলল, 'কাল যদি ঘুম না ভাঙে কে দুঃখিত হবে? কেউ না। কে খুশি হবে? অন্তত একজন। আমি নিজে।' একটু পরে, 'কিন্তু আমি আর না জাগলে খুশি হবো কী করে?' বালিশকে বলল, 'খুশি হবো কিনা জানিনে। কিন্তু আমি বাঁচব আমি বাঁচব।' নরম বালিশ আরো নুয়ে সম্মতি জানাল। যেমন জানাতো অন্য যে কোনো মন্তব্যে। কিন্তু সুরমা সান্ত্বনা পেল।

*

সদানন্দের মনে শান্তি ছিল না। অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে তাই সে চীফ্‌কে বলে কয়ে, এবং চীফ সেক্রেটারিকে তোষামোদ করে, বীরেনের বদলি ও পদোন্নতির ব্যবস্থাটা প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল। মৈত্র

কথা দিয়েছিল যে এচ. সি. এম.-এর সই হয়ে গেলে আজই বিকালে সে ফাইলট্া এচ্. ঈ.-র কাছে পাঠাবে। আর ওটা তো, মৈত্র যা বলেছিল, মিয়ার ফর্মালিটি, শুধু লৌকিকতা। সদানন্দ জানতো প্রান্তীয় কনগ্রেসে তার এমন প্রতিপত্তি যে প্রদেশপালের সাধ্য নেই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার। সব ঠিক, প্রায় হয়ে গেছে বললেই হয়। সদানন্দ তাই মৈত্রকে বলে দিয়েছিল বীরেনকে একবার তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। নিজের বলবার সাহস হয়নি। বলা তো যায় না, হোক ভারত স্বাধীন, অর্থাৎ কন্‌গ্রেসাধীন, সব আই. সি. এস. গোখরোর বাচ্চা, হয়তো ফোঁস করে বলবে—আমি তো আপনার ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি নই!

বীরেন সত্যি জিজ্ঞাসা, প্রায় আপত্তি করেছিল। কিন্তু সি. এস. যখন আদেশ দিলেন তখন না মেনে উপায় ছিল না। বীরেনকে যেতেই হোলো সদানন্দের অফিসে।

অফিস তো নয়, যেন আড্ডার আসর। মন্ত্রীমশাইর টেবলের ডান-দিকে দশ জন, এবং বাঁ দিকে অন্তত বারো জন। সামনে সিগারেটের টিন, গণিকাগৃহের দ্বারের মতো অবারিত। পাখা পেরে উঠছে না ধোঁয়ার সঙ্গে। বীরেন ভিতরে আসতেই সদানন্দ বলল, "আসুন, আসুন, মিস্টার চ্যাটার্জি।"

বীরেন বিব্রত হয়ে বলল, "আমি জানতুম না যে আপনি ব্যস্ত থাকবেন। আমাকে সাড়ে তিনটেয় আসতে বলেছিলেন কিনা। তা—"

"বিলক্ষণ। মোটেই ব্যস্ত নয়। এই আর—"

বীরেনের ভালো লাগছিল না। "কিন্তু আপনি যদি বলেন তো আমি বরং আর কয়েক মিনিট পরে আসব।" বীরেন ইংরেজিতে কথা বলছিল। সদানন্দ, বলা বাহুল্য, বাঙলায়।

"না মিস্টার চ্যাটার্জি। আমরা বাঙালী মানুষ। অত ঘড়িধরা সাহেবিয়ানা আমাদের ধাতে সয় না। কী বলো হে কালীধন, হে হে।"

শুধু কালীধন নয়, পারিষদরা সবাই একবাক্যে মন্ত্রিবরের পরিহাস-প্রতিভার প্রতি স্তুতি জানাল অট্টহাস্যে। "তা যা বলেছেন, তা যা বলেছেন। একেবারে খাঁটি বাঙালী আমরা। আদি ও অকৃত্রিম।"

বীরেন একটুও হাসল না। বড়ো ঘরটার দেয়ালের দিকে দূরে

একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করে বলল, "আচ্ছা আমি এখানেই বসছি। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে দয়া করে বলবেন।"

পারিষদরা বুঝলেন যে আজ আর বেশি বসা যাবে না। এবারে পার্কে গিয়েই বসতে হবে। যাবার আগে যে যা বলে গেল বীরেনের তা না শুনে উপায় ছিল না।

"আমার ওই অনুরোধটা ভুলবেন না যেন, সার।"

"আহা আপনার কথা কি কখনো ভুলতে পারি?" সদানন্দ অমায়িক।

"ওই ইস্কুল বাড়ির কণ্ট্র্যাক্টটা, সার।"

"আপনাকে তো আগেই বলেছি। কিচ্ছু ভাববেন না। এ, এ, শুধু যাবার আগে একবার আমার পী.-এর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে সব বলে দেয়া আছে।" সদানন্দ আছেই তো সবাইকে খুশি রাখতে।

"আমিও উঠব এবার, শুধু আপনি যে বলেছিলেন একবার আই. জি.-কে বলে দেবেন আমার ওই ভাইপোর বিপদটা নিয়ে।"

"তা, কোনটা যেন?" সব কি মনে থাকে সদানন্দের?

"ওই যে," একেবারে কাছে এসে, আস্তে, "ওই যে এনফোর্সমেণ্ট থেকে ধরেছে।"

"ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিচ্ছু ভাবনা নেই। আমি আই. জি.-কে নিশ্চয়ই বলে দেব।" সদানন্দ আরো দু'য়েকজনের কাছে শুনেছে যে এনফোর্সমেণ্টে দু'চারটে অফিসারের ধারণা ওদের কাজ চোর ধরা। সদানন্দ কথা দিল যে সাধ্যমতো এর প্রতিকার করতে সে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

এমনি করে একে একে সবাই বিদায় নিলে সদানন্দ বীরেনকে কাছে আসতে বলল। বীরেন তবু একটু দূরে সরেই বসল। যেন কোন একটা অশুচি ব্যাধির ভয়ে।

সদানন্দ একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "আর পারিনে এদের যন্ত্রণায়। যার যত সব সদানন্দ ঘোষের কাছে। আমার প্রধান দোষ কি জানেন, আমি রূঢ় হতে পারি না।"

বীরেন মনে মনে বলল যে প্রধান দোষ সত্যি ওটা নয়। কিন্তু

মন্ত্রিসংস্কার তো তার কাজ নয়। সে এখন তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারলে বাঁচে। সে তাই আবার জিজ্ঞাসা করল কেন তার ডাক পড়েছে মন্ত্রিসকাশে।

সদানন্দ বললেন, "কী জানেন মিস্টার চ্যাটার্জি। এখন ভারত স্বাধীন হয়েছে।" সদানন্দ থামল।

বীরেনও গুজবটা শুনেছিল। শিরহেলনে সম্মতি জানাল।

"ভারত এখন স্বাধীন হয়েছে। তাই এখন নেশনবিল্ডিং—এই, হ্যাঁ, জাতিগঠনের কাজই এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ। ইংরেজদের আমলে তাই আমার শিক্ষাবিভাগ ছিল অবজ্ঞাত, অবহেলিত। কিন্তু আজ এই বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সব মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা জোগানো হচ্ছে আমার দায়িত্ব, অর্থাৎ আমার বিভাগের দায়িত্ব। তাই—হ্যাঁ, সেই জন্যেই আপনাকে ডেকেছি—আমার ডিপার্ট-মেণ্টে একজন ভালো সেক্রেটারি চাই। আমার এমন লোক চাই যে সত্যি এই মহান কর্তব্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবে, যে তার জাত্যভিমান ভুলে গিয়ে জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করবে না। আমার এমন লোক চাই যে দেশপ্রেমে আমার সঙ্গে উদ্বুদ্ধ, যার জীবনে জনকল্যাণ ছাড়া দ্বিতীয় ধ্যান নেই, যার স্বপ্নে শয়নে জাগরণে একমাত্র চিন্তা—"

বীরেন এই বক্তৃতার মর্ম বুঝতে পারছিল না। বাধা দিতে বাধছিল, কিন্তু শুনতে আরো খারাপ লাগছিল। এই নেতাদের কাছে কোনো কথার কোনো মানে নেই। যা খুশি বলে গেলেই হোলো। বক্তৃতা দিতে দিতে ওদের এমন কদভ্যাস হয়ে গেছে যে একজনের সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে করে মন্যুমেণ্টের তলায় লক্ষ জনের সামনে বক্তৃতা করছে। তখনো ওদের ভাষা অর্থহীনতা হারায় না। হোক মন্ত্রী। বীরেন সবিনয়ে বলল, "আপনার সেক্রেটারি তো মিস্টার দাস। তিনি তো—"

"হ্যাঁ, মিস্টার দাস সত্যি এফিসিয়েণ্ট লোক, কিন্তু কি জানেন—"

"এক্সকুজ মি সর্, আমরা আমাদের সার্ভিসের সতীর্থদের সমালোচনায় যোগ দিতে অভ্যস্ত নই।"

সদানন্দ দমে গেল। তা নইলে সে বীরেনকে মনে করিয়ে দিতে পারতো অবনী ঘোষের কথা, যার একমাত্র কাজই হচ্ছে আড়ালে অন্যান্য আই. সি. এস.দের নিন্দা করা। ওদের ওই আভিজাত্য অনেক দিন ঘুচে গেছে। বীরেনের এই দম্ভ আজ অসহ্য।

তবু সদানন্দকে সহ্য করতে হোলো। একে এ আই. সি. এস., তার উপর সুরমার স্বামী। সেদিন তাকে কেন দেখা দিয়েছিল অত রাত্রে সুরমার ঘরে? সদানন্দের সত্যি রূঢ় হবার উপায় ছিল না। প্রিয়ভাষিতা তার প্রধান দোষ নয়। কিন্তু এতগুলি প্রধান দোষ আছে যে রূঢ় হবার তার উপায় নেই।

সদানন্দ টেলিফোন তুলে কোনো একটা সংযোগ চেয়ে সেই সুযোগে প্রসঙ্গান্তরে পলায়নের পথ খুঁজল। ডান হাতে সিগারেটের টিনটা বীরেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ও, হ্যাঁ, আসল কথাটাই জিগেস করা হয়নি। আপনার মাথাধরাটা সেরে গেছে তো?"

"ইয়েস, থ্যাংক য়ু।"

সদানন্দ বীরেনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে উঠে দাঁড়াল। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। কথা ভুলে গেলে মঞ্চের অভিনেতাকে যেমন করতে হয়। যেন একেবারে নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছে এমনি ভঙ্গিতে সদানন্দ বলল, "আমি ব্যাপারটা মিস্টার মৈত্রের সঙ্গে আলোচনা করছিলুম। এচ্. সি. এম্.-এর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। আমার ইচ্ছে আপনাকে আমার ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি করে নেয়া।"

বীরেন এই বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মনে মনে মৈত্রকে একবার গাল দিল যে সে বীরেনকে আগে থেকে কিছু বলে দেয়নি মন্ত্রীমশায় তার সঙ্গে কী আলোচনা করবেন। সে বুঝতে পারছিল না সমস্ত ব্যাপারটাই গভীর একটা ষড়যন্ত্র কিনা। সে শুধু বলল, "ইট'স এ গ্রেট অনার আই হ্যাভ নো ডাউট্, সর, বাট—"

"অর্থাৎ ডাউট আছে, তাই নয়? কিন্তু কেন বলুন তো?"

"আমার সন্দেহটা এখনো সেই পর্যায়ে আছে যে আমি নিজেই সেটা বুঝে উঠতে পারছিনে, আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করাই বৃথা।

তবে কিনা আপনার এই প্রস্তাবটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে আমাকে একটু ভাবতে সময় দিতে হবে।"

"বা রে, এতে ভাববার কী আছে? আপনার পক্ষে এটা তো প্রোমোশন, যার জন্যে হয়তো আপনাকে স্বাভাবিক ধারায় অন্তত আরো বছর তিনেক অপেক্ষা করতে হোতো।"

পলিটিশানদের সত্যি কিছুতেই ভাববার দরকার নেই। স্বার্থসর্বস্ব চাকুরেরও পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। কিন্তু যদি কেউ এর থেকে একটু বিভিন্ন হতে চায়? তার উপায় কী না ভেবে? কিন্তু ভেবেই কি উপায়ের নির্দেশ মেলে সব সময়? তবু ভাবতে হয়। এবং ভাবাই বোধহয় ভালো। ভেবে ভুল করা অসম্ভব নয়, কিন্তু না ভেবে সে সম্ভাবনাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দেয়া হয়। বীরেন তার সন্দেহক্ষত মন সদানন্দের সামনে তুলে ধরতে প্রস্তুত ছিল না। শুধু বলল, "না, শুধু ভাবা নয়, যদি অনুমতি করেন তবে কয়েকজনের সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করতে চাই।"

কার সঙ্গে বীরেন এমন ব্যক্তিগত আলোচনা করবে? কে বুঝবে তার সমস্যা? তার কোনো বন্ধু অবশিষ্ট নেই। সবাই দূরে সরে গেছে। না, সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করল, আর সবাই দূরে সরে যায়নি, সে নিজে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং নিজে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে। বাকি রইল সুরমা। সে এখনো একই ছাদের তলায়। কিন্তু সে কাছে কি? কত দিন সে সুরমার কাছে কোনো কথা খুলে বলেনি। আজ একথা খুলে বললেও সুরমা বুঝবে কি বীরেনের দ্বিধা? না কি সেও সদানন্দের মতো বলবে, 'আহা, এ তো প্রোমোশন, এতে আবার আলোচনার কী আছে?'

সদানন্দ সত্যি প্রায় তাই বলল, "আহা, এতে আবার আলোচনার কী আছে?"

বীরেন আস্তে আস্তে বলল, "আলোচনা ঠিক নয়। তবে কি, স্যর, কিছু দিন থেকে আমি একটা নিঃসমাধান সমস্যার কবলে পড়েছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে এতে আমার অধিকার নেই।" বীরেন

পুরোপুরি সচেতন থাকলে সদানন্দের কাছে এমন স্বীকারোক্তি করতে পারতো না। কিন্তু বলা যে হয়ে গেছে!

সদানন্দ বীরেনের কথাটা বুঝতে পারল না। পায়চারি থামিয়ে চেয়ারে বসে সোজাসুজি বীরেনের দিকে চেয়ে বলল, "কিসে অধিকার নেই মিস্টার চ্যাটার্জি?"

"ওই যে আপনি যা বলছিলেন, প্রোমোশনে।"

কবে কোন পুরস্কার কার কাছে অনর্জিত বলে মনে হয়েছে? শুধু তো অভিশাপই আসে অনপরাধে। সদানন্দ কিছু বুঝতে পারল না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করল, "সে কী কথা মিস্টার চ্যাটার্জি? আপনার সার্ভিস রেকর্ড আগাগোড়া ভালো। চীফ্ সেক্রেটারি আপনার যোগ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনার প্রোমোশনে অধিকার থাকবে না কেন? একটু শুধু গোলমাল হয়েছিল সিনিয়রিটির প্রশ্ন নিয়ে।"

"প্রশ্নটা শুধু সিনিয়রিটির নয়, মিস্টার ঘোষ। সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বরে আমি যখন জয়েন্ট সেক্রেটারি হলুম তখন আমার ডেপুটি সেক্রেটারি থাকবার কথা। কিন্তু কেন পদোন্নতি হোলো?"

"সায়েবরা চলে গেল বলে।"

"এক্স্যাক্টলি, কিন্তু চলে যাওয়াটা ঘটল কী করে? আমি কি ওদের বিদায়ের জন্যে কখনো কিছু করেছিলুম? কিচ্ছু না। অন দি কণ্ট্র্যারি, ওদের তাড়াবার জন্যে যারা কিছুমাত্র চেষ্টা করেছে তাদের আমি বিনা দ্বিধায় জেলে পাঠিয়েছি, ইনক্লুডিং য়ু। তার পরে আজ যখন আপনারা ক্ষমতায় আসীন হলেন—আমাদের বাধা সত্ত্বেও—তখন আপনাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে আমার বাধে। যখন জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছিলুম তখনই প্রশ্নটা মনে জেগেছিল, তার পর থেকে প্রতি দিন এই পদোন্নতির বোঝা বেশি করে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। তার উপর আজ আবার সেক্রেটারি হয়ে গেলে আমার অপরাধের পরিমাণ আরো বাড়বে, বিবেকের উপরে বোঝা আরো ভারি হবে। আমার—"

হঠাৎ বীরেনের খেয়াল হোলো যে সে অনেক বেশি বলে ফেলেছে। হঠাৎ তাই থেমে গিয়ে সে বিদায় নেবার অনুমতি চাইল। তার উত্তর সে পর দিন জানাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল, এবং অনুরোধ করে গেল যে তার

আগে সদানন্দ যেন পাকাপাকি কোনো বন্দোবস্ত না করে ফেলে। কোনো দিকে না তাকিয়ে মাথায় অনিশ্চিত ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বীরেন সদানন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই সদানন্দের কাছে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি হতবুদ্ধিকর মনে হোলো। সুরমাকে টেলিফোন করে উদ্বেগ প্রকাশ করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, একথা বলতেও ভুলল না যে বীরেনকে সেক্রেটারির পদ দেয়া হয়েছে। সঙ্গে বহুপরীক্ষিত হাস্য সহযোগে যোগ করল, "মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার জন্যে আমি যা করলুম তা আপনার জন্যে যা করতে পারলে খুশি হতুম তার তুলনায় কিছুই নয়। এজন্যে ধন্যবাদ না দিলে আমার ধন্যবাদভাজন হবেন।— আচ্ছা, আমি কাল আবার একবার খবর নেব। কেমন? রাখি তাহলে? নমস্কার।"

*

সুরমা সত্যি উদ্বিগ্ন হোলো। বাগচী আর সদানন্দ দু'জনেই ভুল করেনি নিশ্চয়ই। তাছাড়া ওদের সাক্ষ্যেরই বা কী প্রয়োজন? সুরমা নিজে যা দেখেছে তাই কি যথেষ্ট নয়? বীরেন আর সে বীরেন নেই। হাসি ও ভুলে গেছে। আনন্দের সঙ্গে ওর মুখচেনাও নেই যেন। খাচ্ছে, অফিস যাচ্ছে, সব কিছু করছে, কিন্তু সেটা যেন যান্ত্রিক। আসলে বিচরণ করছে যেন অলীক এক অন্যলোকে। ওর দৃষ্টি অস্বাভাবিক, বাক্য অসম্বন্ধ, ব্যবহার অন্যমনস্ক।

কিন্তু সুরমা জানতো যে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসায় ফল হবে না। বীরেন বাড়ি ফিরে যথারীতি জামাকাপড় ছেড়ে নিজের পড়ার ঘরে চলে গেল। সুরমা লক্ষ্য করে দেখল যে সদানন্দ একটুও অত্যুক্তি করেনি। অগোছালো চুলের তলায় অশান্ত মস্তিষ্কের আন্দোলন বাইরে থেকেও সুস্পষ্ট। সুরমা অন্য আলোচনায় বীরেনকে আমন্ত্রণ করল। বলল, "বীরেন, বাড়িটা আমি একটু নতুন করে সাজাতে চাই। আমি সারা দুপুর ভেবে কী ঠিক করেছি তোমায় দেখাব। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?"

"নিশ্চয়ই।" নিশ্চিত কিছুই এতে ছিল না বলে আরেকবার যোগ করতে হোলো, "নিশ্চয়ই।"

সুরমা এই দ্বিরুক্ত সম্মতির অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে অচেতন ছিল না, তবু আপত্তি করল না। উদ্বেগ গোপন রেখে হাসতে চেষ্টা করে বলল, "তোমার পড়ার ঘরটা ওদিক থেকে এদিকে আনতে চাই, কেননা মাঝে মাঝে ওই ঘর থেকে মালীগুলো এমন গোলমাল করে যে তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়।"

বীরেন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সে তো খুবই ভালো হবে।" তার নিজেকে আবার অপরাধী মনে হোলো যে সত্যি সুরমা ওর সুবিধা-অসুবিধার কথা এত ভাবে, অথচ বীরেন সুরমার জন্যে কখনো এতটুকু চিন্তা করে না।

সুরমা বলল, "গুড্, আর তোমার পড়ার ঘরে ওই আলোটাও বদ্‌লে দেব। আর হ্যাঁ, ওই ঘরটা অনেক দিন থেকে খালি পড়ে রয়েছে। আর খালি থাকা মানেই তো চাকরগুলো কখনো ওঘরটা ঝাঁট দেবে না বা পরিষ্কার করবে না। যত জঞ্জাল জমে উঠেছে। ওগুলো সব সরিয়ে ওঘরটা কাজে লাগাতে হবে।"

বীরেনের দিকে না তাকিয়ে সুরমা বলে চলছিল, "ওখানে ছোটো-খাটো একটা 'সেলার' করব ভেবেছি। সত্যি, বড়োই লজ্জার কথা যে রোজ রোজ এত লোকের বাড়িতে যাই, অথচ আমার বাড়িতে ভদ্র কাউকে ডেকে ভদ্রভাবে একটা ড্রিংক দেবার ব্যবস্থা নেই। বড়ো বড়ো জানালা আছে, সুন্দর একটা সেলার হবে এখানে। সেদিন চৌধুরীদের বাড়ি আমি খুব ভালো করে দেখে এসেছি। ওই দেয়ালটার গায়ে, জানো—"

হঠাৎ সুরমা পিছন ফিরে চমকে উঠল যে বীরেন স্থির দৃষ্টিতে ওই ঘরটার, অর্থাৎ ভূতপূর্ব ঠাকুর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। বোঝবার উপায় নেই সে সুরমার কথা এক বর্ণও শুনেছে কিনা। বীরেনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে সুরমা সত্যি ভয় পেল। ওর দৃষ্টিতে যতটা অসহায়তা ছিল ঠিক ততটাই যেন হিংস্রতা ছিল।

হেসে সুরমা বলল, "তুমি আমার কথা শোনোনি বোধহয়। আমি বলছিলুম কি—"

"শুনেছি। ওঘরে 'সেলার' হবে না।" প্রতি দুটো কথার মধ্যে সুচিন্তিত ছেদ। পুরো বাক্যটার উচ্চারণে কঠিন অনমনীয় দৃঢ়তা। এর মধ্যে বীরেনের সাম্প্রতিক অনিশ্চয়তার লেশমাত্র আভাস ছিল না। সকল সন্দেহের নিরসন করে বীরেন আরো স্পষ্ট করে তার সিদ্ধান্তের পুনর্ঘোষণা করল, "ওঘরে 'সেলার' হবে না।"

এতক্ষণ বীরেনের জন্যে সুরমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সত্যকার সহানুভূতিও ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুরমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তার নিজেকে নিরতিশয় অপমানিত মনে হোলো। সে বীরেনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, "কেন হবে না?"

বীরেন এতক্ষণ একবারও তাকায়নি সুরমার দিকে। এখনো তাকাল না। একটু কম রূঢ়তা কিন্তু সমান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "তর্ক করব না। যা বলেছি সেইটেই শেষ কথা।" বীরেন নিজের ঘরে ফিরে যেতে যেতে সুরমাকে জানিয়ে গেল, "আমি এখন বেরুব। আমার ফিরতে দেরি হতে পারে। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।"

সুরমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বীরেন বেরিয়ে গেল। যাবার আগে আরেকবার আগেকার ঠাকুরঘরের দিকে তাকাল। এবারে দৃষ্টি কঠোর নয়, প্রায় করুণ। কার কাছে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

সদর দরজার কাছে আসতেই বীরেনের গাড়ি বিমলের গাড়ির মুখোমুখি হোলো। "আরে, আমি আসছি, আর তুমি বেরিয়ে যাচ্ছো?"

"তা কী হয়েছে? তুমি বসো না। সুরমা আছে। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"

বীরেনের পোষাকে, কথায় কী যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে বিমল বলে উঠল, "তোমার কী হয়েছে, বীরেন? য়ু লুক স্ট্রেঞ্জ, য়ু ডু।"

"নো, বিমল, আই অ্যাম্ নট হোয়ট য়ু উড্ কল অ্যান ইণ্টরেস্টিং কেস্।" বীরেন ড্রাইভারকে চলবার আদেশ দিল। বিমল বাড়ির ভিতরে এলো, কিন্তু ধাঁধাঁটার বাইরে রইল।

*

সেই ফ্ল্যুরিতে দেখা হবার পর থেকে ললিতার কী যেন হয়েছিল। তাকে আর দেখা যেতো না প্রত্যাশিত জায়গাগুলিতে। চৌঠা জুলাই অ্যামেরিকান কনস্যুলেটের পার্টিতে সে অনুপস্থিত। চোদ্দোই জুলাই সে ফরাসী কনস্যুলেটের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না। রাজার আনুষ্ঠানিক জন্মদিনে পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনে তাকে দেখা যায়নি। সেই ললিতা যে রাজার সর্দির খবর পড়লে হাঁচতে শুরু করতো, রাণীর মলিন ছবি দেখলে কাঁদতে! সুরমা তাকে খুঁজেছে, কিন্তু খবর পায়নি। ললিতাও খবর নেয়নি। মনেও ছিল না। সময়ও ছিল না।

তবু কলকাতা ছোটো শহর। তার উপর ললিতা-সুরমারা যেখানে বিচরণ করে সেটার পরিধি আরো ছোটো। তাই দেখা হয়ে যায়ই একদিন না একদিন। ক্লাবে না হলে হোটেলে, হোটেলে না হলে মার্কেটে। কখনো বা সিনেমায়। আর কোথায় যাবার জায়গা আছে কলকাতায়?

এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে সুরমার সঙ্গে ললিতার দেখা হয়ে গেল লাইটহাউস সিনেমার সামনে। সকালে সে সেদিন রাত্রি ন'টার শোর জন্যে টিকিট কিনতে এসেছিল হলিউডের কী যেন এক ছবি দেখতে। সুরমা বোধহয় নিউ মার্কেটে যাচ্ছিল। দেখা হলে দু'জনে দু'জনকে দোষ দিল এত দিন দেখা না হবার জন্যে। ললিতা বলল সুরমাকে সে বহুবার টেলিফোন করে পায়নি, সুরমা বলল ললিতার লাইন তো সর্বক্ষণ এনগেজ্‌ড্‌। এই মিথ্যা অজুহাতগুলি সবাই বলে, এবং সবাই অবিশ্বাস করে। তবু বলতে হয়। সামাজিকতার জন্যে সামান্য মিথ্যা কথা বলা নাকি মিথ্যা কথা নয়।

ললিতা একা ছিল না। ধুতি-পরা এক বাঙালী বাবু সঙ্গে ছিলেন। ললিতা পরিচয় করিয়ে দিল, "উনি লেখক। নাম শুনেছ নিশ্চয়— নবীন গুপ্ত। আমাদের নতুন বইয়ের গল্প ও সিনারিও লিখছেন।"

সুরমা নবীনবাবুর নাম শোনেনি। ললিতা যে কোনো ছবির সঙ্গে জড়িত ছিল তাও সে জানতো না। কিন্তু বোধহয় তার জানা উচিত ছিল দুটোই। তাই সে অজ্ঞতা প্রকাশ না করে বলল, "তাই বুঝি?"

ললিতা রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই বলতে সুরু করল, "দেখবে ছবি

হবে বটে আমাদের 'আধুনিকা'। নবীনবাবু যা চমৎকার ডায়ালগ্ লিখেছেন সে তোমায় কী বলব! কথায় কুথায় মেয়েদের গালাগাল!"

কথায় যোগ দেবার জন্যেই সুরমা বলল, "তাহলে তোমার ছবি চলবে কী করে ললিতা? আমি তো শুনেছি বাঙলা ছবি মেয়েরাই বেশি দেখে!"

"আরে সেইজন্যেই তো এছবি সবচেয়ে ভালো চলবে। মেয়েদের গাল দিলে মেয়েরা তা শুনতে আসবেই; বাঙালী মেয়ে তো, এক জেনারেশন আগে স্বামীর হাতে মার খেয়েছে, এখন স্বামীদের স্বাস্থ্য এত খারাপ যে প্রহার দেবার শক্তি নেই। কিন্তু মেয়েদের অভ্যাস যাবে কোথায়? স্বামীর লাথির বদলে এখন তাই কথার চাবুক কোনো লেখার মধ্যে বা ছবির মধ্যে পেলে এক বেলা মাছ না কিনে ওই বই কিনবে বা ওই ছবি দেখতে যাবে।"

"সত্যি ললিতা, তোমার বাঙালী মেয়ের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ শুনে হেসে বাঁচিনে!"

"আর শুধু মেয়েরাই নয়। ওই যে বললুম, স্বামীদের দেহে বল নেই আগেকার মতো স্ত্রীদের প্রহার করবার। তাই তারাও সিগারেটের পয়সা বাঁচিয়ে এক কপি করে 'আধুনিকা' নিয়ে বাড়ি ফিরছে, কেননা তাদের হয়ে লেখক তাঁর কলমকে স্ত্রীঠেঙানো লাঠিতে পরিণত করেছেন। দু'দলেরই মনোহরণ করবার এইটেই তো অব্যর্থ উপায়!"

সুরমা প্রাণ খুলে হাসছিল ললিতার কথায়। সকাল বেলায় তার মন ভালো ছিল না, যেমন বহু দিন থেকে কোনো সকালেই থাকে না। ললিতার কথার মতো টনিক আর নেই। তার বিষাদ কোথায় ভেসে গেল। সে নিজেই বলল, "চলুন নবীনবাবু, ফেরাৎসিনিতে একটু কফি খাওয়া যাক। চলো ললিতা।"

"তোমরা গিয়ে বসো ভাই। আমি একটা টেলিফোন করে এসে এক্ষনি তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।"

নবীন বেচারী কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে আধুনিকাদের সম্বন্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় লেখে বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র

প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। এই সমাজের মেয়েদের সে কাছে থেকে কখনো দেখেনি। আজ সুরমাকে কাছে দেখে একবার মনে হোলো সে তার লেখায় এদের প্রতি বোধহয় অবিচার করেছে। এরা সবাই তো সত্যি ললিতা নয়। এদের কারো কারো, যেমন সুরমার, সত্যি যে লালিত্য আছে। শুধু কথায় নয়, স্বভাবে। নবীন লেখক তো, তাই মনে মনে সে সুরমাকে কল্পনা করল তার স্বপ্নের আদর্শ মেয়ের রূপে। রূপ, গুণ, সলজ্জতা, সপ্রতিভতা, স্বাধীনতা, স্বামী-অধীনতা, স্বাধীন চিন্তা, ভগবদ্‌ভক্তি, প্রাণশক্তি, সহিষ্ণুতা, পাণ্ডিত্য, সাহিত্যপ্রীতি—ইত্যাদি অষ্টোত্তর শত পরস্পরবিরোধী গুণ সে মনে মনে সুরমার উপর আরোপ করল। এমন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে আধুনিকাদের পক্ষ সমর্থন করে আজই একটা উপন্যাসে হাত দেবে। লেখকদের সামনে যা কিছু দেখা দেয় তাই তাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। পৃথিবীর সব কিছুর অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা যেন নবীনদের লেখার সামগ্রী জোগানো।

কিন্তু তবু নবীনের সংকোচ কাটল না, সুরমাকেই বলতে হোলো, "আমি কিন্তু এর আগে কখনো আর কোনো বাঙালী লেখককে মীট্ করিনি।"

নবীন আরো সংকুচিত হোলো। তার মনে হোলো সে যেন চিড়িয়াখানায় নবানীত কোনো জীব। দর্শকের বিস্ময়ের সীমা নেই। তবু হেসে বলল, "আমিও এর আগে আপনার মতো কারো সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করিনি।"

বাঙলায় কথাগুলি সুরমার কাছে কী রকম যেন অপরিচিত শোনালো। নবীনও ঘেমে উঠল এই কথা ভেবে যে বোধহয় তার ভদ্রতা প্রায় প্রেম-নিবেদনের মতো শুনিয়েছে। নবীন বুঝল তার লেখা বাঙলা ছবির সংলাপ কেন এত কৃত্রিম শোনায়। সেগুলি আগাগোড়া বাঙলা বলে। আমরা সবাই নিত্যকার কথাবার্তায় এত বেশি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি যে বেশির ভাগ কথাই পুরোপুরি বাঙলায় বললে অস্বাভাবিক শোনাতে বাধ্য। এ দৈন্য পুরোপুরি বাঙলা ভাষার নয়, বাঙালী লেখকেরও নয়। বাঙালীর শিক্ষার। তার স্বভাবের।

সুরমা বলল, "আপনি অনেক দিন থেকেই সিনেমার জন্যে লিখছেন বুঝি?"

নবীনের সাহিত্যিক চিত্তের সবচেয়ে কোমল জায়গায় আঘাত লাগল। সুরমা কেবলমাত্র আলাপ জীইয়ে রাখবার জন্যে না ভেবে যে মন্তব্য করেছিল নবীনকে তা স্মরণ করিয়ে দিল তার জীবনের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যর্থতার কথা। নবীনের ইচ্ছা হোলো সে হনুমানের মতো বুক ছিঁড়ে সুরমাকে দেখায় যে সে সত্যি আর্টভ্রষ্ট হয়নি, যে সে সত্যি লেখক, সিনেমার ভাড়া-করা কালমিক নয়। এখন সে বই লিখছে না শুধু—। শুধু কী? নবীন নিজেই নিজের প্রশ্নের কাছে হার মানল। প্রত্যয়শূন্য কণ্ঠে সুরমার প্রশ্নের উত্তর দিল, "না, এর আগে একটা ছবিতে শুধু সংলাপ লিখেছিলুম। তার আগে আমি লেখক ছিলুম।"

সুরমা বলল, "এই ছবি ছাড়া এখন আর কী বই লিখছেন বলুন না? আমরা মেয়ে তো, আমাদের কৌতূহল বইয়ের শেষ পাতায় আর বই লেখা হবার আগে।"

নবীন এবার আর চেষ্টাও করল না তার অন্তর্দ্বন্দ্ব গোপন করতে। "না, মিসেস চ্যাটার্জি। আর কিছু লিখছি না।"

"কেন?"

অস্বাভাবিকরকম গাঢ় কণ্ঠে নবীন বলল, "লিখছি না, কেননা আমি ফুরিয়ে গেছি।"

"ফুরিয়ে গেছেন?" সুরমা সত্যি বুঝতে পারছিল না।

"হ্যাঁ, মিসেস চ্যাটার্জি, ফুরিয়ে গেছি। আর কিছু লেখবার নেই আমার। এই সাংঘাতিক সত্যটা আপনাকে না বলে নানা মিথ্যে জবাব দিতে পারতুম। বলতে পারতুম, বিংশ শতাব্দীর আর্ট হচ্ছে সিনেমা—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন ছিল রঙ্গমঞ্চ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংবাদপত্র—তেমনি আজকের আর্ট সিনেমা এবং আমি সেই আর্টের পূজারী। কিন্তু তাহলে মিথ্যা বলা হোতো।"

নবীন এখন যেন প্রায় নিজেরই কাছে বলছিল, "সত্যি কথা হচ্ছে এই যে আমার সাহিত্যিক মৃত্যু হয়েছে। হত্যা নয়, অন্যকে দোষ দেব

না। আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আমি মরে গেছি। আমার লেখবার আর কিছু নেই। জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি, সাহিত্যে তাই নিষ্ঠা নেই। এখন তাই যা লিখি সে শুধু লেখার জন্যেই লেখা। জীবনে সেই প্রথম যে ছোট্ট গল্পটা লিখেছিলুম, যেটাতে আমার প্রথম খ্যাতি হোলো, সেটা ছিল সত্যকার লেখা। আর আজ, ওই ললিতা দেবী যা বলছিলেন, মেয়েদের বিরুদ্ধে কয়েকটা চতুর কথা লিখে হাততালি কুড়োই। তার বেশি কিছু কলম থেকে বেরোয় না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নবীন আবার বলল, "আর বেরুবেই বা কী করে? আমার চার দিকের যত মানুষকে দেখি কাউকে জীবন্ত বলে মনে হয় না। মরাদের নিয়ে কি উপন্যাস হয়? সবাইকে যেন পোকায় কাটছে। সব যেন পচে পচে যাচ্ছে কোন ভয়ানক এক নৈতিক কুষ্ঠরোগ থেকে। সব যেন হাসপাতালের রোগী। আইসোলেশন্ ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা ঘরের লোক। একের সঙ্গে আর কারো যোগাযোগ নেই। সবাই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। যার যার নিঃসঙ্গতায় প্রত্যেকে গলে যাচ্ছে সব, সবাই পচে গেছে।"

হঠাৎ সুরমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না, মিসেস চ্যাটার্জি, বোধহয় আমি নিজেই পচে গেছি।"

সুরমা কিছু বলতে পারবার আগেই নবীন বিদায় পর্যন্ত না নিয়ে ফেরাৎসিনি থেকে বেরিয়ে গেল। সুরমার সামনে, চায়ের দোকানে বসে, নবীন কাঁদতে প্রস্তুত ছিল না। আর সবাই হাসতো যে!

সুরমার চোখে জল আসছিল। সে তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ থেকে কালো চষমাটা বের করে চোখ ঢাকল। নবীনের প্রলাপে তার সারা গায়ে কাঁটা ফুটছিল, বিশেষ করে সেইখানে যেখানে আগে থেকেই কাঁটা বিঁধে ছিল। তার সত্যি নিজেকে হাসপাতালের রোগী বলে মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে আইসোলেশন্ ওয়ার্ডের। হ্যাঁ, আইসোলেশন্।

হয়তো এক মিনিট, হয়তো দশ মিনিট, পরে ললিতা এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। সুরমা দেখল ললিতা পাশের চেয়ারে এসে বসল। কিন্তু

সুরমার যেন মনে হোলো ললিতা অনেক অনেক দূরে। অস্পষ্টভাবে শুনল, "নবীনবাবু কোথায় গেলেন?"

সুরমার সময় লাগল ললিতার কথা ঠিক করে বুঝতে, বুঝে স্মরণ করতে যে নবীন কিছুক্ষণ আগে বাজে বাজে কতগুলি কথা বলে সুরমার মনের সব কিছু যেন ওলট পালট করে দিয়ে গেছে। ললিতা সত্যি দূরে নয়। ওরা সত্যি হাসপাতালে নয়। ওরা চায়ের দোকানে। সুরমা বলল, "চলে গেছে।"

"চলে গেছে? ওয়েল, ওয়েল, এই কুইয়ার বাঙালী লেখকগুলির এমনি কান্ড। দে টেক দেম্‌সেল্‌ভ্‌স্‌ সো ড্যামড সীরিয়সলি!" নাকের ডগা থেকে ঘাম মুছে পাউডার ঘষতে ঘষতে ললিতা বলল, "গেছে ভালোই হয়েছে। তোমার সঙ্গে একটু মন খুলে কথা কওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে শুনব তোমার খবর।"

"তোমার খবর বলো ললিতা। আমার বলবার মতো কোনো খবর নেই।" সুরমার স্বরে তখনো অপরিমেয় নৈরাশ্য।

ললিতা তার পুরানো রসিকতা করে বলল, "যা বলবার মতো তা তো কখনোই শোনবার মতো হয় না। যাহা বক্তব্য তাহা অশ্রাব্য, একঘেয়ে। শ্রাব্য হচ্ছে যা অকথ্য। হা—হা।"

সুরমা ললিতাকে বক্তৃতায় ব্যস্ত রেখে নিজের মনে নিজের কথা ভাববার উদ্দেশ্যেই বলল, "তোমার দেখা নেই কেন? কী করছিলে এত দিন?"

"ভয়া—নক ব্যস্ত ছিলুম। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে সমীরের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ নেই।"

"যোগাযোগ নেই?" সুরমা সত্যি চমকে উঠল। "কই, শুনিনি তো! কী হোলো?"

"হবে আবার কী? আই হ্যাড্‌ হ্যাড্‌ জাস্ট এ উই বিট টু মাচ অব হিম্‌। এক দিন সন্ধ্যাবেলা তাই বেরিয়ে পড়লুম, আর ফিরলুম না।"

"ফিরলুম না?"

"টেলিফোনে অবিশ্যি পরের দিন জানিয়ে দিয়েছি।" ললিতা তখনো তার নাকের ডগা নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

সুরমা হাত দিয়ে ললিতার মুখ আড়াল করা আয়নাটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "পরের দিন টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলে!"

"ইয়েস্। অ্যান্ড আই অ্যাম নাউ ফ্রী। অ্যাবসলুটলি ফ্রী। দি ডিভোর্স পেপারস শুড গো থ্রু ইন দি নেকসট ফ্যু ডেজ্, অ্যান্ড দেন— ।" ললিতা তার জিভ দিয়ে অপ্রীতিকর কিন্তু অর্থপূর্ণ একটা শব্দ করে তার বাক্য শেষ করল।

সুরমার তার অর্থগ্রহণে সময় লাগল না; সে বুঝল যে সমীর-ললিতা আর স্বামী-স্ত্রী নয়, কিন্তু এর পূর্ণ তাৎপর্যটা সম্যক উপলব্ধি করতে তার সময় লাগল। সত্যি ললিতা সমীরকে ছেড়ে দিল? তেরো বছরের সম্বন্ধের আর কিছু অবশিষ্ট রইল না? ললিতা তো বলছে, আপদ গেছে। কিন্তু সমীর কী ভাবছে? আচ্ছা—সুরমা চেষ্টা করল এমন সম্ভাবনার চিন্তাটা পর্যন্ত মন থেকে নির্বাসিত করতে—কিন্তু তবু—যদি—যদি—যদি সুরমার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে—ঘটবে না সে জানা কথা—কিন্তু তবু, যদি,—বলা তো যায় না—যদি ঘটে—তাহলে সুরমার কী মনে হবে? কী মনে হবে বীরেনের? সুরমা কাঁদবে, হ্যাঁ, না কেঁদে সে পারবে না, ললিতার মতো পাষাণহৃদয়া নয় সে। কিন্তু বীরেন? সে কি খুশি হবে না, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে না, অনেকটা এই ললিতার মতো? না। কিছুতেই না। সুরমা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বীরেনও কাঁদবে সুরমার মতো। আহা, ও যে অসহায়! বোধহয় সুরমার চেয়েও অসহায়।

কিন্তু দু'জনেই যদি সত্যি দুঃখিত হয়, ও কাঁদে, তাহলে বিচ্ছেদ হবে কেন? সুরমার মনে এই প্রশ্নটা একবারও উদিত হয়নি, এবং তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের চিন্তা ও আবেগ জীবনে কখনো এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বলে তো জানিনে। তাই ললিতার সিদ্ধান্ত সুরমার মনঃপূত হোলো না। কিন্তু, একবার তবু একথা মনে না করে পারল না যে একদিন সুরমাও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে, সেও একদিন বীরেনকে মুক্তি দিয়ে নিজের মুক্তি সন্ধান করতে বাধ্য হতে পারে। সেদিন কী হবে?

সুরমা আর কিছু ভাবতে পারবার আগেই ললিতা তার আগেকার ঘোষণার বঙ্গানুবাদ করে বলল, “আমি এখন একেবারে স্বাধীন।”

স্বাধীন? স্বাধীনতার মানে কী? বন্দর থেকে বহিষ্কৃত যে জাহাজ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে তার হাল হারিয়ে ও পাল ছিঁড়ে যেদিকে খুশি ভেসে যাচ্ছে, তাকেই কি বলে স্বাধীন? যার জীবনে কোনো প্রকার বন্ধন নেই একমাত্র সে-ই কি মুক্ত? আর সবাই বন্দী? সুরমার নিজেকে বহুবার বন্দিনী বলে মনে হয়েছে, কিন্তু কোনটা তার কারাগার? কে তাকে বেঁধে রেখেছে? বীরেন নয়। হায়রে, বীরেন নয়। বীরেনের বাহুবন্ধনে বন্দিনী হলে সে নিজেকে ধন্য মনে করতো, মনে করতো তার মতো মুক্ত ব্যক্তি কেউ নেই এই ধরাতলে। তবে তাহলে সুরমার শৃঙ্খল কোথায়? শৃঙ্খল যে আছে তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। সুরমা চলতে পারে না। চলতে গেলে তৎক্ষণাৎ মনে হয় পিছন থেকে কে যেন টানছে, আরো এগিয়ে যেতে বারণ করছে। মা-বাবা নয়, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক বহুকাল ঘুচেছে। বীরেন নয়, অন্তত সক্রিয়ভাবে নয়। তবু সুরমার ঝাঁপ দিতে বাধে। বীরেন ব্যক্তিটি যাই করুক—বা না করুক—সুরমার স্বামী বীরেন তো একটা মানুষ মাত্র নয়, সে সহস্রশাস্ত্রবন্দিত আরাধ্য দেবতা। স্ত্রীর পূজায় তার জন্মগত অধিকার। শুধু জন্মগত নয়, জন্মাতীত অধিকার। এই হচ্ছে যুগ যুগ থেকে হিন্দু নারীর আদর্শ। সুরমা সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধি-কারিণী—বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়। অন্তত তাই সে হতে চেয়েছিল, এবং তাই সে ছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। সুরমা তার পূর্বতন আদর্শে আস্থা হারাল, কিন্তু নতুন কোনো আদর্শ খুঁজে পেল না তার বদলে। ললিতা কি তবে তাই পেয়েছে? স্বামি-স্বাধীন সত্তার সন্ধান পেয়েছে? সুরমার কৌতূহল অদম্য হোলো। ললিতার পুনরুক্ত ঘোষণা উপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করল, “কিন্তু তুমি এখন করবে কী ললিতা? স্বামীর জন্যে ভালোবাসা না থাক, তার জন্যে শ্রদ্ধা না থাক, স্বামীর প্রয়োজন তো সেই সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। তুমি এখন থাকবে কোথায়? করবে কী?”

ললিতা এত সব প্রশ্নের সত্য ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বলতে চাইল,

'দেখো সুরমা, বিধাতা নারীজাতিকে নানাভাবে পঙ্গু ও অক্ষম করেছেন। কিন্তু একেবারে অসহায় করেননি। সব পুরুষকেই জীবিকার্জনের জন্যে কিছু না কিছু শক্তি আহরণ করতে হয়, শিক্ষা করতে হয়; কিন্তু মেয়েরা একটা ন্যূনতম মূলধন নিয়ে জন্মায়।' এই কথাগুলি অশোভন, প্রায় অশ্লীল শোনাতো। তাই ললিতা শুধু বলল, "সুরমা, মাই পেট্, আমার জন্যে অযথা চিন্তিত হয়ো না। বুদ্ধিমান পুরুষ বেকার থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে অনাহারে মরতে বাধ্য হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।"

এই পরিশোধিত আকারেও কথাটা সুরমার ভালো লাগল না। শাড়ির আঁচলটা সে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। আবরণের যেন তার প্রয়োজন ছিল—ললিতা-বর্ণিত মূলধন লুকোবার জন্যে বুঝি। ললিতা তার কাহিনী বলে চলল, "তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর থেকে আমি যে কত কিছুর মধ্য দিয়ে গেছি তা তোমার জানা নেই। উইলি-নিলি, অনেক কিছু করতে হয়েছে যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কল্পনাতীত ছিল। বুঝেছি যে একবার স্বামীর ঠিকানা হারালে আর কিছু ঠিক রাখবার উপায় নেই। তুমি জানতেও পারবে না, কখন ঠিক কী ভাবে নীচে নেমে গেছ। দেখবে শুধু অমায়িক হয়ে কত বিপদ ডেকে এনেছ।"

ললিতা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বেপরোয়া সুরে বলল, "এবং, ক্রমে দেখবে সেগুলো বিপদ বলেও মনে হচ্ছে না। দূর থেকে যা ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল, কাছে এসে দেখা গেল তা সত্যি এত ভয়াবহ নয়। ভয়াবহ নয়, কিন্তু অপমানের শেষ নেই। এক শো লোকের হাত ধরার চাইতে একটা লোকের লাথি খাওয়াও যে ভালো এটা আগে জানতুম না। আরে—"

ললিতা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আরে, চোখে ছাই কী যেন একটা পড়ল।"

সুরমা বলল, "ললিতা!"

"সত্যি বলছি, চোখে কী যেন পড়েছে।—না, কিছু পড়েনি বোধহয়। এই—এই সিগারেটের ধোঁয়াটা বোধহয় চোখে গেছে। আঃ—" ললিতা

কাশবার ভাণ করে বলল, "আঃ, লোকে হয়তো মনে করবে আমি আজ সবে সিগারেট খেতে শিখেছি।" ললিতা হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখে জল রয়ে গেল।

সুরমা সাহস পেল না ললিতাকে স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কে জানে কী ভয়ানক উত্তর শুনতে হবে। কিন্তু তবু তার জানতে বাকি রইল না ললিতার বর্তমান স্বাধীনতার মর্ম। একটু আগে সুরমা তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে যে ললিতার স্বাধীনতার প্রতি লুব্ধ হয়েছিল এখন সেকথা ভাবতে সে শিউরে উঠল। ললিতারই যদি এই দশা হয়ে থাকে, তবে সুরমার কী হবে কে জানে? সুরমা চুপ করে রইল। সে নৈঃশব্দ্যে ললিতা আরো বেশি অস্বস্তি বোধ করল। অস্বস্তি গোপন করার জন্যেই হেসে বলল, "বাট, আই অ্যাম ডুয়িং ফাইন নাউ। ফিল্মের কাজে আমার মতো মেয়ের সম্ভাবনা অপরিসীম। তুমি জানো না সুরমা কী রকম সমস্ত অর্বাচীন লোকেরা বাঙলা ফিল্মে কাজ করে। অর্ধেক ডিরেক্টররা ড্রেসিং গাউন আর ড্রেস স্যুটের তফাৎ জানে না!" ললিতা হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে বেচারীদের কান্ড দেখলে। পুয়োর ডিয়ারস্। তবু আধুনিকা ও অভিজাতদের নিয়ে ছবি কবা ওদের চাইই চাই। গুড জব টু, কেননা আমি এদিকে ওদের সাহায্য করতে পারি।"

"তুমি ওদের এই সমস্ত ব্যাপারে এডভাইসর বুঝি?"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয় অবিশ্যি। আমি নতুন ট্যালেণ্টও সংগ্রহ করি। এখনকার প্রোডিউসাররা নতুন মুখ চায়। চায় ওরা যাকে বলে সোসায়েটি লেডিজ্!"

সুরমা হাসতে পারছিল না। তবু হেসে বলল, "তাই নাকি?"

"ইয়েস্। সোসায়েটি মানে অবশ্য সোসায়েটিচ্যুতা।"

"তা তুমি কাউকে পেয়েছ এখন পর্যন্ত?"

"স্ট্যাক্স্। হীপ্স্ অব দেম। লিলির কণ্ট্র্যাক্ট তো আজই সই হয়ে যাওয়ার কথা। ফিল্মে অবিশ্যি লিলি নাম বদ্লে হবে—"

সুরমা ললিতাকে শেষ করতে দিল না। সেই ফ্ল্যুরিতে সমর-লিলির প্রেমের কথা শোনা অবধি সুরমার অনেকবার ওদের কথা মনে

হয়েছে। নিজের ফুরিয়ে যাওয়া দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার মরুভূমিতে ওদের স্মৃতিটা সুরমার মনে প্রায় মরূদ্যানের সম্মান পেয়েছিল। নিজের কথা ভুলতে চেষ্টা করে বহুবার সে সমর আর লিলির মুখর প্রেমের উচ্ছল আনন্দের কথা কল্পনা করে সান্ত্বনা পেয়েছে। ভেবেছে, ওরা নিশ্চয়ই সুখে আছে। সমাজের অভিশাপ ওদের গায়ে লাগে না, পিতৃরোষ ওদের উপেক্ষার বস্তু। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে তুষ্ট—বাইরের পৃথিবী আছে কি নেই তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই—সমর লিলিকে পেয়েছে, আর লিলি সমরকে,—এর বেশি আর কিছু ওদের কাম্য নেই। আহা, সব বিয়ে কেন এমন হয় না? আর, হলেও কেন এমন থাকে না? না থাক। লিলি আর সমর যে সুখী, এইটে কল্পনা করেই সুরমার ভালো লাগতো। ললিতা তাই লিলির উল্লেখ করতেই সুরমা উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোন লিলি বলো তো? সেই তোমার ভাইপোর প্রেমিকা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সেই লিলি।"

সুরমা আঘাত পেল, কেননা তার কল্পনা চূর্ণ হয়ে গেল। "ও কেন ফিল্মে নামছে?"

"কী করবে তা ছাড়া? সমর তো—"

"সমরের কী হয়েছে?"

"মারা গেছে।"

"মারা গেছে? কী করে?"

ললিতা আবার তার জিভ্ দিয়ে একটা শব্দ করল। এটা দুঃখ-সূচক। তারপর বলল, "বেচারী! ঠিক কী হয়েছিল জানিনে। বিয়ের পরে কিছুদিন আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পরেই কী নিয়ে যেন একটু মতভেদ হয় ওদের মধ্যে।"

সুরমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তার মনে হোলো সে বৃহৎ একটা ব্যর্থ বিবাহের ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ কী হাওয়া বইছে চতুর্দিকে যে তার নিশ্বাসে বন্ধুত্বের শ্যামলতা নিমেষে ঊষর ঔদাসীন্যে পরিণত হচ্ছে, প্রেমের ফুল না ফুটতে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে! সুরমার দুঃখ যে তার একার নয় এতে সে এতটুকু সান্ত্বনা

পেল না। লক্ষ লক্ষ অমিলিত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বুভুক্ষু আত্মা যেন সেই মুহূর্তে সুরমার কানে এসে আর্তনাদ করতে থাকল। তার মধ্যে তার নিজের হাহাকার।

সুরমা আত্মচিন্তা স্থগিত রেখে জিজ্ঞাসা করল, "কী নিয়ে মতভেদ?"

"আমি ঠিক জানিনে। গোড়াতে তো ওই রাইটার্স বিল্ডিংসে বিয়ে হবে না পুরুত ডেকে, তাই নিয়ে তর্ক। তার পরের মতভেদ নাকি ওই ওদের ইডিওলজিক্যাল না কী বলে।"

"ওরা তো দু'জনেই কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বর ছিল, তাই না?"

"তা ছিল। কিন্তু ওদলেও যে ভাঙন লাগছিল। এক দল নাকি বলছিল এখনি বিপ্লব চাই, আরেক দল বলছিল এখনো তার সময় হয়নি। প্রথম দলেরই জয় হোলো। সমর ছিল সেই দলে। কিন্তু লিলি মেয়ে তো। সে অনেক বেশি বিচক্ষণ। সে জানতো দুয়েকটা তেলেঙ্গানা করে আর কলকাতায় কয়েকটা ট্রাম পুড়িয়ে বা অ্যাসিড বাল্ব্ ছুঁড়ে কয়েকটা লোক মরবে ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। তাই সে ছিল সাবধানীদের দলে। দলভেদ নিয়ে তাই গৃহভেদ।"

কম্যুনিস্ট পার্টির এত সব আভ্যন্তরীণ কলহে সুরমার কৌতূহলও ছিল না, জানতোও না সে বিশেষ কিছু। ললিতার ব্যাখ্যানেও সে পরিষ্কার কিছু বুঝল না। অধৈর্য হয়ে তাই সে বলল, "কিন্তু সমর মারা গেল কী করে?"

ললিতা বলল, "আহা, তাই তো বলছি। লিলি তাই পার্ট-টাইমার হয়ে গিয়ে কোন একটা মেয়ে ইস্কুলে যেন চাকরি নিল। মাঝে মাঝে চাঁদাও তুলতো পার্টির জন্যে। তার বেশি নয়। কিন্তু সমর একেবারে ঝাঁপ দিল সম্মুখ সমরে। দু'জনে দেখাও হোতো না, কেননা দেখা হলেই তর্ক হোতো, ঝগড়া হোতো। তাছাড়া সমর তখন লুকিয়ে ছিল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড। বারাসতে কোন এক চাষীর বাড়িতে থাকতো বুঝি। আর পাশেই কোথায় যেন ছিল তার বোমা তৈরির জায়গা। আমি অত শত জানতুম না। আমার নিজেরই সমস্যার শেষ নেই, তার উপর লিলি-সমরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় আমার?

কিন্তু একদিন বালিগঞ্জে লিলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি বললুম, 'কীরে, তোরা নাকি ভীষণ ঝগড়া করছিস?' আহা বেচারী! লিলি বললে, 'না, পিসীমা। আর ঝগড়া হবে না। চলো আমার ওখানে। সব বলব।' পথে বলল, সমরই ঠিক বলেছে। সত্যি কিছু হবে না এই নেহরু গভর্নমেণ্টকে দিয়ে। বিপ্লব ছাড়া উপায় নেই। সমরের পথই একমাত্র পথ। লিলি নিজে মনস্থির করে ফেলেছে। সে-ও আবার ফুল-টাইমার হয়ে যাবে পার্টির কাজে। দু'জনে মিলে লিলির হস্টেলে গিয়ে দেখি দরজার কাছে একটা চিঠি, কে যেন রেখে গেছে। আমি বলতেই লিলি চিঠিটা তুলে পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে বুঝতে দেরি হোলো না যে ওটা সমরের চিঠি। আমি ব্যাপারটা লঘু করবার জন্যেই বললুম, 'কীরে, আবার ঝগড়া নাকি?'

সুরমা ললিতাকে বাধা দিল। ললিতার দোষই ওই। সংক্ষেপে ও কোনো কথা বলতে জানে না। মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে হলে ওর মেঘনাদের জন্ম থেকে সুরু না করলে শান্তি হয় না। সুরমা বলল, "কিন্তু সমর মারা গেল কী করে?"

ললিতা বিরক্ত হয়ে বলল, "আহা, বলতে দাও। সেই কথাই তো বলছি।" ছেদ ভুলে গিয়ে আবার বর্ণনার সুরে বলতে থাকল, "লিলি আমার দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো।' মাত্র দু'লাইনের চিঠি। শুধু লেখা আছে : 'লিলি, সাত মাসের বোমা তৈরির পরে আজ বুঝতে পারছি যে ওগুলো বোমা নয়, বুদ্বুদ। ভুল করেছি। সময় পেলেই এবং সম্ভব হলেই দেখা করে সব বলব। তুমিই ঠিক বলেছিলে। কেন তখন তোমার কথা শুনিনি!' আমি তো অবাক। এ যখন বলে আমি ঠিক, ও বলে তুমি ভুল। আর ও যখন বলে ওটা ঠিক, এ বলে এটা ভুল! আমি বললুম, 'আবার ঝগড়া তাহলে?' লিলি চুপ করে রইল।"

কিন্তু সুরমা চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "তারপর?"

"হাজার হোক লিলি বাঙালী মেয়ে তো। বলল, 'না, আর ঝগড়া নয়। সমর যা বলছে তাই মেনে নেব। শুনেছি পার্টি লাইনও এদিকেই বদল হবে।' তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। লিলি ওই কথাটা বলতে

না বলতেই একটি বাচ্চা ছেলে এসে লিলির ঘরে ঢুকল। বেচারী ভয়ে কাঁপছিল। আমাকে দেখে কিছু বলতে সাহস পেল না। লিলিকে বাইরে আসতে বলল। লিলি অভয় দিলেও ছেলেটি ভরসা পেল না। শুধু বলল, 'আমার সঙ্গে ট্যাক্সি আছে। একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে আপনাকে।' লিলির কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ছেলেটি শুধু তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বলল। আমি বললুম আমাকে চৌরঙ্গীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে। লিলির অনুরোধে ছেলেটি রাজী হোলো। লিলি ততক্ষণে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। কোথায় যাচ্ছে জানে না, কেন যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে ওই ছেলেটি সমরের দূত। আমাকে কিছুতেই নামতে দিল না লিলি। আমাকে টেনে নিয়ে গেল।"

"কোথায়?"

"ওই যে বললুম, বারাসতে। সেই তখনি তো ছেলেটির কাছ থেকে জানলুম সব কথা। সমর পার্টিকে জানিয়েছিল তার মত পরিবর্তনের কথা, কিন্তু নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছিল ঠিক আগেকার মতো আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে। যেন তখনো ওই নীতিতে তার সম্পূর্ণ আস্থা। আর ঠিক সেদিন সকালেই কী করে যেন একটা বোমা ফেটে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড। জখম সমরকে ওরা তো আর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে না। এদিকে ওর ঘরেও পুলিশের আবির্ভাব আসন্ন—কেননা বোমা ফাটার শব্দ তো বাঙালী মেয়েদের কান্নার মতো নয় যে কেউ শুনবে না। সমরকে তাই ওরা নিয়ে গেছে মাইল দেড়েক দূরে একটা ক্ষেতের মধ্যে। সারা দিন কেউ দেখেনি ওকে। কী করে যাবে ওদিকে দিনের বেলায়? যদি পুলিশের লোক দেখে ফেলে! আমরাও তাই রাত্তিরে ওখানে যাচ্ছিলুম সমরকে দেখতে।"

"এসব শুনে লিলি কী বলছিল ট্যাক্সিতে?" সুরমা সহজবোধ্য কারণেই সমরের চেয়ে লিলির কথা বেশি ভাবছিল।

"কিচ্ছু না। শুধু একবার ছেলেটিকে জিগেস করল সমর কিছু বলেছে কিনা। তাকে দেখতে চেয়েছে কিনা। ছেলেটি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সগর্বে শুধু বলল, 'সমরদার জ্ঞান হতেই আমাকে বললেন ওঁকে ওই ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যেতে। আর বললেন দু'চারটে

জিনিস যা সরাবার ছিল তা সরিয়ে ফেলে আমাকে কলকাতায় চলে আসতে। বললেন ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না, উনি শব্দ করবেন না, কেউ জানতে পারবে না। রাত্তিরেও আমাকে যেতে বারণ করেছিলেন; বলেছিলেন, দরকার হবে না।' ছেলেটি প্রায় কেঁদে ফেলছিল। লিলি সোজা হয়ে বসে নিজের মনকে শক্ত করছিল।

"গিয়ে দেখি—যা দেখলুম সে আর বলতে পারব না। ধানক্ষেত পেরিয়ে সেখানে পেঁছোতেই তো প্রাণান্ত। সব অন্ধকার, সব নিঃঝুম। দুয়েকটা ব্যাঙ্ এদিক থেকে ওদিকে লাফিয়ে যাচ্ছিল হয়তো, হয়তো তাদের পিছনে ছিল দু'য়েকটা সাপ। কিন্তু পথের ভয়ের কথা আর মনে রইল না যখন গিয়ে দেখলুম—সমর শেষ হয়ে গেছে।" ললিতা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুরমার বুঝি নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আবার তবু প্রশ্ন করল, "লিলি কী করল?"

"অদ্ভুত মেয়ে লিলি। বিশ্বাস করবে না—শক্ত হয়ে পাথরের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল সমরের শেয়ালে-খাওয়া শরীরটার সামনে। একটা কথা বলল না, একফোঁটা চোখের জল ফেলল না, একবার একটু কাঁদল না।"

সুর বদল করে অবসন্ন কণ্ঠে বর্ণনার বিরতির চেষ্টায় ললিতা বলল, "ওহ্ ইয়েস, ইট ওয়াজ এ বীস্টলি বিজ্‌নেস্ অল রাইট। আমি কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলুম, আর ওই বাচ্চা ছেলেটি তক্ষুনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে, 'কথা বলবেন না। সমরদার শেষ অনুরোধ ছিল কেউ যেন জানতে না পায়, পার্টির যেন কোনো অসুবিধা না হয়।' আমি তো—"

সুরমা জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "লিলিও বুঝি সেই জন্যেই চুপ করে ছিল?"

"হবে। আমি অত পার্টি ফার্টি বুঝিনে বাপু, অ্যাপার্ট ফ্রম ককটেল্‌স্ অ্যান্ড ডিনার্‌স্। কলকাতায় ফিরবার পথে একবার লিলিকে মামুলি শোকজ্ঞাপনের মতো কিছু একটা হয়তো বলতে গিয়েছিলুম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে লিলি বললে, 'সমরের জন্যে শোক করো না। ওর মৃত্যু ব্যর্থ হবে না।' আমি বললুম, 'যে যাবার সে

তো চলেই গেছে। তার জন্যে আর শোক করে কী হবে? আমি ভাবছিলুম তোর কথা।' লিলি বললে, 'আমার শাস্তি আমি পেয়েছি। আমি ওর যোগ্য ছিলুম না।' কিন্তু বললে কী হবে? হাজার হোক, মেয়েমানুষের মন তো। আমি সেদিন ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলুম। (হ্যাঁ তখনো আমার বাড়ি ছিল।) আর কী মুস্কিল তারপর! লিলি কাঁদছে, অথচ কাউকে বলবার উপায় নেই কেন কাঁদছে। লর্ড সিনহা রোডে এমনিতেই কথা বলা বিপদ। তার উপর একথা যদি ঘুণাক্ষরে কারো কানে উঠতো তা হলে কি আর রক্ষে ছিল?

"আমি তাই যথাসম্ভব চুপ করে ছিলুম। কিন্তু তাতে কী হবে? ঘড়ি কি তাতে থেমে থাকে? একদিন গেল, দু'দিন গেল। লিলি ওঠে না, খায় না, ঘুমোয় না। একবার সমীর এসে বলে গেল, 'সমরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ও কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া তো তরকারীর ঝাল। ও না হলে স্বাদ হয় না।' লিলি শুনল কথাটা, কিন্তু মুখ তুলল না সমীর চলে না যাওয়া পর্যন্ত। আমি বললুম, 'এখন আর কেঁদে কী হবে বল্? সব ঝগড়া তো মিটে গেছে!' লিলি কী বলল জানো? বলল, 'না, পিসীমা। ঝগড়া যদি মিটে যেতো তাহলে কি আর কাঁদতুম এত? তাহলে একটা সান্ত্বনা থাকতো। মনকে বোঝাতুম যে সমরের সঙ্গে জীবনে আমার মিলন হয়নি, কিন্তু মৃত্যুতে সে মিলন হয়েছে। কিন্তু তাও যে হোলো না পিসীমা! সব কিছু শেষ হয়ে যাবার আগে আমরা দু'জনেই বদলালুম, কিন্তু সেও বিপরীত দিকে। ও ভাবলে ও ভুল করেছিল, আর আমি ভাবলুম আমি ভুল করেছিলুম। অর্থাৎ আবার দু'জনে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেলুম।' সত্যি লিলির মুখ খুলেছিল এতক্ষণ কান্নার পর। বলল, 'আরো কি জানো পিসীমা, সমর মরল সেই কাজ করতে গিয়ে যে কাজে ওর আর বিশ্বাস ছিল না। ওই সবুজ ক্ষেতে কালো মৃত্যু যখন এগিয়ে এলো তখন সমরের মনে এই সান্ত্বনাটুকু পর্যন্ত ছিল না যে সে তার বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিচ্ছে! শেষ পর্যন্ত এমন নিরর্থক মৃত্যু ওর কপালে ছিল?' বাব্বা, লিলির সে কী কান্না তারপর! সমর মরেছে বলে

নয়, এই জন্যে—অ্যান্ড দ্যাট'স হোয়ট পাজ্‌ল্‌ড্‌ মি মোস্ট্‌—এই জন্যে যে সমর অকারণে মরেছে।”

ললিতা থামল। কিন্তু সুরমা যেন বুঝল লিলি কেন কেঁদেছে। দুঃখ বরণ করায় মহত্ব আছে, কিন্তু সে দুঃখ অসহ্য যাতে গৌরবের আশ্বাসটুকুও নেই। নিজের বিশ্বাসের জন্যে মৃত্যু এক কথা, কিন্তু দুর্ঘটনায় মৃত্যু যেন অর্থহীন অবসান মাত্র। এ যেন যানবাহনের অসুবিধা ঘটানোর দায়ে সত্যাগ্রহীর কারাগমন। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় মরা। ব্যাকরণে যা হাস্যকর পতৎপ্রকর্ষ, জীবনে তা সব চেয়ে মর্মান্তিক। সমর আর লিলির সঙ্গে সুরমা তার নিজের জীবনের কী সাদৃশ্য পেল তা সে নিজেই জানে, কিন্তু তার কেবলই মনে হতে থাকল যে লিলির আয়নায় সে যেন নিজের ছবি দেখছে। সে যেমন লিলির দুঃখ বুঝল এমন যেন আর কেউ বোঝেনি। শুধু তাই নয়, যেন নিজেকেও আরেকটু ভালো করে বুঝল লিলির দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে।

দৃষ্টান্তের আলোচনায় সুবিধা আছে। নিজের দুঃখ নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করবে সুরমা? ললিতা এসব বুঝবেই না। হয়তো হাসবে। বীরেনকে বলতে যাওয়া বৃথা। তাছাড়া বীরেনকে বলতে যাওয়া মানে, বীরেনের ভাষায়, 'টু মেক এ সীন্‌।' তার চেয়ে ঘৃণ্য কিছু নাকি নেই। ওটা নাটকীয়, ওটা অসভ্য। বস্তীর বাইরে অচল। বাকি রইল সুরমা নিজে। কিন্তু স্বগতোক্তি যে নাটকে হাস্যকর, জীবনে মানসিক অসুস্থতার সূচনা। না, পরের কথাই ভালো। নিজের কথা নিজের মনেই থাক, যতদিন না অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুরমা আবার ললিতাকে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, লিলি এখন আর সমরের কথা বলে না, না?”

“একবারও না। বোঝা যায় যে মনে চাপা আছে কথাটা, কিন্তু প্রকাশ্যে একবারও সমরের নামোল্লেখ পর্যন্ত করে না।”

“পারে কী করে?”

“মাই পেট্‌,” (সম্ভাষণটা শুনলে সুরমার গা জ্বালা করে), “টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট, মৃত্যুর চেয়ে সহজে সহনীয় দুঃখ আর নেই।

অসহ্য হচ্ছে জীবিতের কাছ থেকে ব্যথা পাওয়া। এ ব্যথা ভোলা যায় না, কেননা স্মারক বর্তমান; এ ব্যথা মেনে নেয়া যায় না, কেননা দুঃসহ দুঃখেও দুর্মর আশা কেবলই ছলনা করতে থাকে, বলে আবার সে আসবে; এ ব্যথা মনিকর্ণিকার ঘাটের মতো সর্বদা জ্বলতে থাকে, কেননা প্রতি মুহূর্তে এতে ইন্ধন জোগায় মরে-যাওয়া সুখের পচে-যাওয়া দেহের ঘৃতাক্ত অবশেষ। ডেথ্ ইজ সো ফাইন্যাল, দ্যাট'স দি বেস্ট থিং অ্যাবাউট ইট; নাথিং এল্স্ ইজ, অ্যান্ড দ্যাট'স দি ওয়ার্স্ট অব ইট অল্।"

সুরমা শিউরে উঠল ললিতার বর্ণনার বীভৎসতায়। বাজারে সে কী কিনতে এসেছিল, আর কী পেল হঠাৎ নবীন আর ললিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে? কিন্তু না, মৃত্যু সুরমার প্রশ্নের উত্তর নয়। বাঁচতে তাকে হবেই, যতদিন না বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে যুঝতে হবে সব কিছুর সঙ্গে, সব চেয়ে জোরে সেই নৈরাশ্যের সঙ্গে যা বৈশাখের কালো মেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে সুরমার মনকে ঘিরে। সুরমার আর ভালো লাগছিল না ললিতার কথা শুনতে। আরো খারাপ লাগছিল বাড়ি যাবার কথা ভাবতে। ম্লান হাসির সঙ্গে ললিতাকে বলল, "থ্যাংকস ফর দি পেপ্ টক্।"

"পেপ্ টক্ না ছাই। আমি হাসি, হাসাই, অন্ধকারে ভয়-পাওয়া ছোটো ছেলে যেমন শিস্ দেয় নিজেকে সাহস জোগাবার জন্যে। আমি তেমনি হাসি শুধু কেঁদে ফেলবার ভয়ে।" দীর্ঘশ্বাসের ছেদের পরে ললিতা আবার নিমেষে এফিশিয়েণ্ট, কর্মদক্ষা, মহিলা হয়ে উঠল। "ওয়েল্, লিলির ব্যবস্থা তো হোলো, কিন্তু আমার আরো তিন চারজন তারকা চাই। খুঁজতে হবে। তবে বাঙলা দেশে আর যারই অভাব হোক, মেয়ের অভাব নেই।"

সুরমা হেসে বলল, "আমাকে নেবে নাকি?"

ললিতার কাছে কথাটা আদৌ পরিহাস বলে মনে হোলো না। সে নিতান্ত গম্ভীর স্বরে বলল, "আজই।" সুরমার অট্টহাস্যে ললিতা

একটু দমে গেল। বলল, "তা—তুমি কি আর আসবে? যদিও"—লোভ দেখাতে দোষ কী?—"যদিও এলে তুমি দু'মাসে বীরেন চ্যাটার্জি'র দু'বছরের মাইনে রোজগার করতে পারো।"

"সত্যি?" সুরমার কাছেও প্রস্তাবটা এখন যেন পুরোপুরি হাস্যকর মনে হোলো না।

"কিম্বা আরও বেশি।"

সম্ভাবনাটা হাতে রাখতে দোষ কী? সুরমা বলল, "আচ্ছা, অভিনয় করা ভীষণ শক্ত, না?"

"বোধহয় শক্ত। কিন্তু সিনেমায়, বিশেষ করে অ্যামেরিকান ছবির নকল হিন্দি ছবিব নকলে বাঙলা ছবিতে অভিনয়ের দরকার হয় না। সুন্দরী হলেই হোলো।" ললিতা সত্যি পরীক্ষা করতে লেগে গেল, "আচ্ছা, মুখটা একটু বাঁ দিকে ঘোরাও তো, আরেকটু, পার্ফেক্ট। চমৎকার ফোটোজেনিক মুখ তোমার, এমন প্রোফাইল নেই কারো। আর—"

"আচ্ছা, স্টুডিওর আবহাওয়াটা বড়োই, বড়োই," সুরমা ইতস্তত করছিল অশ্লীল কথাটা বলতে, বলল, "বড়োই ইমমর‍্যাল, তাই না?"

"হ্যাঁ। তবে অন্যান্য জায়গা—যেমন কোনো কোনো ক্লাব—যেখানে তুমি আমি বহু দিন গেছি—তার চেয়ে বেশি নয়। বরং, আমি এমন ছবির মেয়ের নাম করতে পারি যারা তোমার মিসেস ব্ল্যাংক ও লেডি ড্যাশের চেয়ে অনেক বেশি ভদ্র। আমার যে দুটো স্তরের সঙ্গেই অল্প বিস্তর পরিচয় আছে তা বোধহয় অস্বীকার করবে না।"

"না, তা করব না।" সুরমার হঠাৎ সন্দেহ হোলো যে ললিতা বোধহয় সত্যি মনে করে বসে আছে যে সুরমা সত্যি সিনেমায় যোগ দেবে। সেটা একেবারে অসত্য নয় বলেই সুরমাকে জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে হোলো। বলল, "বাজে কথা থাক। কিন্তু একটা কাজ করবে?"

"করব। কিন্তু তুমি যেটাকে বাজে কথা বললে সেটাই আমার কাছে কাজের কথা কিন্তু। ওই কাজের উপর এখন আমার জীবিকা নির্ভর করে।" ললিতা হাসির কথা বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

পোষাকের কথা বলতে বলতে হঠাৎ চামড়ার তলায় চলে যায়, ব্লাউস নিয়ে আলোচনা করতে করতে হৃদয়ের কথায় চলে আসে। বলল, "এবং আমাদের মতো মেয়ের পক্ষে জীবিকা অর্জন করা যে কী দুরূহ ব্যাপার তা কল্পনাও করতে পারবে না।"

সুরমা সত্যি কল্পনা করতে পারতো না। তাই সে ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করল, "কেন, তুমি সীনিয়র কেম্ব্রিজ করেছ, অনায়াসে একটা স্কুলে চাকরি পেতে পারো।"

"তা পারি। কিন্তু খাবো কী করে?"

"আমি অবৈতনিক মাস্টারির কথা বলিনি।"

"প্রভেদ অল্পই। অবৈতনিক আখ্যা দিলে অনাহারের সঙ্গে তবু অপমানটা থাকতো না।"

"ওটা বাজে কথা, ললিতা। বাঙলা দেশের সব শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা অনাহারে মরে যায়নি।"

"যায়নি, তবে যাবে। আর এখন যেভাবে আছে সেটাকে বাঁচা বলে না।"

"না, তোমার মতো বিলাসিতার সুযোগ তাদের নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সাধারণভাবে জীবনযাত্রা অন্যান্য রকমের আরামের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয়। এই তো সেদিন—"

"থাক। তোমার নিশ্বাসের অপব্যয় করো না। আমি জানি তুমি কত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তোমার কথার প্রমাণ জাহির করতে পারো। কিন্তু আমি তোমায় অসংকোচে বলছি, অমন ধর্মপরায়ণতায় আমার রুচি নেই। যে জীবনধারায় আমি অভ্যস্ত তার ব্যতিক্রম আমি সহজে ঘটতে দেবো না। এ জীবনের জমার খাতে শূন্য রেখে পরকালের পুণ্য ক্রয় করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, আমি চাই—"

"কিন্তু এত পাপের বোঝা তুমি বইবে কী করে?"

"একমাত্র পাপ হচ্ছে দারিদ্র্য। পাপ হচ্ছে সেই দারিদ্র্যের অভিশাপ নিঃশব্দে মেনে নেয়া।" ললিতা একটু আগে তার বর্তমান জীবন নিয়ে যে অনুতাপ করেছিল এখন তার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। কিছুক্ষণ আগে লিলিপ্রসঙ্গ আলোচনা করে তার লিলির সাম্প্রতিক আলোচনার

কয়েকটা কথা মনে পড়েছিল। তা-ই সে সুরমাকে শুনিয়ে দিল। ব্যক্তিগত ব্যর্থতার তিক্ততার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে লিলির রাজনৈতিক মতবাদ মুখস্থ করা বুলির মতো শোনাল না। সুরমা এত কথা বুঝল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। শুধু আগে ললিতাকে যে অনুরোধ করতে গিয়েছিল তা ব্যক্ত করে বলল, "আচ্ছা, লিলিকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে? আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করতে চাই।"

ললিতা সন্দেহ করল। "হঠাৎ লিলির সঙ্গে?"

"এমনি।" অর্থাৎ ললিতাকে তার বলতে ইচ্ছা নেই।

"আমি যখন কিছু বলতে চাইনে তখন 'এমনি' বলি।" ললিতা বলল বিরস স্বরে।

"আমার যখন কিছু বলবার নেই তখন 'এমনি' বলি।" সুরমা হার মানল না।

"বেশ, কেন জানিনে, লিলিও সেদিন আমাকে বলছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হয়তো আমি না বললেও দেখা করবে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কিকিং দি ল্যাডার' তার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও দু'চারবার যে দেখিনি এমন নয়।"

সুরমার ভালো লাগছিল না এই কুৎসিত অভিযোগগুলি। সত্যি তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না লিলির সঙ্গে দেখা করবার পিছনে। সে শুধু দুঃখিনী হিসাবে আরেক দুঃখিনীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায় এক জুয়াড়ী যেমন অপর জুয়াড়ীর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় কী কারণে কোন ঘোড়া হেরে গিয়ে তাদের দুজনকেই সর্বস্বান্ত করেছে। প্রিজনার অব ওয়ার ক্যাম্পে এসে এক বন্দী যেমন সহবন্দীর সঙ্গে আলোচনা করে কী করে তারা ধরা পড়ল তাই নিয়ে। বিরক্ত হয়ে বলল, "থাক তাহলে, লিলিকে ব'লো আমার সঙ্গে যেন সে দেখা না করে।"

"সুরমা দেবী আমার উপর রাগ করলেন।" ললিতার এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে সে কখন যে কী ভাবছে তা আর কারো পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই মুহূর্তে সে বিচক্ষণা, বুদ্ধিমতী,

হৃদয়হীনা উদ্দেশ্যসাধিনী : পর মুহূর্তে সে আবেগপ্লাবিত, অসহায় স্বার্থবোধরিক্ত শিশু। একবার তার প্রতি ঘৃণার অন্ত থাকে না, একটু পরে ওকে করুণা না করে পারা যায় না। স্বামিত্যাগের পূর্বে ললিতার আর যারই অভাব থাক, আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। তখন কেউ তার উপর রাগ করেছে একথা ভাবলে তার আনন্দই হোতো। বরং কেউ ঈর্ষিত ও ক্রুদ্ধ না হলেই তার নৈরাশ্যের সীমা থাকতো না। কিন্তু স্বামী থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন, হবার পরেই কী যেন হয়েছে ললিতার। এখন সে ক্ষুদ্র মৎস্যদের পার্টিতেও আহূত না হলে আহত হয়। ইতিপূর্বে সে সহস্র নিমন্ত্রণেও যে-দরজা খুলতে প্রবৃত্ত হয়নি, এখন সে-দ্বার রুদ্ধ দেখলে সে মনে করে তাকে অবহেলা, এমনকি অপমান, করা হচ্ছে। একবারও তার মনে হয় না যে একদিন সে ওদেরই কাছ থেকে কত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ওদের অপমান করেছে। তাই সে নৈরাশ্যের সুরে সুরমাকে বলল, "সুরমা, প্লীজ, আমার উপর রাগ করো না। আমি অসহায়।"

অসহায়? সে কী কথা? অসহায় তো সুরমা। সে বীরেনের স্ত্রী, অথচ বীরেনের স্ত্রী নয়। নিবারণ পুরুতের মেয়ে, অথচ নিবারণ পুরুতের মেয়ে নয়। সদানন্দের বান্ধবী, অথচ সদানন্দের বান্ধবী নয়। কিন্তু ললিতা তো বুদ্ধিমতী। তার কেন এমন অবস্থা হবে? তবে কি স্ত্রীস্বাধীনতা বলে কোনো বস্তু নেই এসংসারে? সুরমা একটু আগে খেলাচ্ছলে মনে মনে চিত্রাভিনেত্রীর যে স্বর্গ কল্পনা করে ললিতার পরোক্ষ প্রস্তাবনায় উৎসাহিত হয়েছিল, এখন তা একান্তই মরীচিকা বলে মনে হোলো। সুরমা দেবী বলে একটি মহিলা যে স্বাধীনভাবে সসম্মানে গৃহীত হতে পারেন—একবারও বীরেন চ্যাটার্জির উল্লেখ ব্যতিরেকে—সুরমার মন থেকে সে আশা নির্বাসিত হোলো। কিন্তু বীরেনকে নিয়েই বা সে থাকবে কী করে?

পৃথিবীতে সব চেয়ে অসত্য হচ্ছে পুরানো প্রবাদবাক্যগুলি। বীরেন ঠিকই বলেছিল, ওগুলি হচ্ছে দেউলিয়া বুদ্ধির সর্বশেষ নির্ভর। কথাটা বোধহয় ইংরেজ কোনো লেখকের। বীরেনও বোধহয় উদ্ধৃতি হিসাবেই সুরমাকে কথাটা বলেছিল। কিন্তু বাঙলা দেশে এই উক্তিটা

সবচেয়ে বেশি সত্য। এখানে প্রবাদে দু'চারটে অনুস্বার-বিসর্গ থাকলে সেকথা অবজ্ঞাত হবে এমন আশংকা একান্তই অমূলক। এখানে যে-কোনো কাপুরুষ যদি অন্তর্ধানের আগে বলে, 'যঃ পলায়তে স জীবতি' তাহলে তাকে কেউ কাপুরুষ বলবে না; বলবে, সে শাস্ত্রবচন মানছে। তেমনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' বলে যেদেশে সংস্কৃতে একটা কথা আছে সেখানে বিবর্জিতা নারীর অবস্থা যে কী হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। ললিতার মতো ব্যক্তিত্বশালিনী মেয়েও সেখানে পরাস্ত হতে বাধ্য। সুরমা বলল, "ললিতা, মেনে নাও। যেমন আমি মেনে নিয়েছি। ডাক্তারসাহেবের কাছে ফিরে যাও।"

"ফিরে যাব?" ললিতা ক্রোধ সম্বরণ করতে পারল না। "নেভার। অর্থ উপার্জনের জন্যে পুরুষ যত শত পাপ করে তার শতাংশও আমি এখনো করিনি। তার প্রত্যেকটা আমি চেষ্টা করব, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে পাপিষ্ঠা বলে মনে করব না। তার পরেও যদি না পারি—ওয়েল—ইট'স জাস্ট টু ব্যাড্—কিন্তু তার আগে পর্যন্ত চেষ্টা না করলে আমি ললিতাই নই।"

"চেষ্টা তো অনেক করলে ললিতা!"

"ইয়েস, অনেক। কিন্তু শেষ হয়নি এখনো। শেষ হবে আমার নিজের শেষের সঙ্গে। তার আগে নয়।"

"ইতিমধ্যে?"

"ইতিমধ্যে ভোগ করব। আনন্দ করব।"

"কিন্তু আনন্দ কাকে বলে জানবে না। সুখ থাকবে নাগালের বাইরে।" সুরমা নিজের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। সুখের চাঁদ যে নিবারণ বামুনের কন্যারও আয়ত্তের অতীত, একথা তার মনে ছিল না। কিন্তু এটুকু বুঝেছিল যে ললিতার পথে সুখ নেই।

ললিতা বলল, "না সুরমা, সুখের আশা ত্যাগ করেছি অনেক দিন। দেবতার চরণামৃতের আনন্দ যথেষ্ট বলে মনে হয়নি বলেই অন্য বস্তুর উন্মাদনায় আসক্ত হয়েছি।"

শত পরিবর্তনের পরেও সুরমা পুরোহিতকন্যা। চরণামৃত সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা আর নেই, কিন্তু সংস্কার আছে। তাই সে ললিতাকে বলল, "ও দুটোর তুলনা অসমীচীন।"

"আমার কাছে নয়। আমার বিচারের একমাত্র ক্রাইটেরিয়ন আমি নিজে কোনটা থেকে কতটুকু সান্ত্বনা পাই। কিন্তু থাক সেকথা।"

"থাক। কিন্তু টাকাই তো সব নয়, ললিতা।"

ললিতা এবার দার্শনিকার সুরে বলল, "সত্যি, টাকা সব নয়, সুরমা। কিন্তু টাকা চাওয়ার সুবিধা এই যে এ জিনিস চাইলে, অন্তত অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ না হয়ে চেষ্টা করলে, পাওয়া যায়। আমি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতী অন্তত এইজন্যে যে তুমি যা চাইছ তা চাইলে পাওয়া যায় না, চেষ্টা করলে আরো দূরে সরে যায়।" ললিতা আরেকটা সিগারেট ধরাল।

সুরমা চমকে উঠল। যেন হঠাৎ কেউ তার স্নানের ঘরে প্রবেশ করেছে দরজায় ঘা না দিয়ে। যেন হঠাৎ কেউ তার ছবি তুলে নিয়েছে আগে থেকে কিছু না বলে। যেন শুধু ছবিও নয়, তার মনের এক্স-রে। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "আবার ভীষণ গরম পড়েছে, তাই নয়?"

ললিতা ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, "গরম নয়, ঠাণ্ডা।"

"মানে?"

"মানে 'কোল্ড ওয়র'।"

সুরমা শেষ চেষ্টা করল। "লিলি কী বলে? এখনো পলিটিক্স নিয়ে কথা বলে নিশ্চয়ই। ও নিশ্চয়ই মনে করে যত দোষ সব অ্যামেরিকার? আর রুষ ভালুক বুঝি নিরীহ মেষশাবক?" সুরমা একটু হাসতেও চেষ্টা করল। চেষ্টাটা ভয়ানকরকম সফল হোলো না। কথার বল্ নিয়ে পিং-পং আর সত্য নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলতেই থাকল।

ললিতা বলল, "লিলি এখন রাজনীতির চাইতে অর্থনীতি নিয়েই বেশি ব্যস্ত। যদিও এটাও রাজনীতির ভাষায় ব্যক্ত করতে পারো, কেননা এখন সে পাব্লিক সার্ভিস ছেড়ে মার্কিন প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজে বিশ্বাসী।" ললিতা আগেও বাক্যে অসংযত এবং রুচিতে লঘু ছিল। অসংযমের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এখন তার রুচিও অতিশয় স্থূল

হয়েছে। তাই সে অনায়াসে রুচিহীন হাসির সঙ্গে পরিহাস করল, "ব্যাপারটা যে প্রাইভেট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং এণ্টারপ্রাইজ যে এন্তার চাই, তাতেও সন্দেহ নেই।"

সুরমার ভালো লাগছিল না এসব রসিকতা। তবু ভাগ্য ভালো, হয়ত সুরমার প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হবে না। কিন্তু ললিতাকে সে চেনেনি। ললিতা ভবীর মতো স্মৃতিপরায়ণা। বলল, "কিন্তু আমি বলছিলুম অন্য কোল্ড ওয়রের কথা। টু বি প্রিসাইজ, মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জির।"

সুরমা কিছুতেই এ আলোচনায় প্রশ্রয় দেবে না। তাই সে প্রতিবাদও করল না, কথাটা এড়াতেও দ্বিতীয় চেষ্টা করল না। শুধু চুপ করে রইল।

ললিতা বলে চলল, "কী হয়েছে জানো সুরমা, আমি কিছুদিন আগে এমন একটা আবেষ্টনীতে ছিলুম যেখানে অন্যায় ছিল, অন্তর্দাহ ছিল, বেদনা ছিল, সব কিছুই ছিল, কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখোমুখি আলোচনা ছিল না। সবাইকে ভান করতে হোতো—যেমন তুমি এখনো করছ—যে বাগানে সব ফুল ঠিক ফুটে আছে, কোথাও কিছু হয়নি, কোনো পাতা ঝরে পড়েনি, কোনো মন ভেঙে পড়েনি। সেখানে আর পাঁচজনের মতো আমিও মনে ব্যথা নিয়ে হেসেছি, মনে ঘৃণা নিয়ে করমর্দন করেছি, মনে ক্রোধ নিয়ে কুশলপ্রশ্ন করেছি। বাইরের অনাবশ্যক কথা নিয়ে বাগাড়ম্বর, আর ভিতরের আসল কথা সম্বন্ধে নীরন্ধ্র নৈঃশব্দ্য, এইটেই ছিল রীতি। আমিও মেনে নিয়েছিলুম। আমারও ওই রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পরে এখন এসে পড়েছি এমন পরিবেশে যেখানে অতশত ভদ্রতার বালাই নেই। স্টুডিয়োর সেটে ওদের ডিরেক্টরের নির্দেশে যখন যেমন প্রয়োজন হাসতে আর কাঁদতে হয় বলেই ওরা বাইরে এসে আর অভিনয় করে না। কৌতূহল হলে সরাসরি প্রশ্ন করে, যেমন আমি করলুম।"

"কিন্তু আমি উত্তর দিলুম না। হ্যাঁ-ও না, না-ও না।"

ললিতা হেসে বলল, "দরকারও নেই। উত্তর তোমার দেয়া হয়ে

গেছে, সুরমা। অবিশ্যি, প্রশ্নটা জিগেস করবার আগেও আমি যে উত্তরটা জানতুম না তা নয়।"

সুরমা প্রতিজ্ঞা করেছে কোনো কিছু বলবে না। সহস্র প্ররোচনা সত্ত্বেও না। কিন্তু বেচারী জানতো না যে অনেক সময় আমরা যা বলি তার কোনো অর্থ থাকে না, কিন্তু আমাদের নৈঃশব্দ্য সর্বদা অর্থপূর্ণ।

ললিতা বলল, "বেশ, আজ আমায় কিছু ব'লো না। কিন্তু যদি কখনো দরকার হয়, ললিতাকে স্মরণ করতে সংকোচ ক'রো না। আমি ডাক্তার নই,—আর তোমার অসুখের কোনো ডাক্তারি আছে বলেও জানিনে—কিন্তু আমি ভালো আণ্ডারটেকার। এই আমার কার্ড।"

ললিতা সত্যি সুরমার হাতে একটা ছোটো ভিজিটিং কার্ড তুলে দিল। লেখা আছে 'ললিতা দেবী, এডভাইসর, নিউ বেঙ্গল থিয়েটার্স লিমিটেড।' উপরে ডান কোণে টেলিফোন নম্বর, আর নীচে বাঁ দিকে ঠিকানা।

সুরমা একটু আগে নবীনের কাছে হাসপাতালের কথা শুনেছে, তার উপর এখন একেবারে শবব্যবস্থাকারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভয় গোপন করে হাসির চেষ্টা করে বলল, "চমৎকার। বাকি শুধু মরতে!"

ললিতা একটুও না হেসে তৎক্ষণাৎ বলল, "আদৌ নয়। বাকি শুধু ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে যে আমরা সবাই মরে গেছি।"

সুরমা সত্যি আর সহ্য করতে পারছিল না এই বীভৎস আলোচনা। বলল, "থ্যাংক্স এগেন ফর দি পেপ্ টক্। আমাকে এবার উঠতেই হবে।"

"আর একটু বসো ভাই। আমাকেও উঠতে হবে, কিন্তু আমি সদানন্দের জন্যে অপেক্ষা করছি। ওর সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার আছে। অবিশ্যি তার আগে যদি লিলি এসে পড়ে, তাহলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।"

"লিলিও আসছে বুঝি এখানে?" সুরমা এমনি জিজ্ঞাসা করল কিছু না ভেবে।

ললিতা তার হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "এতক্ষণে তো এসে পড়া উচিত ছিল। তবে কম্যুনিস্ট তো, দেরি করে আসা ওদের পার্টিগত

অভ্যাস। কম্যুনিজম প্রাচ্যে প্রথম সফল হওয়ায় ওরিয়েণ্টাল অনেক-গুলি দোষ এখন ওদলের অংগীভূত হয়ে গেছে।"

নিরুপায় হয়ে সুরমা আবার তার হাতের ব্যাগ টেবিলে স্থাপন করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। আশা করতে থাকল যে ললিতা আবারও সুরমার ব্যক্তিগত প্রসংগে প্রত্যাবর্তন করবে না। সেই উদ্দেশ্যেই বলল, "সদানন্দবাবুর খবর কী? অনেক দিন দেখা হয়নি।"

"খবর? খবরদার! সদানন্দবাবুকে যেন এমন প্রশ্ন কখনো জিগেস করো না। সত্যি মর্মাহত হবেন, এবং একান্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দেবেন, 'আমাদের খবর আর কী বলব, হে হে! সে তো রোজ সকালে খবরের কাগজেই পড়ে থাকেন।' হা—হা।" এই রকমের অনুকৃতিকৌতুকে ললিতার পারদর্শিতা অসাধারণ। ইস্কুলেও সে প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রীর চলা ও বলার ভংগীর নিখুঁত নকল করে ক্লাস হাসাতো।

সুরমা বলল, "সত্যি?" এমন হাস্যকর রসবোধহীনতা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"একেবারে। আমি নিজ কানে শুনেছি। এই লীডারদের এক কণা সেনস অব হিউমর নেই।" ললিতা হাসি থামিয়ে বলল, "তবে লীডার-দের যেমন দুটো মুখ আছে—একটা পাবলিক আর দ্বিতীয়টা প্রাইভেট—তেমনি ওদের খবরের দু'টো স্তর আছে। একটা খবরের কাগজে বেরোয়, যেমন ধরো এই যে কাল বিকালে সদানন্দ মহতী এক জনসভায় উদ্দীপনাময়ী এক বক্তৃতা করেছেন। আরেকটা," এবারে ললিতা ষড়-যন্ত্রের নিম্নস্বরে বলল, "যেটা খবরের কাগজে বেরোয় না সেটা হচ্ছে এই যে সদানন্দ আজ সকালে উদীয়মানা চিত্রতারকা লিলি দেবীর সংগে দেখা করতে আসছেন।"

সুরমা তবু যেন বুঝতে পারল না ললিতার ঘোষণার পূর্ণ তাৎপর্য। কেননা সহজ ব্যাখ্যাটা সে এখনো বিশ্বাস করতে চাইছিল না। বলল, "সদানন্দের এখন কম্যুনিস্টদের উপর তত রাগ তাহলে নেই বলো!"

"এর মধ্যে আবার পলিটিক্স এলো কোত্থেকে? ফর সদানন্দ, এনিথিং ইন এ স্কার্ট,—অর এ শাড়ি!"

সুরমা অস্বস্তি বোধ করল। ভাবল, ভাগ্যিস ললিতা এই অশ্লীল কথাগুলি বাঙলায় বলে না! তা নইলে কানে আঙুল দিতে হোতো। ললিতার লজ্জা ঘুচে গেছে। স্থূল কথা সে স্থূলতর পরিহাসে আরো রসিয়ে তুলতে পারে অসংকোচে। বলল, "না, ভাই, সদানন্দকে অত ছোটো মনে করো না। দিনের বেলায় রাজনীতিতে সে সংকীর্ণমনা হতে পারে। রাত্রের রাণীনীতিতে তার উদারতা সত্যি অপরিসীম। লিলি তখন লাল নয়, হোয়াইট অ্যাজ এ লিলি!" নিজের রসিকতায় ললিতা হেসে আকুল।

সুরমা এতক্ষণে ললিতার অপেক্ষার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে সারা গায়ে শিউরে উঠল। তার যেন মনে হোলো ললিতার হীন ষড়যন্ত্রে সে-ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। আরেকবার উঠতে চেষ্টা করল। বলল সেকথা।

"মিস্টার চ্যাটার্জি অপেক্ষা করছেন বুঝি?"

ললিতার শ্লেষ উপেক্ষা করে সুরমা বলল, "না, ও আজকাল লাঞ্চে বাড়ি আসে না। বাইরে খায়।"

"আমিও তাই ভেবেছিলুম।"

"মানে?" সুরমা ললিতার ফাঁদে পা দিতে চাইল না।

ললিতা হঠাৎ সর্ব আবরণ উন্মোচন করে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, "হু ইজ্ দি উওম্যান?"

"মেয়ে? কোথায়?" সুরমা সবিস্ময়ে ফেরাংসিনির চতুর্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, "কোন মেয়ে? কার কথা বলছ?"

"বলছি না। জানতে চাইছি।"

সুরমা এবার বুঝল ললিতার কুৎসিত ইঙ্গিতটা। বীরেনের সম্বন্ধে এমন নীচ সন্দেহ যে কেউ করতে পারে সুরমা একথা কল্পনাও করতে পারেনি। তার নিজেরও এমন কথা মনে হয়নি কখনো। বীরেনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু একথা তাই বলে! সুরমার সর্ব শরীর রাগে কাঁপছিল। ঠোঁটও, কিন্তু কথা বলতে নয়। কথা সে বলতে পারছিল না।

ললিতা বলল, "জানি, মাই পেট্,—"

"ফর গড্'স্ সেক, ডোণ্ট মাই-পেট্ মি।" সুরমা না রেগে পারল না।

সুরমার উষ্মা উপেক্ষা করে ললিতা সর্বজ্ঞার মতো বলল, "ভেরি ওয়েল, মাই ডিয়ার, কিন্তু—অ্যাজ ওয়ান উওম্যান টু অ্যানাদার—আমি তোমাকে বলছি, কোনো পুরুষ যখন তার প্রেমিকা বা স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হয় তার একমাত্র কারণ দ্বিতীয় কোনো স্ত্রীলোকের আবির্ভাব। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা নেই। আমার অভিজ্ঞতা কম নয়। বিশ্বাস করো বোনটি আমার, বীরেন চ্যাটার্জির অন্যমনস্কতার উৎস যে অন্যা রমণী এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। একথা এমন সত্য যেমন সত্য এই যে দুই আর দুয়ে চার, যেমন সত্য এই যে কোনো ত্রিভুজের যে কোনো দু'টি বাহু তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড়ো, যেমন সত্য এই যে—"

ললিতাকে কথা শেষ করতে দিল না সুরমা। নিতান্ত রূঢ় স্বরে বলল, "থাক, আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই।" চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, "য়ুক্লিডের কথায়ই তোমার উত্তর দিচ্ছি—'এবসার্ড'। তুমি লিলি আর সদানন্দের জন্যে অপেক্ষা করো। আমি এবার যাবো।"

ললিতা তৎক্ষণাৎ কথা ও সুর বদ্‌লে বলল, "জানতুম তুমি আমার উপর রাগ করবে। সবাই আমার উপর রাগ করেছে। তুমিই বা কেন করবে না!" ললিতা জানতো যে দড়ি দিয়ে চোর বাঁধতে হয়, অশ্রু দিয়ে কোমলহৃদয়কে। বলল, "যাও। আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করবে আমার সেদিন ফুরিয়েছে। এখন আমার একা অপেক্ষা করবার পালা। কখন লিলি আসবে, কখন সদানন্দ আসবে, কখন দু'জনে দেখা হবে। এবং," দীর্ঘশ্বাসের বিরতির পরে বলল, "এবং তার পরে রুটিওয়ালার বিল্ শোধ হবে।"

সুরমা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে ললিতার এই করুণ স্বীকৃতিতে কপটতা ছিল। সত্যি ছিল না। তবু সুরমাকে যেতেই হবে। ললিতাকে সে তুলতে পারবে না, শুধু নিজে নেমে যাবে তার সঙ্গে অতল নীচে। তবু যাবার আগে না বলে পারল না, "দোহাই তোমার ললিতা, লিলিকে তুমি এপথে এগিয়ে দিয়ো না।"

"কেন নয়?" ললিতা কঠিন, প্রায় কর্কশ, স্বরে বলল, "কেন নয়? আমার ভাইপোর বিধবা বলে? লিলি শিশু বলে? আত্মীয়তার সেণ্টিমেণ্টের বালাই আমার নেই। দেখেছি তো, আমি যখন সমৃদ্ধ ডক্টর মিত্রের অমিতব্যয়িনী স্ত্রী ছিলুম তখন আমার আত্মীয়ের অভাব ছিল না। আজ পথে দেখা হলে সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন চেনে না আমায়। এই কঠোর পৃথিবীতে আমার আত্মসংস্থান করতে হবে শুধু আমাকে। না সুরমা, আমি যীশুখৃষ্ট নই। সবাই আমাকে ডান গালে চড় মারলে আমি বাঁ গাল বাড়িয়ে দেব, এমন নির্বোধ আমি নই। আমার ব্লাউস কেউ কেড়ে নিলে আমি তাকে আমার কোটটি উপহার দেব, এত মহানুভব আমি নই। বরং যে সমাজ আমার ব্লাউস কেড়ে নিয়েছে তার বস্ত্রহরণে আমার কিছুমাত্র—"

সুরমা তাড়াতাড়ি ললিতার অতিস্পষ্ট কথা চাপা দিতে গিয়ে বলল, "কিন্তু ওই যে তুমি যা বলছিলে, লিলি যে শিশু।"

"সো হোয়ট? তোমার ভগবানকে জিগেস করো মা-বাবার অসুখ নিয়ে কেন রোজ লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মাচ্ছে। জিগেস করো, নিষ্পাপ শিশু আঁতুড় ঘরে দাঁত পায় কোত্থেকে। জিগেস করো,—"

"ভগবানকে তো আর হাতের কাছে পাচ্ছিনে। তাহলে শুধু একথা কেন, আরো অনেক কথাই জিগেস করতুম।"

"এবং উত্তর পেতে না।"

সুরমার অনেক দিন পরে মনে পড়ল যে সে পুরোহিত-কন্যা, যে তার ঘরেও একদিন দেবমূর্তি ছিল। এবং, সত্যি তো, কবে সে তার কাছ থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল? যাক গে। কাজ নেই অত তত্ত্বকথায়। ছুটি নেবার জন্যেই বলল, "বোধহয়, ঠিকই বলেছ ললিতা।" সুরমা উঠে দাঁড়াল।

"বোধহয় নয়। নিশ্চয়ই। অনেক মূল্য দিয়ে জেনেছি।" হেসে বলল, "তোমাকে সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিনামূল্যে দিয়েছি।"

সুরমা হেসে বলল, "ধন্যবাদ।"

বেরিয়ে এসে মনে মনে বলল, এ সঞ্চয়ের অংশ না দিলে আরো বেশি

ধন্যবাদ দিতুম। এ তো সঞ্চয় নয়, সঞ্চিত অপচয়। ভস্মীভূত সিগারেট যেমন জমে ছাইদানে।

*

বীরেনের মনেও ছিল না সে ড্রাইভারকে কোথায় যাবার আদেশ দিয়েছিল। তার মনে শান্তির লেশমাত্র ছিল না। চিন্তারও শেষ ছিল না। মোটরগাড়িগুলির দোষই এই যে এগুলি জোরে যায় বটে, কিন্তু কোথাও যায় না। এই চেনা, পুরানো, এবং বীরেনের কাছে বর্তমানে একান্ত অপ্রীতিকর পৃথিবীটাতেই এর গতি আবদ্ধ। তবু সোজা লম্বা রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ মোটরযাত্রায় অতিপরিচিত পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতির একটা সুস্বাদু আশ্বাস ছিল। হাওয়ায় যেন অতটা বিষাক্ত ধোঁয়া ছিল না। আবার যেন বীরেনের নিশ্বাস নিতে ইচ্ছা করছিল। বীরেন বুঝতে পারল সে কলকাতার বাইরে। চিনতে পারল বরানগরের রাস্তা।

ও হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে, সে তার মা-বাবার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল। অনেক, অনেক দিন যাওয়া হয়নি ওদের কাছে। অনেক বার বীরেন ভেবেছে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, ড্রাইভারকে পর্যন্ত তৈরী হতে বলেছে, তবু যাওয়া হয়নি। আগে সুরমা সঙ্গে যেতো, সুরমাই তাড়া দিতো মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে, বীরেনকে প্রায় বলতেই হোতো না বরানগর যাবার কথা। কিন্তু সুরমা এখন—এখন, বীরেন এই ভাবনাটার শেষ পর্যন্ত পেঁাছোতে চাইল না। ভালো কি মন্দ বীরেন বলবে না, কে এর জন্যে দায়ী তার অপরাধবণ্টনও স্থগিত থাক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে সুরমার এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে বরানগর যাবার কথা এখন সে কখনো তোলে না। যেন বরানগর বলে কোনো জায়গাই নেই পৃথিবীতে। যেন থাকলেও সেখানে যাবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। বরানগর যদি, বার্সেলোনা নয় কেন?

দূরে একটা বাস্ আসছিল, বীরেন তার ড্রাইভারকে বলল ওই বাসে ফিরে যেতে। গাড়ি সে নিজেই চালাবে। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে এত সমারোহের কী প্রয়োজন? তার মনে পড়ল যে ইস্কুলে থাকতে

সে কখনো জুতো-পায়ে পরীক্ষা দিতে যায়নি। ইস্কুল তখন ছিল সরস্বতীর মন্দির। পবিত্র। আজ বীরেনের সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে, লক্ষ্মীর পায়েও সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি। লক্ষ্মী কেন, সব দেবতার সঙ্গেই তার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ মানুষের সঙ্গেও আত্মীয়তা তার দৃঢ় হোলো না! স্ত্রী—না, সুরমার কথা সে কিছু বলবে না, নিজের কাছেও না। কিন্তু মা-বাবা, ভাই-বোন, সবাই যেন দূরে সরে গেছে। এই দূরত্বকে হ্রস্ব করবার উপায় নেই, কেননা এ যে সকলের অজান্তে, অলক্ষ্যে ঘটেছে। কখন যে ঘটেছে তাও কেউ জানেনি, যতক্ষণ না একে অপরের কাছে এসেছে। তখন জেনেছে যে বীরেন আর তার আই-সি-এস-পূর্ব পরিবেশের প্রতিটি অন্তরঙ্গ আত্মীয় একই সমতলে বিচরণ করেও অন্য পর্যায়ের লোক। স্তরপ্রভেদ যেখানে ঘটেনি—যেমন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে—সেখানেও সমান দূরত্ব রচিত হয়েছে। সেখানেও বীরেন একা। এই একাকিত্বের স্পষ্ট কারণ যেমন নেই, তেমনি স্পষ্ট প্রকাশও নেই। তবু, বাইরের লোক তো অন্ধ নয়। তারাও লক্ষ্য করে বৈষম্যটা। সব থেকে প্রথমে জানতে পারে সড্রাইভার ভৃত্যকুল। বীরেন তাই ড্রাইভারকে যেতে দিল।

বরানগরের বাড়িতে পদার্পণ করা মাত্র বীরেনের মনে হোলো সে যেন স্বল্পজ্ঞাত স্বল্পতরাধ্যুষিত কোনো বিদেশে এসেছে। দরজায় কড়া ছিল না, তাই কড়া নাড়বার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দরজা পেরিয়ে উঠোনে পা দিতেই সে বুঝতে পারল যে কোথায় কী যেন নেই। শূন্য অঙ্গনটি যেন পূর্ণ গৃহের অভ্যর্থনাব্যকুল প্রসারিত বক্ষতল নয়, সে যেন অতিথি-বিমুখ বাসস্থানের পরিব্যাপ্ত নিষেধাজ্ঞা। বীরেন নিঃশব্দচরণে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে প্রথমে সাক্ষাৎ পেল পুরানো ভৃত্যের। নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেল। কে জানে কী শুনবে! এমনিতেই তার কানে কত যে অস্পষ্ট গুঞ্জন—ভুলে যাওয়া সুর, আগে না শোনা কথা—মুখর হয়ে উঠেছিল তার ঠিক নেই। বীরেন কান ছেড়ে চোখের শরণ নিল। শহরের বাইরের অন্ধকার, বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল এরই মধ্যে। তাই বিশেষ কিছু দেখতে পেল না বীরেন। তিনটে ঘরের মধ্যে একটা

ঘরে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। দৃষ্টিকে সাহায্য করবার জন্যে নয়। অমনি। অল্প দেখা ও অল্প শোনা কল্পনার সহায়, স্মৃতির দোসর। বীরেনের শৈশবে দেখা একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একবার তাকে কে যেন বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যাঞ্চলে। বীরেনকে আরো বেশি ভয় দেখাবার জন্যে তাকে অনেক অনেক বাঘের গল্প, সাপের গল্প আর ভূতের গল্প বলা হয়েছিল। ভয় সে পায়নি। চিড়িয়াখানায় সে এসব জন্তুদের এমন শান্ত রূপ দেখেছিল যে এরা যে ভয়ংকর হতে পারে একথা সে পুরোপুরি কখনোই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সারা গায়ে একটা অস্বস্তি সে অনুভব করেছিল যখন তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে পেঁছিছিল। বাড়িটার ছাদ ছিল না। কয়েকটা পরাস্ত কিন্তু উদ্ধত দেয়াল শুধু কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল। বীরেনের বয়োজ্যেষ্ঠ পথপ্রদর্শক দেয়ালগুলির দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলেছিলেন, 'এখানে একদিন বর্ধিষ্ণু একটা গ্রাম ছিল, মানুষ ছিল। আর আজ!'

বীরেনের মনে আছে, সেখানেও, সেই ভগ্নস্তূপেও একটা প্রদীপ জ্বলছিল। বীরেন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এজঙ্গলের মধ্যে প্রদীপ কে রেখে গেছে?'

বীরেনের সঙ্গী বলেছিল, 'মানুষ।'

উত্তরটা বীরেন বোঝেনি। মানুষ নয়তো কে আবার আলো জ্বালবে? কিন্তু কোন মানুষ? কে সে? বড়ো হয়ে বীরেন কৌতূহল দমন করতে শিখে সভ্য হয়েছে। কিন্তু তখন সে স্পষ্টই প্রকাশ করেছিল তার জিজ্ঞাসা।

সাথী বলেছিল, 'ওই যে বললুম, মানুষ। পৃথিবীটা হচ্ছে বৃহৎ একটা অরণ্যের সাম্রাজ্য। এই জঙ্গলের ইচ্ছে পৃথিবীর গোটা পৃষ্ঠদেশে সে অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করবে। মানুষ সেই রাজত্ব নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যান্য জানোয়ারের মতো অসহায়ভাবে বাস করবে। কিন্তু মানুষ শুনল না। সে জঙ্গল কেটে গ্রাম তৈরী করল, গ্রাম

সংস্কার করে নগর। গাছের তলায় না থেকে সে বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরী করল—ওই যে, যার ভগ্নাবশেষ এখনো দেখছি আমাদের সামনে। জঙ্গল হেরে গেল, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র প্রতিহিংসা নিতে ভুলল না। তাই সে ওই বিরাট বাড়িটা দেখ্ কী রকম ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু কি এই গ্রাম, এই শহর? অরণ্যের ক্ষুধার শেষ নেই, সাগরের তৃষ্ণার শান্তি নেই। মানুষ যা কিছু করেছে, তা এই জল-জঙ্গলকে অমান্য করে, এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু এরাও ছাড়বার পাত্র নয়। শুধু অপেক্ষা করে আছে। মানুষ একটু বিশ্রাম করবে, হাতের লাঠি রেখে পা ছড়িয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিতে যাবে, আর অমনি এই বুভুক্ষু অরণ্য আর তৃষার্ত সমুদ্র একটু একটু করে এগিয়ে মানুষকে গিলে ফেলবে।'

বীরেন ভেবেছিল এটাও ভয়-দেখানো গল্প। বলেছিল, 'যাঃ। জঙ্গল বুঝি অত সব বোঝে? সাগর বুঝি ভাবতে পারে?'

'হ্যাঁ রে। এক দিন দেখবি তোদের কলকাতাও জঙ্গলের কবলে হারিয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে বীরেন আর তার সব বন্ধুরাও জঙ্গলের পেটে!"

বীরেনের এবার আর সন্দেহ রইল না যে ওটা সত্যি একেবারে বানানো গল্প। কিন্তু প্রদীপের প্রশ্নটা তার মনে জ্বলতেই থাকল। আবার জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গী বলেছিল, 'বললুম তো, ওই দীপ মানুষ জ্বালিয়ে রেখে গেছে জঙ্গলকে জানিয়ে দিতে যে সে হার স্বীকার করবে না কিছুতেই। বলতে, তুমি যতবার ভাঙবে আমি তার একবার বেশি গড়ব। আমি মানুষ।'

এমন সময় হাওয়ায় প্রদীপের শিখাটা কেঁপে উঠেছিল। বীরেন সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেদিকে। সঙ্গী হেসে বলেছিল, 'ও হাওয়া নয়। প্রকৃতির হাসি। মানুষের ঔদ্ধত্যে হাসছে। বলছে, তুমি জানো না তুমি কী অসহায় আমাদের হাতে। একবার আমরা জোরে নিশ্বাস নিলে তোমরা উড়ে যাও, তাকে বলো ঝড় না টাইফুন না হারিকেন। একবার একটু থুথু ফেললে বলো বন্যা, ভেসে যাও হাজারে হাজারে। একবার যদি খাবারে একটা বীজাণু মিশিয়ে দিই তো তাকে

বলো মড়ক, খবরের কাগজের পয়লা পাতায় ভয়ে ভয়ে সেখবর ছাপো। তোমার আবার অত বীরত্ব! হেসে বাঁচিনে!'

বীরেন তখনো তার প্রশ্নের উত্তর পায়নি। আবার জিজ্ঞাসা করবার আগেই সঙ্গী বলেছিল, 'কী জানিস বীরেন, ওই পোড়ো বাড়ি দেখে ভয় পাবিনে। হাঁ-করা, পাঁজর-বেরকরা, খিঁচোনো-দাঁত ওই বাড়িটা চেষ্টা করবে তোকে ভয় দেখাতে। বলবে, কাজ কী বাড়ি বানিয়ে, যদি এই তার শেষ হয়? কিন্তু ওটা বাজে কথা। তুই তাকিয়ে থাক ওই প্রদীপটার দিকে। মানুষ কাঁপবে—সে তো জড় নয়; কিন্তু সে নিভবে না—সে যে মানুষ!' বীরেনের মনে আছে, তার বুক ফুলে উঠেছিল ওই প্রদীপ দেখে।

বীরেন তখনো আলোটার দিকে তাকিয়েছিল। তার চতুর্দিকে গা রী রী করা জঙ্গল ছিল না। বাড়িটাও ছিল অক্ষত। কিন্তু, তবু, বীরেন যেন ভয় পেল। মনে হোলো, তার ছেলেবেলার সঙ্গী সেই জঙ্গলপ্রদর্শক একটা কথা বলেনি। মানুষের পরাজয়ের জন্যে বাইরে থেকে জোরালো আঘাত আসবার প্রয়োজন নেই। তার নিজেরই মধ্যে ক্ষয় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সভ্যতার সৃষ্টির মধ্যে সেই সভ্যতার ধ্বংসেরও বীজ লুকানো। জয়ের মধ্যে পরাজয়ের বাসা। স্বাস্থ্যের মধ্যে পীড়ার, সুখের মধ্যে দুঃখের, জীবনের মধ্যে মৃত্যুর। বীরেন যখন ছোটো ছিল তখন সে অন্যের কথায় ভাঙা বাড়ি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে আশা পেয়েছিল। আজ সে পুরো ছবিটা না দেখে তার আলোকিত অংশটুকুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিজেকে ভোলাতে পারে না। আলো অল্প, অন্ধকার বিরাট। অট্টালিকা ক্ষুদ্র, অরণ্য অন্তহীন। নৌকা অসহায়, সমুদ্র উত্তাল।

বীরেন বাড়িটার দিকে তাকাল উঠোনে বসে। ভাঙা বাড়ি নয়। তাই দেখেই সন্দেহ হয় না যে কিছু একটা নেই এর ভিতরে। পরম তৃপ্তিতে কাল কাটে। কিন্তু—কিন্তু, বীরেনের চোখে ওই চিড়টা এড়ায় না। এখনো পর্যন্ত একটা ইঁটের উপর আরেকটা ইঁট অটুট থেকে চোখের

ভ্রান্তি সৃষ্টি করছে যে সব ঠিক আছে, কিন্তু ও দুটোর মাঝে যে জোড়া-লাগানো সিমেণ্ট নেই সেটা চোখে পড়ছে না। ভিৎটা নীচু হয়ে গেছে, বেশ কয়েক ইঞ্চি মাটির তলায় চলে গেছে। কিন্তু একটু হাওয়া—ওই যে সঙ্গী বলেছিল,—প্রকৃতি দানবীর একটি মৃদু শ্বাস, আর সব ধ্বসে পড়বে! ঝড় চাইনে, ভূমিকম্পের দরকার নেই। এমনি, আস্তে আস্তে, নিজে নিজে পড়ে যাবে। শুকনো ডালের মতো।

চাকর ইতিমধ্যে চা করে এনেছিল, "একটু চা।" গৃহস্বামীর অবর্তমানে যেমন সে অন্যান্য অতিথিদের দিয়ে থাকে। বীরেন অতিথি নয় তো কী এবাড়িতে?

কত দিন আসা হয়নি এবাড়িতে। শেষ আসা আর আজকের আসার মধ্যে যে দীর্ঘ ছেদ গেছে এর মধ্যে বীরেন স্মৃতি দিয়ে সেতুবন্ধন করল, কিন্তু পার হতে পারল না। পুরানো বাড়িটা অপরিচিত বলে মনে হোলো। পুরানো চাকরকে অচেনা বলে। তবু চেষ্টিত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "সুরেন কোথায় গেছে রে?"

"ছোটোবাবু তো অনেক দিন নেই এখানে। এখন কোথায় জানিনে। মা-ও বোধহয় জানেন না। ওই যেদিন বেলঘরিয়ার বীরেশ্বরবাবুদের বাড়ি ডাকাত পড়ল,—সেদিন ভোরের দিকে এসেছিলেন। ভোর না হতেই আবার চলে গেছেন। মার সঙ্গে দেখাও করেননি। শুধু জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে ঠেলে তুলে একটা বাক্স আমায় দিয়ে বললেন, চুপ, কথা বলিসনে। এটা মাকে দিস সকালে।"

বীরেন মনে মনে অন্ধকারকে ধন্যবাদ দিল। যে মুখ সে দেখাতে পারতো না তা কেউ দেখতে পেল না। সুরেন বরাবরই একটু দুরন্ত ছিল, কিন্তু তাই বলে—? যদি—

পুরানো চাকর তো শুধু চাকর নয়, বাড়ির একজন, হিতৈষী, অভিভাবক। বীরেনও তাই ধমক দিতে পারল না। সে বলে চলল, "অবিশ্যি ছোটোবাবুকেই বা দোষ দিই কী করে বলো বাবু? এখানে ওখানে কম জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেছে? কোথাও নাকি খালি নেই। সব জায়গায় নাকি ছাঁটাই হচ্ছে। অথচ রোজই শুনি অমুক বাবুর ভাইয়ের সায়েব কোম্পানিতে চাকরি হয়েছে, অমুক বাড়ির কর্তার

ভাগ্নের সরকারী চাকরি হয়েছে। তা তুমি যাই বলো বাবু, আজকাল একটু বলে কয়ে না দিলে হয় না। তুমিও কিছু করলে না, ভাইয়ের জন্যে তদ্বির করলে না, আর অমন ছেলেটা বি. এ. পাশ করে বয়ে গেল!”

বীরেনকে এই কথাগুলি বলবার দরকার ছিল না। তার নিজেরও মনে ছিল। সত্যি সে ভাইয়ের চাকরির জন্যে কারো কাছে সুপারিশ করতে অস্বীকার করেছিল। আর সবাই যা খুশি করুক আজকালের রেওয়াজের দোহাই দিয়ে, বীরেন যা অন্যায় বলে জানে তা কিছুতেই করবে না। শুধু নিজে অন্যায় করবে না, অন্যায় সে সহ্যও করবে না। কিন্তু এই নৈতিক উষ্মার অন্তরালে একটা ঠাণ্ডা ভয় তার মনের মধ্যে জমে উঠছিল। যদি?—

যদি সুরেন এক দিন ধরা পড়ে যায়? তখন? সে বীরেনের ভাই, একথাটা কে না জানবে? বীরেন মনে মনে প্রার্থনা করল ডাকাত সুরেন যাতে ধরা না পড়ে। ভগবান, আমাকে এই কলঙ্ক থেকে তোমাকে বাঁচাতেই হবে।

ভগবান? তাকে তো বীরেন জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু *Naturam expellas furca, tamen usquet recurret.* তবে, এ কি তার দুর্বল প্রকৃতি যা আবার তার মনকে গ্রাস করতে চাইছে—ওই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের মতো—না কি—? বীরেন অত্যন্ত অনিশ্চিত বোধ করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। আকাশের চাইতে পাতালের কথাটাই বেশি করে।

হঠাৎ খড়মের শব্দ শুনে বীরেনের চমক লাগল। অনেক দিন শোনেনি এই বিশ্রী শব্দটা। ছেলেবেলায় ওটা ছিল বাবার আসবার হুঁসিয়ারি, গল্পের বই সরিয়ে রেখে পড়ার বই সামনে নেবার সংকেত-ধ্বনি। আজো যেন একটু ভয় পেল বীরেন শব্দটা শুনে। আজ তো কিছু লুকোবার নেই।—নেই? বীরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নগেনবাবুর পায়ে খড়ম ছিল। গায়ে কিছু ছিল না। কানে পৈতে ছিল। একবার তিনি বীরেনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটুও

খুশি হলেন বলে মনে হোলো না। নিতান্ত লৌকিক স্বরে বললেন, "হঠাৎ বীরেন যে? কী মনে করে? বসো, আমি আসছি।" তার পর আপন কাজে স্নানের ঘরে প্রবেশ করলেন। যেন তাড়া করবার কিছু নেই। যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করবারও নেই। যেন নিজের বড়ো ছেলে আসেনি। যেন কোনো অনাহূত পরিচিতি। বীরেনের উত্তরের প্রতীক্ষা পর্যন্ত করলেন না নগেনবাবু। বীরেন আহত হোলো, কিন্তু কাউকে দোষ দিল না। সত্যি তো, সে নিজেই আসেনি, এত দিন। কোনো খোঁজ নেয়নি। তাছাড়া এবাড়িতে টেলিফোনও নেই, যে মাঝে মাঝে না এসেও খবর নেয়া যাবে।

নগেনবাবু একটুও সময়সংক্ষেপ না করে তাঁর নাতিহ্রস্ব প্রক্ষালনপর্ব সমাপন করে ফিরে এসে বললেন, "বৌমা কেমন আছে?"

"ও ভালো আছে।"

"তোমার নিজের শরীর তো খুব ভালো দেখাচ্ছে না?" নগেনবাবু যেন তাঁর কোনো প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছেন। ইস্কুল মাস্টারদের স্বভাবই নিজেদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ইস্কুলের অন্যান্য ছাত্রের মতো দেখা। বীরেন এতে অল্পবিস্তর অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন যেন আরো একটা কোনো পরিবর্তন সে লক্ষ্য করল। বহুবার ভাবতে চেষ্টা করল যে পরিবর্তন তার নিজের হয়েছে, বাবার নয়; কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারল না। বাবাকে সে বরাবর মনে করে এসেছে অতি-প্রাচীন কোনো বটবৃক্ষের মতো; বিস্তার আছে, বিনাশ নেই। কোনো কালজয়ী মন্দিরের মতো; মানুষের তৈরী, কিন্তু মানুষের নয়। বাবারও যে বদল হতে পারে এমন সম্ভাবনা তার মনেই আসেনি। কিন্তু এখন, বীরেন কিছুতেই মনস্থির করতে পারল না, পরিবর্তন তার নিজের হয়েছে না আর সকলের। আর সব মানুষকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা রক্তমাংসের তৈরী। কিন্তু বীরেন তার বাবাকে মনে করতো ভাস্কর্যের সেই বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলির মতো; পাথরের তৈরী, কিন্তু মাংসের চেয়ে জীবন্ত। দীর্ঘ আত্মজিজ্ঞাসা সত্ত্বেও বীরেন এখন তার বাবার দিকে তাকিয়ে তার পূর্বতন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়ে পারল না। বীরেনের নিজের পরিবর্তন হোক বা না হোক, বীরেনের

সন্দেহ রইল না যে তার বাবা আর আগেকার পরিচিত ব্যক্তিটি ন'ন। নগেনবাবু আজো শিক্ষক, কিন্তু অন্য মানুষ।

বীরেন তার স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রশ্নটার তাই উত্তর দিল না। সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না যে তার বাবার সত্যি কৌতূহল ছিল জানবার। সত্যি ছিল না। নগেনবাবু বললেন, "ননীটা আজকাল বড়ো বেশি বাচাল হয়ে উঠছে। যাকে তাকে সব সময় সব কথা না বলে ওর শান্তি নেই। ওকে ছাড়িয়ে দেব ভাবছি।"

বীরেন একটু আগে ননীর উপর রাগ করেছিল। কিন্তু এখন বলল, "এত দিনের লোক—"

"তা বটে। কিন্তু অতীতের সঙ্গে আর সব সম্পর্ক যখন ঘুচে গেছে তখন এই অপ্রিয় যোগসূত্রটা জীইয়ে রাখবার সার্থকতা দেখিনে। ও বড়ো বেশি বকে, তা নইলে বলতুম ও যেন আমাদের বর্তমানের নীরব তিরস্কার। এই তিরস্কারে কর্ণপাত করবার আমার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। কিন্তু সে পরে দেখা যাবে। কী বলছিল তোকে ও?"

"বিশেষ কিছু নয়। এই—"

"বিমলার কথা বুঝি?"

বিমলার? তার আবার কী হয়েছে? সুরেনের কথা শোনবার পরে বীরেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। শুধু বলল, "কই, বিমলার কথা কিছু বলেনি তো।" কিন্তু একটু পরে আর জিজ্ঞাসা না করে পারল না। বলল, "কী হয়েছে বিমলার?"

"বিশেষ কিছু নয়। ইস্কুল-মাস্টারি ছেড়ে দিয়েছে। আমিই বলেছিলুম।" এমনভাবে নগেনবাবু কথাগুলি বললেন যেন সত্যি বিশেষ কিছু নয়। বীরেন সমপরিমাণে বিস্মিত ও আহত হয়ে বলল, "হঠাৎ ছেড়ে দিল, এত দিনের চেষ্টার পরে—"

"পণ্ডশ্রম।"

নগেনবাবু অল্প কথার মানুষ। এই একশব্দ উত্তরই যথেষ্ট হোতো, কিন্তু আজ তিনি নিজেও বুঝলেন যে আরো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

তিনি নিজে শিক্ষকতাকে কখনো কেরানীগিরি বা অন্য কিছুর মতো একটা পেশা মাত্র মনে করেননি। ওটা ছিল সাধনা, ছিল ব্রত। মাইনেতে ওর পরিমাপ নেই, পূজার সার্থকতা যেমন পুরস্কারে আবদ্ধ নয়। বীরেনের মনে আছে একবার তিনি কী রূঢ়ভাবে রীতিমতো ভালো মাইনের একটা চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তাঁর বাসনা ছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাকেও তাঁর নিজের মতো শিক্ষায় নিয়োগ করবেন। বলতেন, একটি ছাত্র তৈরী করা মানে একটি ছাত্র তৈরী করা, আর একটি শিক্ষক তৈরী করা মানে পাঁচ জন, দশ জন, এক শ জন মানুষ তৈরী করা। বিমলা মা হয়ে আর সব মেয়েদের মতো কতগুলি অমানুষ সৃষ্টি করবে না, শিক্ষয়িত্রী হয়ে জনকয় মানুষ গড়বে।

নগেনবাবু বলতেন, কতগুলি গাছ আছে যারা ফলেন পরিচীয়তে নয়। জ্ঞানবৃক্ষ সেই শ্রেণীর বৃক্ষ। এই গাছের তলায় বসে যে সাধনা তার উৎস কোনো উদ্দেশ্য নয়। বলতেন, সভ্যতার অর্থই হচ্ছে এই যে কয়েকজন লোক পুরস্কারের কথা বিস্মৃত হয়ে, অন্তত উপেক্ষা করে, এমন কতগুলি কাজ করবে যার আশু কোনো ব্যবহারিক সার্থকতা নেই। ওই কাজগুলির সার্থকতা কাজগুলির মধ্যেই নিহিত। বাইরের বিচার অপ্রাসঙ্গিক। বীরেন তার সদ্যপঠিত নন্দননীতির উল্লেখ করতে পারার আগেই নগেনবাবু বলেছিলেন, 'না, আর্টের আত্মসর্বস্ব স্বসার্থকতার সঙ্গে এর তুলনা করব না। আর্ট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় অসামাজিক, নৈরাজ্যবাদী ও উচ্ছৃংখল। সমাজের নেতৃত্ব আর্টিস্টদের হাতে ছেড়ে দিলে সমূহ বিনাশ। আমি লেখক-শিল্পীদের একটু অবিশ্বাসই করি। আমার সমাজগঠনের কাজে ওরা কখনো বাধা, কখনোই সহায় নয়। সর্বদা অনির্ভরযোগ্য। কবি তাঁর মাটির তৈরী 'শ্যামলী'তে বাস করুন, সর্দি হলে 'উদয়নে' উঠে যান, কিন্তু সমাজের ভিত্তি কাদা দিয়ে গড়লে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমাজের জন্যে চাই স্থির, দৃঢ়মূল, প্রস্তরের ভিৎ। ব্যক্তির বাড়ির প্যাটার্ন বাংলো হলে ক্ষতি নেই, 'উদয়ন'-এর মতো সেখানে যখন যেঘর দরকার তোলা হোক খেয়াল মতো; কিন্তু সমাজের চাই টাউন হল, তার গাঁথুনি পাকা হওয়া চাই, তার উন্নত-শিরে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে দীর্ঘ ও দৃঢ় স্তম্ভ চাই।

স্তম্ভ, আয়নিক কলম্—নগেনবাবুর তারই সঙ্গে তুলনা চলত। নগেন্দ্রবাবুর চরিত্র ও আকৃতি এরই কথা বীরেনকে স্মরণ করিয়ে দিতো। বীরেনের মনে আছে, সাহিত্যের কথা উঠলে নগেনবাবু—যদিও তিনি ছিলেন গণিতের শিক্ষক—রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু কোথায় যেন সংশয় ছিল তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অস্বীকার না করেও তিনি বলতেন, ভবিষ্যৎ সাহিত্য ও সমাজের উপর তাঁর প্রভাব শুভ হবে না। সমাজের দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন তাঁর আদর্শ। আকাশচুম্বী কল্পনা ছিল না তাঁর, কিন্তু দেশের মৃত্তিকায় তাঁর মূল ছিল। তিনি মেঘ ছিলেন না, যা হাওয়ায় উড়ে যায়। তিনি ছিলেন বিশাল মহীরুহ, ঝড়েও অনড়। তিনি আলো ছিলেন, আলেয়া নয়। শুকতারা নয়, ধ্রুবতারা।

বীরেন মানতো না, কিন্তু পিতাকে শ্রদ্ধা না করে পারতো না। সেই সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রকেও, যদিও সে নিজে পুরোপুরি রবীন্দ্রযুগের সন্তান। উন্নতশির, দণ্ডায়মান পিতার দিকে তাকিয়ে বীরেন তাঁর কঠিন মেরুদণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারতো না। প্রায়ই ভাবতো, এই দৃঢ়তার সঙ্গে একটু স্নিগ্ধতা, এই পৌরুষের সঙ্গে একটু লালিত্য,—এমন সংযোগ কি একেবারেই অসম্ভব? কঠিনকেই কি অকরুণ হতে হবে? দয়া কি সব সময়ই দুর্বলতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য? স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামই কি উচ্ছৃংখলতা?

প্রশ্নগুলি একবার সে পিতৃসকাশে নিবেদন করেছিল ভয়ে ভয়ে। নগেন্দ্রনাথ নিঃসংকোচে উত্তর দিয়েছিলেন—হ্যাঁ, অবশ্যম্ভাবী। অমন সমন্বয় ব্যক্তিজীবনে কখনো কখনো সম্ভব হলেও সমাজজীবনে অসম্ভব। ইতিহাস পড়ে দেখবে সভ্যতার কোন স্তরে আর্টের কোন শাখা উৎকর্ষ লাভ করেছে। দেখবে সভ্যতার অগ্রগতির যুগে, যখন সে সব কিছু জয় করতে উদ্যত, তখন উৎকর্ষ ঘটে স্থাপত্যের। এই শিল্পের স্রষ্টাও গোষ্ঠী, উপভোক্তাও গোষ্ঠী। সংহত সমাজচিত্ত যখন সব চেয়ে সচেতন তখন সমাজ মন্দির গড়ে, ফোরাম গড়ে, টাউন হল গড়ে। একটি ছবি বা কবিতা হচ্ছে একজন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশঃ একটা নাগরিক সৌধ হচ্ছে

সমগ্র সমাজের আত্মপ্রকাশ। তারপর আমাদের সংহতি যখন ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, যখন সমাজকল্যাণের চাইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আনন্দবেদনা প্রাধান্য লাভ করে, তখন স্থাপত্য আর ভাস্কর্য স্থান ছেড়ে দেয় প্লাস্টিক আর্টসের কাছে। আরো পরে, সমাজ আরো অসংলগ্ন হলে, আরো ডিস্‌ইণ্টিগ্রেটেড হলে, তখন ললিতকলার প্রকোপ ঘটে। ললিতকলা ঠিক নয়, জার্মান কথাটা হচ্ছে *malerisch,* রবীন্দ্রনাথ সেই মালেরিশের সর্বোচ্চ শিখর। বাঙলা ছোটো গল্প আর গীতিকবিতার উন্নতি সত্ত্বেও তাই ভয় পাই।

বীরেনের মনে আছে এই আলোচনাপ্রসঙ্গেই নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সেদিন শুনলুম শান্তিনিকেতনে রথীবাবু নাকি একটা লতানে আমগাছ করেছেন। আমগাছ—যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশকে ভয় দেখাবে, অন্যান্য দুর্বল লতাকে আশ্রয় দেবে, মানুষকে ছায়া দেবে—সেই গাছকে পর্যন্ত ওদের লতিয়ে না দিয়ে শান্তি নেই। না, আমি কলারসিক বলে পরিচিত হতে চাইনে। আমার আদর্শ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র। ওঁরা পুরুষ। সংস্কারক, কর্মবীর। হোন তাঁরা লালিত্যশূন্য। তাঁরা আনন্দবেদনা নিয়ে কালক্ষেপ করেননি, কঠোর কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছেন। সেইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সমাজের কল্যাণ ওই পথে। নগেন্দ্রনাথ শেষ কথাটা বলেছিলেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। সেই ঋজু নগেন্দ্রনাথের সামনে শুধু মাত্র বীরেনের নয়, আর সকলেরও শির সহজে শ্রদ্ধানত হোতো।

আজ বীরেন আবার তার বাবার দিকে তাকাল। চেনাই যায় না। বিশ্বাস করা যায় না যে এই একই ব্যক্তি একদিন সমস্ত জনপ্রিয় মতের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চরিত্রবলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। মনেই হয় না যে ইনিই এক দিন সংসারের সমস্ত প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে শিক্ষকজীবনের দারিদ্র্য সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন। সুরেন রেশমী জামা চাইলে নগেনবাবু জামার বদলে মার দিতেন। বিমলা না-চাইতেই শিখেছিল। বীরেনের মার মনের কথা কেউ জানে না। তিনি সবাইকে সেবা করেন যা আছে তাই দিয়ে। যা নেই তা নিয়ে বিলাপ করেন না, অন্তত প্রকাশ্যে নয়। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত চাটুজ্যে পরিবারটিতে প্রাচুর্য

ছিল না কখনোই, কিন্তু অনটনও ছিল না, কেননা বিলাসের অপূরণীয় ক্ষুধা ছিল না।

আদর্শ-গর্বিত নগেন্দ্রনাথকে কেউ তাঁর দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তৃপ্ত হাস্যে পারস্যের ফকিরের গল্প শোনাতেন। শাহ্ যাবার কালে ফকির নাকি পা ছড়িয়ে বসেছিল পথের পাশে, উঠে দাঁড়ায়নি, সেলাম করেনি। স্তম্ভিত নগরপাল এসে বলল, কীরে, শাহ্ গেলেন দেখতে পাসনি? উঠে সেলাম করলিনে যে বড়ো? ফকির বললে, দূর বোকা, এক শাহ্ বুঝি আরেক শাহ্কে সেলাম করে? আমিও তো শাহ্! ক্রুদ্ধ হলেও নগরপাল না হেসে পারল না, শাহ্? পাগল বলে কী? শাহ্ যদি তোর সৈন্য কোথায়? ফকির বললে, সৈন্য দিয়ে কী হবে? আমার শত্রু কোথায়? নগরপাল না দ'মে বললে, শাহ্ যদি তোর অর্থ কোথায়? ফকির আবার হেসে বললে, টাকা? টাকা দিয়ে কী হবে? আমার অভাব কিসের? নগরপালের আর কথা জোগায় না।

নগেন্দ্রনাথ এই গল্প বলে চলে যেতেন, আর আলোচনা করতেন না। ঘণ্টা বেজে গেছে, কমনরুম থেকে ক্লাসরুমে চলে যেতেন। নিকটায়মান চটির শব্দ শুনে ক্লাসের ছেলেরা ঠিক হয়ে বসতো, বলতো, যম আসছে। দূরায়মান চটির শব্দ শুনে অন্যান্য শিক্ষকরা বলতো, একটা যুগ যাচ্ছে।

সেই লোক আজ বলছেন, শিক্ষকতা পণ্ডশ্রম! বীরেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। নগেনবাবু দৃশ্যতই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জামা পরছিলেন। নিশ্চয়ই বেরুবেন কোনো বিশেষ কাজে। জামাটা পরবার সময় মুখ যখন ঢাকা পড়ল সেই সুযোগে নগেনবাবু আবার বললেন, "পণ্ডশ্রম নয়তো কী? যে সমাজে শিক্ষয়িত্রীর মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা আর সিনেমা অভিনেত্রীর রোজগার পঁয়তাল্লিশ হাজার, ডাক্তারের মাইনে তিন শো টাকা আর দালালের আয় তিন হাজার, এই যে সমাজের ভ্যাল্যুজ্, তখন সেখানে আমার নিজের জীবন নিয়ে আগে

আমি যে ভুলই করে থাকি, বিমলার জীবন অমন ব্যর্থ হতে দেবার আমার কী অধিকার আছে?”

পরিচিত যুক্তি। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত মুখ থেকে শুনে বীরেনের ভালো লাগল না। বীরেন তার বাবারই আগেকার সহস্র উক্তি উদ্ধৃত করে প্রতিবাদ জানাতে পারতো, কিন্তু উৎসাহ ছিল না। চুপ করে রইল। নগেন্দ্রনাথ বীরেনের নিঃশব্দ অনুমোদনে আরো বেশি অস্বস্তি বোধ করে আত্মসমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রায় আপন মনে বললেন, “প্রত্যেক মানুষকে জীবনে একটা সময়ে ঠিক করে ফেলতে হয়! নিজের জন্যে বাঁচব? না কি পরের জন্যে বাঁচব? আই মেড দি রং চয়েস্। আমি ভেবেছিলুম পরের জন্যে বাঁচব। ভেবেছিলুম টাকা করব না, সেবা করব। ভুল করেছিলুম।”

বীরেন তবু চুপ করে রইল। প্রথম কারণ আহত বিস্ময়। দ্বিতীয়, সে নিজে আত্মোন্নতির পথ বেছে নিয়েছে। কিছু দিন আগেও সে হয়তো বলতো, চাকরি আর সেবা পরস্পরবিরোধী নয়, দু'টোতে সহজ সমন্বয় সম্ভব। বলতো, বস্তুত চাকরি মানেই সেবা, চাকরি মানেই সমাজের জন্যে এমন কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করে দেয়া যার জন্যে সমাজ মূল্য দিতে প্রস্তুত। একান্ত সন্তোষজনক সংজ্ঞা। কিন্তু বীরেন আজ আর এটাতে বিশ্বাস করে না। দেশসেবা যে হীন পেশায় পরিণত হয়েছে এ-তো সে স্বচক্ষে দেখছে প্রতিদিন। কাজে সে ফাঁকি দেয় না; কিন্তু ফাইলে কিছু লেখা যে সেবা, এই ফাঁকিতে সে আর বিশ্বাস করে না। সদানন্দের প্রস্তাবিত পদোন্নতিতে তাই বীরেন পুলকিত হয়নি, শংকিত হয়েছে। এই কথাটা আলোচনা করতেই বীরেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ভেবেছিল বাবা অন্তত তাকে সাহস জোগাবেন অনর্জিত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবার। নগেন্দ্রনাথের একটু আগেকার কথার ধারা শুনে বীরেন নিশ্চিন্ত বোধ করছিল না যে সে প্রত্যাশিত উপদেশ পাবে। তবু বাবাকে বলল। পদোন্নতিতে নিজের অনুৎসাহও গোপন করল না।

নগেন্দ্রনাথ শুনেই বললেন, “কেন নিবিনে?”

বীরেন স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে বলল, *"Timeo Danaos et dona ferentis.* সদানন্দ দয়ানন্দ হলে আমি ভয় পাই।"

"কেন, সদানন্দের কী অভিসন্ধি থাকতে পারে? সে তোমাকে নিতে চাইছে যাতে তার কাজ ভালো হয় সেইজন্যে।"

বীরেনের একবার সুরমার কথা মনে পড়ল এই প্রসঙ্গে। কিন্তু সজোরে মন থেকে এই কুৎসিত ভাবনাটা সরিয়ে দিল। শুধু বলল, "সদানন্দ ভালো লোক নয়।"

"ভালো লোক কে? তাছাড়া, ভালোমন্দ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ?"

ভালোমন্দ ব্যক্তিগত ব্যাপার? অর্থাৎ ভালোমন্দ জামাকাপড়ের মতো—যার যার মাপে তৈরী হবে, যার যখন খুশি খুলে রাখবে আর পরবে? নগেন্দ্রনাথ বলছেন এই কথা? বীরেন তর্ক করতে চাইল না, অসহায় শিশুর মতো বলল, "কিন্তু বাবা, আমি যে কেবলি একটু একটু করে ওদের ষড়যন্ত্রে আরো বেশি জড়িয়ে পড়ছি। ক্রমে ওদের স্বার্থ আমার স্বার্থ এক হয়ে যাচ্ছে। ওদের অন্যায়ে অংশীদার হয়ে ডিভিডেন্ড পাবো, বোনাস শেয়ার পাবো, তখন তো আরো নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারব না!"

"ছাড়াবার দরকার দেখিনে। অর্থাৎ, ওই যে বলছিলে, যদি ডিভি-ডেন্ড দেয়।"

"ডিভিডেন্ড দিলেই আর কিছু জানবার দরকার নেই!" বীরেনের বিস্ময়ে তার নিজের উত্তর নিহিত ছিল।

"উহুঁ। আর কিছু জানবার দরকার নেই। শেয়ারের সম্বন্ধে এক-মাত্র জিজ্ঞাস্য এই যে তা থেকে ডিভিডেন্ড আসে কিনা। অন্য প্রশ্ন অবান্তর।" নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি ওই ভুলটাই করেছিলুম। সংসাররূপ ষড়যন্ত্রে—লিমিটেড কম্প্যানি নাম দিলেও ওটা ষড়যন্ত্রই—আমিও শেয়ার কিনেছিলুম। কিন্তু এমন বাজে শেয়ার কিনেছিলুম যা থেকে ডিভিডেন্ড আসেনি। ডিভিডেন্ড না পেয়ে আমার মিথ্যা সান্ত্বনা ছিল। মনকে বুঝিয়েছিলুম, আমার শেয়ারই নেই। আমি পুণ্যবান।" একেবারে অপরিচিত স্বরে বললেন, "হঠাৎ

একদিন জেগে উঠলুম ওই আরামদায়িনী ভ্রান্তি থেকে। বুঝলুম, ওটা মিছে কথা। শিক্ষকতাও একটা পেশা মাত্র—তফাৎ শুধু এই যে মাইনে কম। তাই মনভোলানো কথা বলতে হয়; বলতে হয়, এতে মাইনে কম, কিন্তু পুণ্য বেশি। ননসেন্স। বর্তমান সমাজব্যবস্থা অক্ষত রাখতে যে কেউ সাহায্য করছে, সে-ই এর শেয়ারহোল্ডার, কম্প্যানি প্রোমোটার থেকে শিক্ষক, পুলিশ, সবাই। আমিও এতদিন এই ব্যবসায় কাজ করেছি, মাইনে থেকে বঞ্চিত হয়ে ভেবেছি পুণ্য সঞ্চিত হচ্ছে। আমার শূন্য হাতে আর সবাইয়ের মতো পঙ্ক জমেছে, রক্ত লেগেছে। জমেনি শুধু টাকা, যা দিয়ে তোমার মার হাতে কড়া পড়া নিবারণ করতে পারতুম, যা দিয়ে সুরেনের ব্যবসায় মূলধন দিয়ে—"

বীরেন এই অতি পরিচিত যুক্তিগুলির রোমন্থন বাবার মুখ থেকে আর সহ্য করতে পারছিল না। অরূঢ় কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলল, "দোহাই আপনার, সুরেনের সমর্থন করবেন না।"

"কেন নয়?" নগেন্দ্রনাথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "কেন নয়? সুরেন যা করছে তা তোমার আজকের ধনী ব্যবসায়ীদের পিতৃপিতামহ করেছিল। গতকালের, বড়ো জোর পরশুর লুণ্ঠিত ধন আজকের ব্যবসায়ে মূলধন। সার ফ্রান্সিস ড্রেকের ডাকাতির সোনায় ক্লাইভ স্ট্রিটের সাধু ব্যবসায়ীদের ব্যবসার আরম্ভ। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে সুরেনকে গোড়া থেকে সুরু করতে হয়েছে। কিন্তু ওর ছেলে চ্যাটার্জি কম্প্যানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে, তার ছেলে চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হবে, তার ছেলে কলকাতা য়ুনিভার্সিটির ভাইস্-চান্সেলর হবে। তার ছেলে মহাবোধি সোসায়েটির প্রেসিডেণ্ট হবে। সুরেনকে তখন কেউ ডাকাত বলবে না। বলবে, ফাউণ্ডার অব এ গ্রেট হাউস, ফার্স্ট অব এ লং লাইন অব্ পাব্লিক সার্ভেণ্ট্স্! ২০৪৭ খৃস্টাব্দের 'স্টেটসম্যান' উল্টে দেখো। প্রথম পাতায় ওদের ছবি।" ক্লান্ত হয়ে নগেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন। তিনি এত জোরে কথা বলছিলেন যেন নিজেরই ভিতরের কোনো ক্ষীণ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে।

বীরেন বাবার কাছে এসেছিল আশার বাণী শুনতে। আশার আলো দেখতে। আরো সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হোলো। এতদিন

সে ভেবেছিল পৃথিবীতে আর যত পরিবর্তনই ঘটুক, আর যত লোকই একে একে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আত্মবিক্রয় করুক, তার বাবা নগেন্দ্রনাথ অবিচল থাকবেন। দুর্নীতির ঘূর্ণিপাকে আর সবাই তলিয়ে গেলেও নগেন্দ্রনাথ সর্ব খর্বতার ঊর্ধ্বে স্থির থাকবেন।

আর আজ বীরেন এ কী দেখছে! আদর্শ থেকে ছিন্ন হয়ে তিনি শুধু স্রোতে গা ভাসিয়েই তুষ্ট নন'। তাঁর সমস্ত অতীতকে তিনি অস্বীকার করতে চান, বর্তমানকে সমর্থন করতে চান সেই দৃঢ় বিশ্বাস-তীব্রতা দিয়ে যা আগে নিঃস্বার্থ কর্তব্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। তিনি এত উঁচুতে ছিলেন বলেই তাঁর আজকের পতন এত চোখে লাগছে। বীরেন চোখ মুদল। প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বলল, "আপনার সব বিশ্বাস এমন দেউলে হয়ে গেল কবে? কী করে?"

এমন আকুতি নগেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করল। কিন্তু একবার যে বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছে, অন্য পথে পা বাড়িয়েছে, তার কাছে এ আবেদন মানসিক ক্লৈব্য বলে মনে হতে বাধ্য। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের পরিবর্তন এসেছে পরিণত বয়সে। সারা জীবনের সাধনা ও বিশ্বাস তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বীরেনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাই নতুন নগেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতে একটু অসতর্ক হয়ে পড়লেন। বীরেন আবার যেন তাঁর বাবার পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল, "কী হোলো জানিস, তখনো আমার আত্মসম্মানের অন্ত ছিল না। তোকে বলে দিলুম যে তোর বাড়ি গিয়ে থাকব না, তোর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেব না। এদিকে সুরেনেরও কিছু হোলো না। বিমলা মাস্টারি করে পঞ্চাশ টাকা আনতো। সে তো বাড়ি ভাড়া। আমি কলকাতায় গেলুম নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সভায়। শিক্ষামন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বাণী পাঠিয়েছিলেন। সবাই বললেন, শিক্ষকরা হচ্ছে সমাজের কেন্দ্রস্বরূপ, জাতীয়চরিত্রের নির্মাতা, নতুন সমাজগঠনে অগ্রগামী সেনা-দল। মন্ত্রীর কাছে সবাই মিলে আবেদন জানালুম মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিতে, ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্সের রেটটা একটু উঁচু করে দিতে—যাতে সমাজকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা একেবারে অনাহারে না মরি। মন্ত্রীমশাই শুধু আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যানই করলেন না, তাঁর মুখে

ও কথায় এমন ঔদাসীন্যের নির্লজ্জ ইঙ্গিত পেলুম যে এক মুহূর্তে শিক্ষকতার প্রতি সকল শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিষণ্ণ মনে বরানগর ফিরে বড়োবৌকে বললুম, 'খিদে পেয়েছে। আমার খাবারটা দিয়ে দাও।' বড়োবৌ বললে, 'একটু দেরি করতে হবে।' আমি ভাবলুম রান্না হয়নি বুঝি। কিছুক্ষণ বাদে আবার চাইলুম। বড়োবৌ আবার বললে, 'দেরি করতে হবে।' একটু থেমে বলল, 'বিমলা এলেই দেবো।'— বিমলা এলে? আমি বুঝতে পারলুম কি পারলুম না মনে নেই। কিছুক্ষণ পরে, আমি এই বারান্ডায় ঠিক এই জায়গাটায় বসেছিলুম, বিমলা এলো হাতে একটা থলে নিয়ে। জিজ্ঞাসায় জানলুম বিমলা কোত্থেকে থলে ভর্তি করে এনেছে মাসের ষোলো তারিখে। তখনো বোকা ছিলুম, রাগী ছিলুম। লাথি মেরে থলেটাকে ফেলে দিলুম ওই চৌবাচ্চার কাছে। অন্নে রুচি ঘুচে গেল। বড়বৌকে বললুম মেয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। অভুক্ত কিন্তু গর্বিত হয়ে শুয়ে পড়লুম।"

বীরেন হাতে মাথা ঢেকে কাঁদছিল। নগেন্দ্রনাথ নিশ্বাস নিয়ে আবার বললেন, "জানিস, সারা রাত এপাশ ওপাশ ফিরলুম। একটুও ঘুম হোলো না। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করলুম। বারবার মনে মনে বললুম, আমার বিবেককে অশুচি হতে দিইনি। পাকস্থলীর পীড়া কিছু নয়। দেহ তো জীর্ণ বাস মাত্র। আত্মাই সব। আত্মাই সব। আত্মাই সব।"

নগেন্দ্রনাথ আরো কাছে এসে প্রায় কানে কানে বললেন, "বারোটা বাজল। একটা। দু'টো। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ক্ষুধার একটা স্তর আছে যখন পর্যন্ত দেহ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আত্মার চিন্তা সম্ভব। ক্রমে একটা অবস্থা আসে যখন পাকস্থলীর আর্তনাদে বিবেকের বাণী আর শোনা যায় না। তখন মনে হয়, আত্মা আত্মরক্ষা করুক। আমি আর পারছিনে। তৃপ্ত দেহে যা কিছু ইটার্ন্যাল ভ্যাল্যুজ বলে মনে করেছিলুম, সে মুহূর্তে তার এক কানাকড়িও মূল্য নেই। তখন আমি সাধু নই, অসাধু নই; আমি শুধু বুভুক্ষু। তখন আমার আত্মা নেই, বিবেক নেই; আছে শুধু রোদনভরা এক শূন্য উদর।

আর সব দাবীর সঙ্গে যুক্তি চলে, তর্ক চলে। ক্ষুধা বধির। অন্ধ। কী করলুম জানিস? চোরের মতো আস্তে আস্তে উঠে গেলুম আবার ওই চৌবাচ্চার কাছে। বড়োবৌ বা বিমলা যাতে না জেগে যায়। চালগুলো ভিজে একটু নরম হয়েছিল। খেয়ে নিলুম। কই, বিমলার আনা চাল তো স্বাদ বদলায়নি। ঠিক যেন আমার নিজের মাসিক মাইনে দিয়ে কেনা। বরং মাইনে দিয়ে যা কিনতুম তার চেয়ে ভালো চাল। যতটা পারলুম খেয়ে নিলুম। আঃ, কী শান্তি ক্ষিদের পরে খাওয়ায়! আগে জানতুম না ক্ষুধাশান্তিতে কী শান্তি। ভাবতুম ভোরের আগে গায়ত্রী জপ করার মতো শান্তি নেই জীবনে। ভাবতুম মিল্টনের কাব্যের চেয়ে বড়ো মহিমা নেই। ভাবতুম ব্রাউনিং পড়বার পরে কার মনে নৈরাশ্য বাসা বাঁধতে পারে?" আরো কাছে এসে নগেন্দ্রনাথ চাপা স্বরে কিন্তু প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "সব মিছে কথা। ক্ষুধার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা বলতে পারে শুধু রুটি পেয়ে মানুষ বাঁচে না। বীরেন চ্যাটার্জি, আই. সি. এস. বলতে পারে।"

বীরেন কিছু বলল না। সত্যি, ক্ষুধার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তবু—তবু, ক্ষুধাকেই সে মানুষের ব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক বলে কিছুতেই মানবে না। তার বাবা বদ্‌লেছেন, তিনি অন্য মানুষ। তিনি তিক্ত, তিনি সুস্থ নন। তর্ক বৃথা। বীরেন চুপ করে রইল।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নয়। তিনি আবার নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "ওফীলিয়া ঠিক বলেছিল। আমরা জানি আমরা কী। আমরা কী হতে পারি, সেটা জানিনে। আমিও জানতুম না সেই রাত্রির আগে। অন্ধকারে সেই চৌবাচ্চার পাশে আমাকে স্পষ্ট কেউ দেখতে না পেলে নির্ঘাত একটা কুকুর বলে মনে করতো। ঠিকই মনে করতো। সেমুহূর্তে কোনো জানোয়ারের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না।"

এতক্ষণ নগেন্দ্রনাথের কণ্ঠে একটা হিংস্রতা ছিল। এখন তা শান্ত হোলো। বললেন, "পর দিন সেই অবস্থাই মেনে নিলুম। কুকুরের পর্যায়ে নেমে গিয়ে সেইখানেই রয়ে গেলুম। আর শিক্ষক সম্মিলনীতে গিয়ে কেঁউ কেঁউ বা ঘেউ ঘেউ করব না। যার-তার রান্নাঘরে ঢুকে যা পাব খেয়ে আসব। কেউ বাধা দিলে কামড়াব। ঈশ্বর তাঁর স্বর্গে বিরাজ

করুন, আমি মর্ত্যের নিয়ম মেনে নিলুম। বিমলা চাল আনবে। সুরেন সোনা আনবে। আর—"

"আর আপনি?" এতক্ষণে বীরেন একটা কথা বলতে পারল।

"আমি? ভাবছি। বড়ো দেরি হয়ে গেল আগেকার মোহ থেকে বাস্তবে ফিরতে। ইস্কুল-মাস্টারি পেশাটার দোষই এই। শিক্ষার জগৎটাই বাইরের জগৎ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন যে একবার মাষ্টারি করলে অন্য সব কাজে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়তে হয়। এখনো মিছে কথা বলতে বাধে, তাই ধরা পড়ে যাই। এখনো পূর্বজন্মের সংস্কারগুলি একেবারে যায়নি।" নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। শিগগিরই অভ্যাস হয়ে যাবে। ওঠা শক্ত, নামা সহজ। দু'দিন আগেও যা অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হোতো এখন তা বাস্তবের সঙ্গে প্রয়োজনীয়, প্রায় অবশ্যম্ভাবী সন্ধি বলে মনে করি। দু'দিন বাদে এইটেকেই একেবারে স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি বলে মনে হবে। অন্যথা হলেই তা বিকৃতি, দুর্বলতা, শুচিবাই, কুসংস্কার ইত্যাদি বলে মনে করব। হয়ে যাবে। অভ্যাস হয়ে যাবে।"

নগেন্দ্রনাথকে কথাগুলি বারবার বলতে হচ্ছিল। শুধু বীরেনের অবগতির জন্যে নয়, নিজের আশ্বাসের জন্যে। নগেন্দ্রনাথ তাঁর নবলব্ধ সাংসারিক জ্ঞান নিরতিশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা করছিলেন, কেননা তিনি নিজেই ওটা এখনো পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু বীরেন তার নিজের মনের গভীরে এমনভাবে ডুব দিয়েছিল যে নগেন্দ্রনাথের পরিবর্তন—রূঢ় হলেও ঠিক নামটাই বলা যাক, অধঃপতন—তার কাছে একেবারে সম্পূর্ণ বলে মনে হোলো। যারা অতিমাত্রায় আত্ম-বিশ্লেষণপ্রিয়—নিজেদের প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে যারা অনবরত মনের অবচেতনের গহনে অনুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত—তারাই আর সকলের ব্যবহারের বাইরের মন্দটা দেখেই রুষ্ট। একবারও তাদের মনে হয় না যে অপরেরও অপকর্মের অন্তরালে সহস্র জটিল উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, এবং তার সবগুলিই মন্দ না-ও হতে পারে।

বীরেনও তার বাবার প্রতি সেই অবিচার করল। কিন্তু রোষ প্রকাশ করতে পারল না। আগের মতো চুপ করে রইল। মনে মনে আরেকটি

মুমূর্ষু সম্বন্ধকে সমাধি দিল, আরেকটি ছিন্নপ্রায় যোগসূত্রকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। আপন মনে বলল, 'আমার বাবা, না, ইনি আমার বাবা নন। আমার পিতাকে আমি ত্যাগ করলুম, কেননা তিনি পতিত হয়েছেন।' বীরেনের নিজেকে সত্যি পিতৃহীন মনে হোলো।

নগেন্দ্রনাথ তখনো আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আত্মবিশ্বাস আহরণের ব্যর্থ চেষ্টার পরে আবার স্বগতোক্তি করলেন, "আমি আশা ছাড়ব না। আমার না হোক, সুরেনের হবে, বিমলার হবে। ওরা তো পাঠশালায় গুরুগিরি করে জীবনের তিন-চতুর্থাংশ অপব্যয় করেনি। ওরা নতুন বাঙলার নীতিশূন্যতায়—নীতিশূন্যতাই বা কেন; এটা শুধু নেগেটিভ নয়, পজিটিভ; এই নতুন নীতিতে—বড়ো হয়েছে। ওদের মনে আমার মতো সংশয় নেই, শুচিবাই নেই, যা শুধু ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে। ওরা নিঃসংকোচে কাজ করবে। কনুই দিয়ে আর সবাইকে ঠেলে ওরা এগিয়ে যাবে; কে পড়ে গেল, কার লাগল, এত ভেবে পিছিয়ে থাকবে না।" এক কথা বারবার বলেও নগেন্দ্রনাথের মনে তৃপ্তি ছিল না। তাঁর অলস মস্তিষ্কে; অলস নয়, বেকার; বেকার মস্কিষ্কে শয়তান এসে ঠাঁই নিয়েছে, কিন্তু হৃদয় সায় দিতে চাইছে না। উপবাসভীত উদর নগেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ককে পরাস্ত করেছে, তবু একেবারে দলভুক্ত করতে পারেনি। হৃদয় সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সংরক্ষণশীল, তার বদল এত সহজে ঘটে না। নগেন্দ্রনাথের উভয়সংকট এই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। উদর দু'য়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে হৃদয়কে বলছে মস্তিষ্কের পারে চলে আসতে। কিন্তু হৃদয়ের মূল গত ষাট বছর ধরে অনেক গভীরে চলে গেছে। এখন ছেঁড়াও দায়, মানাও দায়।

নগেন্দ্রনাথ পায়চারি করতে করতে কখন যে বীরেনের পিছন থেকে কোন দিকে চলে গেছেন, বীরেন তা লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ যখন খেয়াল হোলো তখন সে ভয় পেল। নগেন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটা কথাতে তাঁর উত্তরসূরীদের বিবেকশূন্যতা সম্বন্ধে কপট আশার প্রচণ্ড প্রচারের অন্তরালে তাঁর নিজের সম্বন্ধে নিঃসীম হতাশার এমন নির্ভুল একটা সুর ছিল যে বীরেনের মনে হোলো সেই মানসিক অবস্থায় কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। যে পৃথিবীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার

মৃত্যু হয়েছে। যে পৃথিবী তিনি গড়তে চেয়েছিলেন তা প্রায় জন্মাবার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল—কবে থেকে? ১৯০৭? ১৯১৮? ১৯২৯? ১৯৪৬? ৪৭? বলা শক্ত। মানুষের জন্মমৃত্যুর ঠিক সময়টা ঘড়ি আর পাঁজি দেখে নির্ণয় করা সম্ভব; কিন্তু সভ্যতার আবির্ভাব আর বিলয় দিবসের ঊষা আর গোধূলির মতো বিলম্বিত; ঘড়ির মিনিটের কাঁটার মতো তার অগ্রগতি নিশ্চিত, কিন্তু অগ্রগমনের কালে দেখে বোঝা অসম্ভব—এ অবস্থায় নগেন্দ্রনাথ যদি মনে করেন তাঁর বেঁচে থাকা নিরর্থক, বরখাস্ত হবার আগে বিদায় নেয়াই সঙ্গত, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে কি?—

বীরেন সত্যি ভয় পেল। পাশে পুকুরে কী যেন একটা পড়ল, বীরেনের কানে সে শব্দ পৌঁছোতে তার ভয় আরো বাড়ল। বীরেন জানতো যে তরুণ ব্যর্থ প্রেমিকরাই শুধু আত্মহত্যা করে না। তবে কি?—

বীরেন একটু আগে তার বাবাকে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল, তার বাবা নেই। এখনও সে তার মত পরিবর্তন করেনি, না, কিছুতেই সে তার পিতার নৈরাশ্য মেনে নেবে না,—ভালো ভালোই, আর মন্দ মন্দই;—কিন্তু একথা বীরেনকে যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর কী হোলো? এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন কী করে ঘটল? এই আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু বিস্ময়কর, কিন্তু ভয়াবহ নয়। ভয়াবহ হচ্ছে শারীরিক মৃত্যু। বীরেন তার চতুর্দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। যেমন ঘন অন্ধকার ছিল তার নিজের মনে। বীরেন কিছু দেখতে পেল না, বুঝল না নগেন্দ্রনাথ কোথায় গেছেন। তবু বীরেনের সমস্ত সত্তা এমন অবশ হয়ে গিয়েছিল যে তার উঠবার সাধও ছিল না, উৎসাহও ছিল না।

বীরেন ভাবছিল তার পুরানো প্রশ্ন, ভালো-মন্দের কথা। সদানন্দের অনুরোধ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব নয়, ওটা সমস্যার প্রত্যক্ষ মূর্তি। কিন্তু সমস্যা যখন বস্তুবর্জিত, শুধু নীতিগত, অতএব নিরাকার, তখন এমন চিন্তার ধর্মই সমস্যাকে ক্রমাগত জটিল করে তোলা। ক্রমে এমন অবস্থা হয় যে তখন মনেই থাকে না সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল কোন প্রসঙ্গে। তখন চলে অন্তহীন রোমন্থন। তখন কর্ম অবহেলিত হয়, কর্মশক্তি পঙ্গু হয়। আধ্যাত্মিকতার আত্মপ্রসাদ কর্মবুদ্ধিটিকে আবৃত

করে রাখে। বীরেনেরও তাই হয়েছিল। এজন্যে অবশ্য তাকে শুধু দোষ দেয়া অন্যায়। ব্যাধিটা জাতিগত, অর্থাৎ যাকে আমরা সদর্পে সাধারণত ভারতীয় ঐতিহ্য বলে প্রচার করি।

মনের পিছনে কিন্তু বীরেনের আতংক ছিল নগেন্দ্রনাথের অন্তর্ধান সম্বন্ধে। কিন্তু এমন একটা দার্শনিক নিষ্ক্রিয়তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে নগেন্দ্রনাথের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে সে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়নি। সে নিজেও নিজের কাছে একথা স্বীকার করত না, কিন্তু কেন যেন বীরেনের বারবার স্টেফান ৎসেইগ দম্পতীর কথা মনে হচ্ছিল। বীভৎস অবসান। কিন্তু যেন মহত্ত্ববিরহিত নয়। সত্যি তো, বিশ্বাসই যদি গেল, আশাই যদি আর অবশিষ্ট রইল না, তবে লাভ কী বেঁচে থেকে? মুহূর্তে মুহূর্তে দুর্নীতিবিষাক্ত বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে ধুঁকে ধুঁকে মরার চাইতে হঠাৎ—উইথ্ এ ব্যাং—স্বেচ্ছায়, স্বহস্তে শেষ হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়? প্রায়ই বীরেন লক্ষ্য করেছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গতি বড়ো দুর্লভ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুটা যেন জীবনের পরিণতি নয়—গানের যেমন সম। মৃত্যু যেন হঠাৎ কারো হাত লেগে সুইচ-অফ্, যেন দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে অকস্মাৎ যবনিকাপতন। বীরেনের মনে আছে তার বাবার জীবন কী অসম্ভব রকম সাজানো, গোছানো, নিয়মনিষ্ঠ ও ব্যবস্থানুবর্তী ছিল। কোথাও এতটুকু অনিয়ম বা ব্যতিক্রমের উপায় ছিল না। স্থির, অকম্পিত দীপশিখার মতো নগেন্দ্রনাথের জীবনপদ্ধতি সমস্ত পরিবারটি ও পারিপার্শ্বিক একদিন আলোকিত করে রাখতো। আজ সেই নিস্তেল প্রদীপের নিস্তেজ শিখা যদি দপ দপ না করে তাড়াতাড়ি নিভে যায়, সেই ভালো, সেই ভালো।

বীরেনের এই কথাটা মনে আসতেই নিজেকে একেবারে হৃদয়হীন বলে মনে হোলো। ভালো-র আলেয়ায় ঘুরে সে যেন ভালোবাসাকে ভুলতে চলেছে। সে উঠে দাঁড়াল। পিছনে তাকিয়ে দেখল নগেন্দ্রনাথ আবার ফিরে আসছেন। বীরেন নিশ্চিন্ত হোলো কি বিব্রত হোলো নিজেই বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার এতক্ষণের সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত সচ্চিন্তা নিতান্ত হাস্যকর মনে হোলো। মর্মান্তিক হাস্যকরতা।

আরো বাকি ছিল। নগেন্দ্রনাথ বললেন, "তুই কী ভাবছিলি আমি জানি।"

বীরেন কী বলবে ভেবে পেল না। এবারে যেন তার নগেন্দ্রনাথকে চিনতে আরো বেশি কষ্ট হোলো। একেবারে অন্য মানুষ। শয়তানের উকিল নয়, তিক্ত আদর্শবাদী নয়, পতিত মহান নয়,—যেন আজন্ম কেরাণী, কণ্ঠে তৈলাক্ত তোষামুদে অন্তরঙ্গতা।

"ভাবছিলি যে আমি তোর বাবা নই, অর্থাৎ না হলেই তুই খুশি হতিস্। ঠিক কিনা বল?"

এই রকমের ইতর ভাষা বীরেন কখনো তার বাবার মুখে শোনেনি। সে বিরক্ত হোলো। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তার মনের কথা জেনে গেলেন কী করে? অন্ধকারে বুঝি পড়া যায় মনের কালো কথাগুলি?

নগেন্দ্রনাথ কুৎসিত হাস্যের সঙ্গে বললেন, "ঠিকই ভেবেছিস। আমি যদি অবিবাহিত হতুম, নিঃসন্তান হতুম, তাহলে হয়তো এ দশা হোতো না আমার। সৎ সংসারী বলে কোনো মানুষ নেই।"

আবার সেই অসাধু আত্মসমর্থনের করুণ প্রয়াস। বীরেন এবার সত্যি বিরক্ত হোলো। ভাবল এবার বিদায় নেবে। বলল, "আমি এবার যাবো।"

নগেন্দ্রনাথ বললেন, "একটা কাজ করবি যাবার আগে? তুই আমার ছেলে, তাই কোনো আত্মীয়ের জন্যে কখনো কিছু করবিনে। ওটা অন্যায়। কিন্তু এখন তো আমি তোর বাবা নই। এখন আমার জন্যে কিছু করলে আত্মীয়পোষণ হবে না। এঁ? ঠিক কিনা?"

বীরেন শুধু বলল, "কী?"

"আমি তো মাষ্টারি ছেড়ে দিয়েছি। ওতে কোনো লাভ নেই। শুধু নিজের ক্ষতি নয়, ভবিষ্যৎ একটা জাতির সর্বনাশ।" আরো কাছে এসে নগেন্দ্রনাথ প্রায় কানে কানে বললেন, "বুঝলি আমি একটা ইন্স্যুরেন্স কম্প্যানির এজেণ্ট হয়েছি। খুব ভাল কম্প্যানি, হ্যাঁ। এই বীমার দালালিতেই টাকা আজকাল। তা তোর তো অনেকের সঙ্গে চেনা, আমাকে দিবি কয়েকটা পলিসি জোগাড় করে? এঁ?"

এই 'এঁ' শব্দটার চেয়ে একটু আগে শোনা পুকুরে কারো ঝাঁপিয়ে

পড়ার শব্দও যেন মধুর ছিল। বীরেন অনেক কিছু আশংকা করেছিল। মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু এটা ভাবতে পারেনি যে তার গম্ভীর বিষণ্ণ সন্ধ্যার এমন হাস্যকর অবসান ঘটবে। এ যে মৃত্যুর চেয়ে মর্মন্তুদ, এই বেঁচে থাকা। বীরেন আবার বুঝল, জীবন্ত একটা বৃহৎ অরণ্য হঠাৎ একদিন কারো নির্দেশে ভূগর্ভে চলে গিয়ে অঙ্গারে পরিণত হয় না। বহুদিন ধরে ঝ'রে, শুকিয়ে, পচে, আস্তে আস্তে তার সমাধি হয়। একটা বর্দ্ধিষ্ণু নগরও হঠাৎ একদিন ভূমিকম্পের পরে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। ধীরে ধীরে, বহু শতাব্দী ধরে, অরণ্য বা মরুভূমি তাকে গ্রাস করে। একটা সভ্য সমাজও হঠাৎ একরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের মতো অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় না, ধীরে ধীরে বর্বরতার অমাবস্যা এগিয়ে আসে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়, পুরানো প্রদীপগুলি পড়ে থাকে, কিন্তু দীপালি হয় না। কেননা সমাজের আর তেল নেই, সলতে নেই। ব্যক্তিরও সেই দশা। নগেন্দ্রনাথেরও।

শিখাহীন প্রদীপের মেলায় বীরেন শিউরে উঠল। নগেন্দ্রনাথকে কিছু না বলে চলে এলো।

*

সুরমা বুঝেছিল বীরেনের কাছে সে তার প্রশ্নের উত্তর বা সংশয়ের নিরসন পাবে না। বেচারী নিজেই দিশেহারা। অসহায়। তাছাড়া সুরমার সমস্যার উৎসই তো বীরেন নিজে। বিষাদ-রোগ—যে কোনো যৌন ব্যাধির চেয়ে ভয়ংকর—স্বামীস্ত্রীর একজনের হলে আরেক-জনের না হয়ে উপায় নেই, সুরমা-বীরেনের তাই হয়েছে। রোগীর কাছে কে যাবে চিকিৎসার আশায়? আসামীর কাছে কে চাইবে বিচার?

আর কারো দিকেও তাকাবার উপায় নেই। সুরমার সত্যকার বন্ধুত্ব নেই কারো সঙ্গে। সবাই পরিচিত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সুরমা তাই প্রায় সব সঙ্গ পরিহার ক'রেছিল। নিবাত নিঃসঙ্গতায় বিষাদের মেঘ দিনের পর দিন ঘন হয়েছে, জমা হয়েছে। একা সুরমা সারা দিন শুয়ে থাকে, সন্ধ্যাবেলা এর বা ওর পার্টিতে যায় শুধু যেতে

হয় বলে। বীরেনের সঙ্গে খাবার টেবিলে পর্যন্ত কয়েক দিন দেখা হয়নি। রাত্রেও নয়। বীরেন কোনো পার্টিতে যায় না। কিন্তু দেরী করে ফেরে, কোথা থেকে কে জানে। সুরমা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায়নি।

সুরমার পড়তে ভালো লাগে না; এক সময় সুন্দর সেতার বাজাতো, এখন তাতে রুচি নেই; বেরুতে ভালো লাগে না; কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না;—বস্তুত ভালো-না-লাগার তালিকা করতে গেলে তার আর শেষ হবে না।

কিন্তু ভালো লাগে কী? একটা কিছুও ভেবে পেল না!

একদিন নিজের সঙ্গ আর সহ্য করতে না পেরে সুরমা লিলিকে টেলিফোন করল। পেল না ওকে। কিন্তু নামটা রেখে দিল।

টেলিফোন রাখবার বোধহয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে সশরীরে লিলি এসে উপস্থিত।

কলকাতায় টেলিফোনে কাউকে না পাওয়া আদৌ অভাবনীয় ঘটনা নয়। বিশেষ করে লিলিকে, যিনি কিনা উদীয়মানা চিত্রাভিনেত্রী। তার পরে এত বড়ো বিরাট শহর কলকাতায় কে যে কখন কার বাড়ি এসে উপস্থিত হবে তাও আগে থেকে জানা প্রায় অসম্ভব, অর্থাৎ বিস্ময়কর সংযোগ আদৌ বিস্ময়কর নয়। তবু সুরমার ভালো লাগল। কত ভালো লাগল তার সর্ববাদিসম্মত কোনো পরিমাপ নেই। তাই সবাইকে বোঝানো যাবে না। তাই সুরমা যখন লিলির অভ্যর্থনায় উল্লসিত হয়ে উঠল, তখন লিলি নিজেই যৎপরোনাস্তি বিব্রত হোলো। লিলি কী করে জানবে এমন হঠাৎ প্রত্যাশিত একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার অর্থ কী? সুরমা প্রায় ধরে নিয়েছিল যে সে যা কিছু চাইবে—তা সে যত সামান্য, যত সুলভ বস্তু হোক—তা-ই কোন এক নিষ্ঠুর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে নিমেষে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। সাগর চাইলে সাগর শুকিয়ে যায়, এদুর্ভাগ্যের কথা সুরমা শুনেছিল। কিন্তু এক গেলাস জল চাইলে যার হাত থেকে গেলাসটা পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তার ভাগ্য

কি আরো মন্দ নয়? সুরমা তো জীবনের কাছ থেকে বেশি কিছু চায়নি—গার্গীর মতো অমৃত হতে চায়নি, বীরেনের মতো ভালোমন্দের দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা চায়নি, এমনকি ললিতার মতো পৃথিবীকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করেনি—তবু কেন সেটুকু তার ভাগ্যে জুটল না? যার আশা এত ক্ষুদ্র, তার নিরাশা এত বিরাট হোলো কেন?

তবু, একটু আগে সে লিলিকে খুঁজেছিল, এইমাত্র তাকে পেয়েছে—এইটুকু প্রাপ্তিতে সুরমার ভীরু বাসনার অঞ্জলি উচ্ছল হয়ে উঠল। লিলির সঙ্গে পরিচয় তার সামান্য, একবার দেখা হয়েছে কি হয়নি; তবু লিলি আসতেই সুরমা তাকে জড়িয়ে ধরল, যেন সমবয়সী, যেন আজন্ম বন্ধুত্ব। বলল, "লিলি, তোমাকে আজ আমার বড়ো দরকার ছিল। এই একটু আগে তোমায় টেলিফোন করেছিলুম।"

লিলি অবাক হয়ে বলল, "সত্যি? আমিই তো ইতস্তত করছিলুম বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা অনুমতিতে, আপনার এখানে আসব কিনা।" লিলি প্রকাশ করল না ঠিক কী প্রয়োজনে সে হঠাৎ সুরমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পরে বলা যাবে।

সুরমা তখনো খুশি ছিল তার দুর্ভাগ্যাকাশে ক্ষীণ বিদ্যুদাভায়। সত্যি, এমন কী করে হোলো যে সে ঠিক যখন লিলিকে চাইছিল তখনই সে এসে হাজির হোলো? সে যখন বীরেনকে চায় তখন বীরেন কেন আরো দূরে সরে যায়!

তবু, লিলিকে তার দরকার ছিল। কম্যুনিজমের সঙ্গে সুরমার কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই। কিন্তু সে শুনেছিল যে আজকের পৃথিবীতে কম্যুনিস্টদের মতো আত্মপ্রত্যয়ী কেউ নেই। ওদের কোনো সন্দেহের বালাই নেই। ওরা শুধু পুঁজিবাদ বা অন্যান্য সামাজিক ব্যাধিরই ওষুধ জানে না। ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বেরও ওষুধ ওদের জানা। ওদের ব্যবস্থায়, সুরমা শুনেছে, কেউ ট্রামে পর্যন্ত চাপা পড়বে না। সুরমার তাই এমন সাথীর প্রয়োজন ছিল। হয়তো লিলি সুরমাকে বলে দিতে পারবে কোন পথে তার মুক্তি। মানে, মুক্তি থেকে মুক্তি। কেননা সুরমা তো মুক্তি চায়নি, সে বন্ধন চেয়েছিল। সে চেয়েছিল যে এই পৃথিবীতে সে বাসা বাঁধবে। এমন বাসা যা মুহূর্তে ভেসে যাবে না চিরন্তনীর

স্রোতে। নিরবধি কাল বা বিপুলা পৃথিবী নিয়ে সুরমার দুশ্চিন্তা নেই। সে শুধু চেয়েছিল তার নিজের বাড়িটুকু ঘিরে তার নিজের জীবনটুকু ব্যেপে একটুখানি সুখ। বিশ্বের দুর্গতরা তাদের কথা ভাবুক। স্টালিন সে ভাবনায় যোগ দিতে চান তো দিন। সুরমা উদাসীন। সুরমার ভাবনা তার নিজকে নিয়ে।

লিলি এসেছিল তার নিজের প্রয়োজনে। সুরমার উচ্ছ্বাসে বুঝল তাকে এখনি যেতে হবে না। গল্প করার উদ্দেশ্যেই বলল, "হঠাৎ আমাকে দরকার, বুঝতে পারছিনে তো।"

"সেকথা পরে হবে, লিলি।—আচ্ছা, তোমায় তুমি বলছি বলে রাগ করছ না তো?"

"একটুও না। আপনি তো আমার চেয়ে অনেক বড়ো।"

সুরমা তাদের বয়সের অসাম্যের কথাটা বিবেচনা করতে চাইল না। বয়সের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মেয়েতে মেয়েতে। তাছাড়া একই অবস্থায় পড়লে কে মনে রাখে বয়সের কথা? সুরমা বলল, "থাক, আমি তোমার শাশুড়ীর বান্ধবী হলেও আমাকে তোমার শাশুড়ী বলে মনে করতে হবে না।"

"বেশ।" লিলির ভালো লাগছিল এমন আন্তরিক আত্মীয়তা। কিন্তু দরকারটা কী? লিলি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। সুরমা চায়ের ব্যবস্থা করল, লিলিকে কাছে এনে বসাল, একথা ওকথা বলল, কিন্তু কাজের কথায় এলো না। লিলিরও দেরি হয়ে গেল তার নিজের কথাটা উত্থাপন করতে।

একবার সুরমা বলল, "আচ্ছা লিলি, তুমি জানো যে আমি তোমার সব কথা জানি?"

লিলি এই প্রশ্নটার জন্যে তৈরী ছিল, হেসে বলল, "জানি যে জানেন না।"

"মানে?"

"যা শুনেছেন তা ললিতাপিসীর কাছ থেকে, তাই নয়? উনি ভাবেন সব জানেন, কিন্তু জানেন না। আমাকেও আপনার কথা অনেক বলেছেন, কিন্তু একবারও তাই থেকে মনে করছি না যে আপনাকে জানি।"

"পিসীর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা তো অপরিসীম দেখছি!"

"শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার প্রশ্ন নয়। ললিতাপিসীরও দোষ নয়।" কী নয়, লিলি তা বলল। কিন্তু কী, তা বলতে তার দ্বিধা ছিল।

সুরমা বলল, "তবে?"

লিলি না বলে পারল না। সুরমার কণ্ঠে ও আচরণে এমন স্নিগ্ধ সমবেদনার আবেশে ছিল যাতে তার জিজ্ঞাসা জেরা বলে মনে হয় না। লিলি বলল, "কী জানেন, ললিতাপিসীর জীবন এক জগতে অতিবাহিত হয়েছে; আজ অন্য জগতে আসতে বাধ্য হয়ে তাঁর জীবনে যে শূন্যতা এসেছে তা তাঁর দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বাইরে আর কিছু তাঁর—"

সুরমা লিলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, যে জগৎ সম্বন্ধে তুমি বলছ আমিও কিন্তু সেই জগতের অধিবাসিনী।"

লিলি হেসে বলল, "না, না, আমি খারাপ কিছু বলতে যাচ্ছিলুম না। আমি শুধু বিভিন্নতার কথাই বলছিলুম। একেবারে আলাদা দুটো পৃথিবী। ললিতাপিসীর পক্ষে তাই আমাকে বোঝাই অসম্ভব।—আপনারও!"

সুরমা নিরাশ হোলো। ভেবেছিল লিলির সঙ্গে তার কোথাও একটা আত্মীয়তা আছে। তাই লিলিকে বলল, "ওটা তোমার ছেলেমানুষী, লিলি। একটা বয়সে আমরা সবাই নিজেদের একেবারে য়ুনিক্, অদ্বিতীয় বলে মনে করি। বড়ো হলে জানি আমাদের মতো অভিজ্ঞতা আরো লক্ষ জনের হয়েছে। তারাও সবাই এক সময়ে মনে করেছিল এমনটি আর কারো হয়নি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কখনো কারো ভাগ্যে নয়।"

"ভুল করছেন, সুরমাপিসী। আমি শুধু আমার কথা বলছিলুম না, আমাদের কথা বলছিলুম। আমার মতো আরো অনেকের হয়েছে।"

"এই 'আমরা' কারা, লিলি?"

"আমরা যারা ছেলেবেলায় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলুম, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। আমার মা একে বলতেন 'স্বদেশী করা'। কিন্তু অন্যান্য স্বদেশী করার সঙ্গে এর একটা মস্ত প্রভেদ আছে। আমার

অনেক বান্ধবী আছে যারা কনগ্রেসী রাজনীতি করেছে কলেজে থাকতে, পরে বিয়ে করেছে, মা হয়েছে, রাজনীতির কথা মনেও থাকেনি।” হেসে বলল, “একজন ছিল এমন ঘোর কনগ্রেসী যে তার খদ্দরের মশারি না হলে ঘুম হোতো না, খদ্দরের মোজা পর্যন্ত করিয়েছিল। পরে বিয়ের সময় কে এক বান্ধবী বিলিতি জর্জেট না দিয়ে খদ্দরের শাড়ি উপহার দিয়েছিল বলে তার সঙ্গে কথা কয়নি অনেক দিন! পরে রাজনীতি কোথায় ভেসে গেছে, ছেলেদের মেরেছে ইস্কুলে হরতাল করেছে বলে!”

একটু থেমে বলল, “কিন্তু আমার কম্যুনিস্ট পার্টির একজন কমরেডের কথাও ভাবতে পারিনে যে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পেরেছে। চেষ্টা করেছে দু'চার জন, পারেনি। যত দিন পার্টিতে ছিল, সব ঠিক ছিল। কোথাও কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না, কোনো প্রশ্নের বালাই ছিল না। বস্তুত, ব্যক্তিগত জীবনই প্রায় গৌণ ছিল। আমরা প্রত্যেকে জানতুম আমাদের লক্ষ্য, জানতুম তার সিদ্ধির উপায়। সবাইয়ের কাজ ভাগ করা ছিল, সবাইয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল, সবাইয়ের এক প্রাণ ছিল। কড়াকড়ি নয়, পার্টিকর্তাদের অত্যাচার নয়—ওগুলো পার্টির শত্রুদের প্রচার। সবাই স্বেচ্ছায় সব কিছু মেনে নিতুম, কেননা স্বেচ্ছাটাই সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল না। বড়ো কথা ছিল বিপ্লবের আদর্শ, আমাদের সকলের জীবনের সার্থকতার পরিমাপ ছিল সেই আদর্শের জন্যে কে কতটুকু কাজ করতে পারলুম। আর সব বিবেচনা তুচ্ছ। আজ পার্টি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হবো না, তখন সত্যি জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছিলুম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তখন সার্থক ছিল। প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি চিন্তা তখন উৎসর্গ করা ছিল আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের উদ্দেশে।”

“আর আজ?”

“আজকের কথাটুকুই ললিতাপিসী আপনাকে বলতে পেরেছে ঠিকমতো। কিন্তু তাও অনেকটা বোঝাতে পারেনি। ও কী করে জানবে ভূতপূর্ব কম্যুনিস্টের জীবনের বর্তমানের শূন্যতার নিঃসীম গভীরতা? যা এক সময় সমস্ত জীবন অধিকার করে ছিল হঠাৎ সেই পরিপূর্ণ নির্ভর থেকে ছিন্ন হলে সব কিছু যে কী রকম অর্থহীন

বলে মনে হয়, ললিতাপিসী তা জানবে কী করে? ও ভাবে আমি সমীরের শোকে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছি। ওকে কী করে বোঝাব যে বৈধব্য হচ্ছে একটি ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অতীতের সঙ্গে ছেদ। আর পার্টি ছাড়া মানে একটা বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত হওয়া। ললিতাপিসী অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথা জানে, ভবিষ্যৎ হারানোর মানে জানবে কী করে?" লিলি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে থামল।

লিলির প্রত্যেকটা কথায় তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দৃঢ়তার এমন সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ছিল যে সুরমার তা শুধু কানে বাজল না, মনেও। সুরমার মনে পড়ল যে সে তার মাকে শুনেছে কখনো কখনো এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা বলতে। সে তার মার কাছ থেকে পুজো করতে শিখেছিল। কিন্তু বিশ্বাস পেয়েছিল কি? বোধহয় না। পেলে এত সহজে তা হারাল কী করে? সুরমা ঠিক বুঝতে পারল না সেটা ভালোই হয়েছে, কি মন্দ। বিশ্বাস পেয়ে হারানো ভালো, না কি আদৌ না পাওয়া? নিজের কথা না ভেবে সুরমা লিলিকে বলল, "কিন্তু রাজনীতি ছাড়াও নিশ্চয়ই জীবনে অন্যান্য ইণ্টরেস্ট থাকতে পারে।"

"পারে। আছেও। কিন্তু এক্স-কম্যুনিস্টদের জন্যে নেই। ওই যে বললুম একটু আগে, মেয়েরা কনগ্রেস বা সোস্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করতে পারে, ছেলেরা চাকরি নিতে পারে বা কম্প্যানি ডিরেক্টর কি কণ্ট্র্যাক্টর হতে পারে। হয়ে রাজনীতি পুরোপুরি বিস্মৃত হতে পারে। কিন্তু একবার যে সত্যকার সক্রিয় কম্যুনিস্ট হয়েছে তার জীবনে আর দ্বিতীয় কোনো ভাবনা কখনো ঠিক সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। য়ুরোপে কেউ কেউ ক্যাথলিক হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে অমন ধর্ম নেই। বাকি সবাই কম্যুনিজম ছেড়ে তাকে ভুলে যেতে পারেনি, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে জিহাদ লড়ছে।"

"তুমি কোন দলে, লিলি?" সুরমা সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

"আমি তৃতীয় দলে। আমাদের দল নেই। আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছি কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো। ছড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু দূরে সরে যেতে পারিনি।"

সুরমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তার মানে? এখনো আছো নাকি পার্টিতে?"

লিলি ম্লান হাসি হেসে বলল, "আছিও, নেইও। নাম নেই পার্টির খাতায়, পার্টিরও আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি যে একদিন ছিলুম তাও ওরা স্বীকার করতে চায় না। ওদের দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু আমার দশা হয়েছে করুণ আর হাস্যকর।"

সুরমা নিবিড় অনুকম্পার সঙ্গে বলল, "আমার কাছে হাস্যকর নয়, লিলি।"

লিলি বলল, "সত্যি হাস্যকর। একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্প মানে সত্য ঘটনা। আমার এক সহপাঠিনীর সঙ্গে একটি ছেলের প্রেম হয়েছিল। কী সাংঘাতিক প্রেম কল্পনা করাও শক্ত। একজনকে ছাড়া আরেকজন বাঁচবে না। দু'জনেই দু'জনকে একথা বলেছিল, এবং সে মুহূর্তে দু'জনেই যে সত্যি কথা বলেছিল তাইতেই বা সন্দেহ করব কেন? তারপর যেমন হয়ে থাকে, আমার সহপাঠিনীর বিয়ে হয়ে গেল, অ্যান্ড দে লিভ্ হ্যাপিলি এভার আফটার।"

"আর ছেলেটি?" সুরমা জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

"বেচারী!" লিলি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। "ছেলেটির তার পর থেকে কী অবস্থা! আমার বান্ধবী তার প্রেমিকের কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নেয়নি, বলেনি কেন এমন হঠাৎ তার মতিপরিবর্তন ঘটল। ছেলেটি কেবল জানতে চায় সে কী দোষ করেছে। একদিন বৃষ্টির মধ্যে আমার বান্ধবীর বাড়ির উল্টো দিকের ফুটপাথে প্রেমিক নাকি দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল, ভুতে-পাওয়া পাগলের মতো। হঠাৎ বান্ধবীর স্বামীকে দেখতে পেয়ে নাকি চোরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। বেচারী! ও নিশ্চয়ই জানে ওর সকল আবেদন নিরর্থক, নিশ্চয়ই জানে ওর ভূতপূর্ব প্রেমিকা ওকে দেখলে বিব্রত হয়, এমনকি বিরক্তও হয় (আমাকেও বলেছে সেকথা), নিশ্চয়ই ও প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতা আর

হৃদয়হীনতার জন্যে আমার বান্ধবীকে ঘৃণা করে। তবু একটু অসতর্কচিত্ত হলেই ওরাস্তায় না গিয়ে পারে না, হাতের কাছে টেলিফোন পেলে মাঝরাতে প্রেমিকাকে টেলিফোন না করে পারে না। কিছু করে না ওরাস্তায় গিয়ে, টেলিফোনে জবাব পেলেও কিছু বলে না, তবু না করে পারে না। এই হাস্যকর ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে আমার বান্ধবী তার ভূতপূর্ব প্রেমিককে যতটা ঘৃণা করে, ছেলেটি নিশ্চয়ই নিজেকে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করে, তবু টেলিফোন না করে পারে কই? ছেলেটির কথা নিয়ে আমার বান্ধবী আমার কাছে হাসে, রাগ করে। কিন্তু আমি বোধহয় বুঝতে পারি বেচারীর অবস্থা। কেননা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার বর্তমান সম্বন্ধটাও অনেকটা ওই রকমের। টেলিফোন না করে পারিনে, বেনামীতে চাঁদা না দিয়ে পারিনে। যদিও জানি ওরা আমায় রেনিগেড্ বলে ঘৃণা করে, আমি আজো কখনো পার্টির বিরুদ্ধে একটা কথা উচ্চারণ করতে পারিনে, পার্টির নিন্দা শুনতে পারিনে। ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কিন্তু আমার প্রেম ফুরোলো না! ভুল করবেন না। উপমাটা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। ভিস্-আ-ভি পার্টি, আমি শুধু আমার মনের অবস্থাটা বোঝাতে চাইছিলুম।"

"তারপর?" সুরমা আরো জানতে চাইল।

"তারপর আর কী? পার্টি গেল। বিশ্বাস গেল। আর বাকি রইল কী? জীবনের উদ্দেশ্য গেল। বাকি রইল শুধু বেঁচে থাকা। এখন তাই করছি। আগে জীবনের স্থির একটা লক্ষ্য ছিল, গতিতে নির্দিষ্ট একটা ধারা ছিল। এখন দুই-ই গেছে। এখন তাই ভেসে চলেছি উদ্দাম বন্যার মতো, এর বাঁধ ভাঙছি, ওর ঘর ভাঙছি। নিজের দুটোর কোনোটারই বালাই নেই কিনা?"

"ললিতা তো তাই নিয়েই খুশি।" সুরমা কথাটা বলেই ভাবল ঠিক বলেনি। সে-ও ভালো করেই জানতো যে ললিতা খুশি নয়।

লিলিও সেকথা অনুমান করেছে বোধহয়। বলল, "ললিতাপিসীর কথা জানিনে। কিন্তু আমাকে খুশি বলো ক্ষতি নেই, সুখী বলো না। যদি পার্টির কথা একেবারে ভুলে যেতুম, যদি ওই অদৃশ্য বন্ধন একেবারে

ছিঁড়ে ফেলতে পারতুম, যদি ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন একদিন সত্য করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তাও মন থেকে মুছে ফেলতে পারতুম, তাহলে হয়তো বা বর্তমান নিয়ে সুখী হতে পারতুম। কিন্তু উপায় নেই!" বলতে বলতে লিলির গলা একটু মোটা হয়ে গেল। সুরমা একবারও সেটাকে অভিনয় বলে অবজ্ঞা করতে পারল না।

অন্য কথা তুলে বলল, "কিন্তু পার্টির বাইরেও তো বিরাট পৃথিবী আছে, লিলি, যা আগে দেখনি। এখানে কি ভালো লাগবার কিছু নেই?"

"তুমি হাসালে, সুরমাপিসী! আমার বান্ধবীর ওই প্রেমিককে গিয়ে বলো না, আরো তো কত মেয়ে আছে সংসারে! অল্পই সে সান্ত্বনা পাবে। ও হয় না, সুরমাপিসী। জীবনের সব কিছুতে বদলি দিয়ে কাজ চলে না।"

"না, না, আমি তা বলিনি।" সুরমা ঠিক কী বলতে চেয়েছিল এখন তা নিজেই বুঝল না। বলল, "কিন্তু এখন কেমন লাগছে?"

লিলি করুণ হাসির সঙ্গে বলল, "চমৎকার! এত অল্প পরিশ্রমে যে এমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় তা আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। মাথায় পলিটিকসের পোকা না থাকলে জীবনকে এবার বেপরোয়া হয়ে উপভোগ করতে পারতুম। কিন্তু ওই যে বললুম, পলিটিকসের পোকা না থাকলে!"

সুরমা কিছুতেই এই পলিটিকসের মর্ম বোঝে না। সে জানে সদানন্দের পলিটিকস, সন্ধ্যাবেলায় মহতী জনসভায় উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা। কিন্তু পলিটিকস যে কোনো লোকের, বিশেষ করে কোনো মেয়ের, সমগ্র জীবন এমনভাবে অধিকার করতে পারে, এ তথ্য সুরমার জানবার কথা নয়। তবু রাজনীতির কথা যখন উঠেই গেছে তখন সুরমা বিশেষ কিছু না জানতে চেয়েও জিজ্ঞাসা করল, "কী রকম মনে হচ্ছে রাজনীতির অবস্থা?"

লিলি হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা নিমেষে যেন প্রখর তর্কযুদ্ধে পরিণত হোলো। লিলি বলল, "কী

অবস্থা তা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ না? দি এয়ার ইজ থিক উইথ করাপশন! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।"

সুরমা তার অরাজনীতিক ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "সে তো জানি, লিলি।"

"জানো না, সুরমাপিসী। আমি জানি। আমি গত ক'দিনে যা দেখেছি, ফিল্মের জগতে নয়, তার বাইরে, সর্বত্র, তুমি তার দশ ভাগের এক ভাগও দেখনি। তুমি তোমার ক্লাবে গল্প শোনো শুধু এর ঘুষ নেয়ার আর ওর ঘুষ দেয়ার। ব্যাড ইনাফ্। কিন্তু তার বেশি জানো না। আমাকে জানতে হয়েছে। করাপশন যে সমাজের দেহের আর প্রত্যেকের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ভাবে প্রবেশ করেছে, বাসা বেঁধেছে, তা তোমার জানা নেই। আমি জানি। কেননা আজ আমি একাধারে তার বেনিফীসিয়ারি এবং ভিক্টিম।"

লিলির স্বরে এমন তীব্র ঘৃণা ছিল যে সুরমা আর কিছু বলতে সাহস পেল না। হেসে বলল, "বসো লিলি, আমি বরং পাখাটা একটু জোরে চালিয়ে দিই।"

লিলি কিন্তু হাসল না। ঠিক আগের মতো রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "পাখা খুললে কী হবে, সুরমাপিসী? ওই যে বললুম, দি এয়ার ইজ থিক উইথ করাপশন, সো থিক দ্যাট য়ু কুড কাট ইট উইথ এ নাইফ্।" লিলি সত্যি তার হাত দিয়ে মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানোর ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিল।

সুরমা এত উত্তেজনার মর্ম বুঝল না। লিলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অ্যান্ড, সুরমাপিসী, দি নাইফ্ ইজ কামিং—সুনার দ্যান য়ু থিংক।"

ছুরিকার উল্লেখে সুরমা ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু লিলি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, তাই সুরমার পাণ্ডুর মুখ দেখতে পায়নি। আপন মনে বলে চলল, "কিন্তু আমার আক্ষেপ কী জানো, সুরমাপিসী, সেই ছুরি আসবে, যা তৈরী করতে আমার সাহায্য করবার কথা ছিল, কিন্তু তাতে আমার অংশ রইল না! শুধু কি তাই? ছুরি যদি আমার গায়েও এসে বসে তাহলেও অবাক হব না। ভেবে দেখো, সুরমাপিসী,

যার সে-ছুরি তৈরী করবার কথা তারই বুকে এসে সেই ছুরি বসবে। আমার দুঃখ কাকে বোঝাব?" লিলি প্রায় কেঁদে ফেলল।

নিজেকে আরো বেশি প্রকাশ করে ফেলবার ভয়ে বলল, "আমি এবার যাবো, সুরমাপিসী।"

সুরমার এতক্ষণে বুঝতে বাকি ছিল না যে লিলিকে সে যেজন্যে চেয়েছিল তার আশা বৃথা। তাই লিলিকে আর রাখতেও চেষ্টা করল না। বলল, "কিন্তু কেন হঠাৎ আমার কাছে এসেছিলে তা তো এখনো বলা হোলো না?"

"এ আলোচনার পরে সেকথা আর বলতে পারব না, সুরমাপিসী।" লিলি চোখ মুছে নিয়েছিল, কিন্তু একমাত্র চোখই তো কাঁদে না। তাই কণ্ঠেও তার ক্রন্দনের সুস্পষ্ট রেশ ছিল। বলল, "বেশ তো ছিলুম, কেন তুমি এসব কথা মনে করিয়ে দিলে, সুরমাপিসী?"

সুরমা কী বলবে ভেবে পেল না। লিলির বেদনায় সে অভিভূত হয়েছিল, যদিও তার সব কিছু সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। সমব্যথী হওয়া মানে যে ব্যথার ভাগ নেয়া নয়, ব্যথা যে ভাগ করবার বস্তু নয়, ভাগাভাগি যে শুধু সুখের বেলায় প্রযোজ্য, এত কথা সুরমা জানতোও না, বুঝতোও না। তাই আবার বলল, "আমি তো তোমার পিসী, আমাকে বলো কেন তুমি এসেছিলে আমার কাছে।" যদি কিছু সাহায্য করতে পারে। সুরমা এতক্ষণে প্রায় নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল।

লিলি বলল, "এসেছিলুম সদানন্দের সন্ধানে। শয়তান আমাকে কয়েক দিন থেকে এড়াতে চাইছে। কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব না। আমি নিজে নীচে নেমেছি, কাউকে উপরে থাকতে দেব না। সদানন্দকে তো নিশ্চয়ই নয়।" একটু থেমে বলল, "আমি এই জন্যে এসেছিলুম যে আমি জানি আর কিছুক্ষণের মধ্যে সদানন্দ আপনার কাছে আসবে। ওরই সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিলুম। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আলোচনা হোলো তার পরে আর পারব না ওর সঙ্গে কথা বলতে, অন্তত যে কথা ও বোঝে। তাই এবার আমি যাবো। ওকে দয়া করে

আমার কথা কিছু বলো না।” লিলি আর একটুও অপেক্ষা করল না। গেটের বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে উঠে বিদায় নিল।

সুরমা বুঝল যে লিলির সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। তাতে সে সুখী হোলো কি দুঃখিত হোলো নিজেই বুঝল না।

*

বীরেন সেদিন নগেন্দ্রনাথের স্বল্পালোকিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ তার গাড়িতে ওঠেনি। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অনেকক্ষণ, বীরেন নিজেই জানে না কতক্ষণ, সে এদিকে ওদিকে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছিল। বীরেন শুনেছিল যে তার মা কাছাকাছি কোনো মন্দিরে গেছেন পুজো দিতে। হয়তো সুরেনের জন্যে। হয়তো বা বীরেনের জন্যেও। এক সময়ে বীরেন এমন চিন্তায় বিরক্ত, এমনকি ক্রুদ্ধ, হোতো। কিন্তু সেদিন যেন তার মনে হোলো যে কেউ তার হয়ে পুজো দিলে তার শান্তি হবে।

বীরেন জানতো না কোথায় কোন মন্দির, কোথায়—তার মা-র কথা সে ইতিমধ্যে বিস্মৃত হয়েছিল—কোথায় কে কোন অস্তিত্বহীন দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছিল। শুধু তাই নয়, বীরেন ঈশ্বরের কথাই প্রায় ভুলে ছিল। সে তার নিজের গাড়ি উপেক্ষা করে হেঁটে চলছিল শুধু, শুধু, বীরেন নিজেই বলতে পারতো না কেন, শুধু হেঁটে চলবারই জন্যে। বীরেনের এমন অসহায় কখনো মনে হয়নি নিজেকে।

তবু সে চলছিল। উত্তরে কি দক্ষিণে তাও তার মনে হয়নি। রাস্তা তখন নির্জন। বাঁয়ের বড়ো রাস্তা দিয়ে কয়েক মিনিট পরে পরে একটা বাস্ যাচ্ছিল মহারবে, মহা সমারোহে, যেমন বাস্ সর্বদাই সব রাস্তায়ই যায়। কিছুক্ষণ পরে, কোথায় বীরেন জানে না, সে আর কোনো শব্দ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। কোনো একটা ভাঙা পুলের ধারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল। নীচে হয়তো কোনো ক্ষীণস্রোত খাল ছিল, হয়তো বা একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল। বীরেনের কাছে এ দুয়ে কিছুমাত্র

প্রভেদ ছিল না। সে শুধু শুনছিল তার চতুর্দিকের গভীর নৈঃশব্দ্যমন্দ্র। যেন মন্ত্রধ্বনি কোন সিদ্ধ উপাসকের।

বীরেন জানতে চাইল না হরি আছে কি নেই। হরিনাম আছে, এইটেই তার কাছে যথেষ্ট মনে হোলো।

দূর থেকে বীরেন কোনো একটা মন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনছিল। এধ্বনি, বীরেনের মনে হোলো, এ পৃথিবীর নয়। শুধু তাই নয়, বীরেনের মনে হোলো ওই ঘণ্টাধ্বনিতে পৃথিবীর সব প্রশ্নের সব জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর নিহিত আছে। যা কিছু দ্বিধা ও সন্দেহ বীরেনের মনকে এতদিন ধরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে, এক মুহূর্তে তার সব কিছু যেন ভেসে গেল। বীরেনের সংশয়ক্লিষ্ট চিত্ত নিমেষে এমন এক পরম প্রশান্তির আস্বাদ লাভ করল যে তার পারিপার্শ্বিকের সকল সাফল্য সকল ব্যর্থতা বীরেনের কাছে সমান অর্থহীন বলে মনে হোলো। যে হৃদয় এতকাল সহস্র সমস্যার লক্ষ কণ্টকে আকীর্ণ ছিল তা এই অনির্বচনীয় মুহূর্তে এমন অবর্ণনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হোলো যে বীরেন তখন সামান্যতম সচেতন চেষ্টা এমনকি ইচ্ছা ব্যতিরেকে সেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। মন্দিরের শঙ্খ আর ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দিকের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ করে দিয়ে বীরেনের কানে এমন সুমধুর ধারায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকল যে তার সমস্ত চিত্ত সমস্ত সত্তা এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসে আপ্লুত হয়ে গেল। হৃদয় তার কানায় কানায় ভরে উঠল। নিজেরই অজ্ঞাতে সে মন্দিরের একেবারে কাছে এসে পড়েছিল, তার মন তখনো মন্দিরের মহাসঙ্গীতে আবিষ্ট।

আলো ছিল শুধু মন্দিরের ভিতরে। সে আলোতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে ছিল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করতে বীরেন সাহস পায়নি। অত আলো সইবে কি? মনে তখনো দ্বিধা ছিল।

হঠাৎ, বীরেন ভালো দেখতে পেল না, মন্দির থেকে কে একজন বেরিয়ে এলেন। বীরেন তাঁকে দেখতে পায়নি, কিন্তু বীরেনকে তিনি দেখেছেন।

"কী রে? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে যা। তিনি ডাকছেন,

শুনতে পাসনি বুঝি? না কি অভিমান হয়েছে?" নারীকণ্ঠ। সে কণ্ঠের শুধু কথা নয়, স্নেহসিক্ত হাসিও বীরেন শুনল। কিন্তু চমকে উঠল না। যেন সে মুহূর্তে কোনো কিছুই অসম্ভব ছিল না। যেন সে কণ্ঠে 'তুই' বলে সম্বোধনই একান্ত স্বাভাবিক।

বীরেন তবু বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

অদৃশ্য কণ্ঠ যেন দূরে সরে যেতে যেতে বলল, "হেসে বাঁচিনে। মায়ের উপর বুঝি ছেলের রাগ করতে আছে? না কি ছেলে রাগ করলেই মাও রেগে থাকেন? হা—হা।" হাসিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার রেশ রয়ে গেল বীরেনের কানে, বীরেনের মনে। তার সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওই একটু হাসিতে, ওই ক'টা কথায়।

বীরেনের ক্লান্ত, অবসন্ন অন্তর তখন এইরকম একটি স্পর্শের প্রতীক্ষা করছিল। আর সংগ্রাম নয়, এবার তার শান্তি চাই।

তার পরে কী হয়েছিল বীরেন নিজেই জানে না। সাধারণত আমাদের মনের দুটো পৃথক অংশ আছে। একটা অংশ কাজ করে, আরেকটা অংশ দর্শক হয়ে তা দেখে, বিচার করে, অনুমোদন করে, প্রতিবাদ করে। কিন্তু কখনো জীবনে এমন এক একটা অভিজ্ঞতা আসে যখন সেই দুটো পৃথক সত্তা আর পৃথক থাকে না। এক হয়ে যায়। তখন আমরা যা করি তার ছবি নেবার জন্যে, বর্ণনা করবার জন্যে, বিচার-বিশ্লেষণ করবার জন্যে সেই দর্শকের অংশ আর কাজ করে না। দর্শক বা বিচারক তখন অন্যতর সত্তায় লুপ্ত হয়ে যায়। তখনকার কাজের জন্যে আমরা পুরোপুরি দায়ী নই। তার জন্যে নিজের কাছে জবাবদিহি করবার না থাকে শক্তি, না প্রয়োজন। বাইরের কারো কাছে তো নিশ্চয়ই নয়। বস্তুত, সমস্ত বাইরেটাই তখন একান্ত অবাস্তব বলে মনে হয়। সেখানকার প্রশ্ন তখন অর্থহীন। কে কর্ণপাত করবে ওই সব বাজে প্রশ্নে যখন সে তার নিজের প্রশ্নের চরম উত্তর লাভ করে ধন্য হয়েছে? কে খেলবে ওই সংসারের খেলা যখন সে বিশ্বলীলায় মেতেছে? কে শুনতে যাবে ওদের কথা যখন তার কানে নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে ওই মন্দিরের মহাসঙ্গীত?

বীরেনের তাই হোলো।

বীরেন মন্দিরে প্রবেশ করল, না করে পারল না।

সে মুহূর্তে বীরেনের সমস্ত বিশ্ব ওই মন্দিরে নিবদ্ধ হোলো। যা কিছু বিক্ষিপ্ত ছিল তা সজ্জিত হোলো। যা কিছু আকারশূন্য, ছন্দোহীন ছিল, তা রূপ পেল, সুর পেল। যে অস্তিত্ব চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল তা কে যেন এসে নিমেষে অদৃশ্য হস্তে অসীম নৈপুণ্যে নিবিড় স্নেহে গুছিয়ে দিল। যে জিজ্ঞাসা এতদিন কেঁদে মরেছে তা যেন মীমাংসার কোল পেল।

ওই কণ্ঠ ঠিকই বলেছিল, মা রাগ করেননি ছেলের উপর। বীরেনই বোকা ছেলের মতো মার উপর রাগ করে মুখ ফিরিয়ে ছিল। মুখ ফিরিয়ে মাকে দেখতে পায়নি বলে আরো রাগ করেছে।

বোকা ছেলে!

*

সদানন্দ সেদিন আসেনি সুরমার কাছে। সুরমা অপেক্ষা করেছিল।

অপেক্ষার কারণ ছিল। লিলি ভূতপূর্ব কম্যুনিস্টদের বর্তমান অসংলগ্নতার বিবরণ দিয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেছিল যে অন্যান্য রাজনীতিক কর্মীদের অনুরূপ অশান্তি হয় না। বলেছিল, তারা জীবনে রাজনীতি ও অন্যান্য কাজকর্মে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। রাজনীতির জন্যে তাদের আর সব কিছু বিসর্জন দিতে হয় না। এমনকি রাজনীতি পরিহার করেও তারা সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। সুরমা সদানন্দের কাছে জানতে চাইবে সেই সঙ্গতির সন্ধান।

সুযোগ ঘটল দিন কয়েক পরে। সদানন্দ একদিন এলো।

কিন্তু সদানন্দ এমন শিশুর মতো উত্তেজিত ছিল যে সুরমা অনেক ক্ষণ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

সদানন্দ এসেই, সুরমার বসবারও আগে, সোফার উপর বসে পড়ল। সোফাটা তার অনতিলঘু বপুর তলায় অনেকখানি নুয়ে পড়ল। বিশেষ করে অমন হঠাৎ বসে পড়ায়।

সুরমা পাখাটা খুলে দিয়ে নিজে উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসে বলল, “কী হয়েছে মিস্টার ঘোষ? আপনাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।”

সদানন্দের তখনো নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “একটু বসতে দিন, মিসেস চ্যাটার্জি। এক পেয়ালা চায়ের আদেশ করুন।”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,” বলে সুরমা চায়ের কথা বলতে উঠে গেল। তখনো ভাবতে থাকল, কী হয়েছে সদানন্দের? ও তো সর্বদা উচ্ছল, সর্বদা আত্মপ্রচারে তন্ময়। সব সময় খুশি, সব সময় তৃপ্ত। ও তো সেই ধরণের লোক যারা বেশি খায়, বেশি ঘুমোয়। অল্প ভাবে, অল্প ভোগে। হঠাৎ সদানন্দের এত দুশ্চিন্তা এলো কোথা থেকে? সুরমা কিছুতেই বুঝতে পারল না।

চায়ের কথা বলে ফিরে এসে সুরমা দেখল সদানন্দ হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে। সত্যি সে চিন্তিত।

আর পারে না সুরমা। তার নিজেরই যেন যথেষ্ট চিন্তা নেই। তবু, বলতে হোলো, “কী হয়েছে, মিস্টার ঘোষ? মাথা ধরেছে বুঝি?”

“ধরেনি। মাথা কাটা গেছে।” সদানন্দ মুখ না তুলেই উত্তর দিল। তার ভঙ্গিটা সর্বদাই একটু নাটকীয়। কিন্তু সাধারণত তাতে বীর-রসেরই প্রাধান্য থাকে। কিন্তু আজ এ কী হোলো? সুরমা কিছু বুঝল না, তাই কিছু বলল না। এতক্ষণে সে বুঝে গিয়েছিল যে যেজন্যে সে সেদিন লিলি চলে যাওয়ার পরে সদানন্দের জন্যে অপেক্ষা করেছিল তা একেবারেই নিরর্থক।

সদানন্দই মুখ খুলল। বলল, “সুরমা দেবী, আজ বুঝতে পারলুম।”

কী বুঝতে পারলেন তা কিন্তু বললেন না। তাই সুরমাকেই প্রশ্নটা করতে হোলো।

সদানন্দ বলল, “আজ বুঝতে পারলুম আমি কোথায় এসে পৌঁছেছি।”

এত রহস্য সুরমার ভালো লাগছিল না। হেসে বলল, “কোথায় আবার? আমার বাড়িতে এসেছেন, মিস্টার ঘোষ।”

সদানন্দ আবার শিরে করাঘাত করে বলল, "হায়রে, তাই যদি সত্য হোতো! যদি সত্যি আপনার বাড়িতে পৌঁছে ঝুলি নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারতুম!"

সুরমা হেঁয়ালি উপেক্ষা করে বলল, "বসুন না, কী হয়েছে?"

"আমার হার হয়েছে, সুরমা দেবী, আমার হার হয়েছে।" সদানন্দ এবারে সুযোগ পেল তার স্বাভাবিক কণ্ঠে নিজের কথা বলবার। "আজ বিকেলে বর্ধমান গিয়েছিলুম।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করল, "সভা ছিল বুঝি? না কি কোনো কিছুর জয়ন্তী?"

"জয়ন্তী নয়, সুরমা দেবী; পরাজয়ন্তী। এবং তা আমার।"

অন্য সময় হলে সুরমা সদানন্দের এসব কথায় না হেসে পারতো না। ওর স্বভাবই সামান্য বর্ণনাকে বক্তৃতার আকার দেয়া, সামান্য ঘটনাকে প্রলয়ের। কিন্তু এখন ওই পরিচিত নাটকীয়তার তলায় সুরমা অপরিচিত একটা সুরের আভাস পেল। সেটা ঠিক হাস্যকর নয়। বরং বিপরীত। বিদূষকের কান্না নায়িকা-র কান্নার চেয়ে মর্মন্তুদ, কেননা সেটা অপ্রত্যাশিত।

সুরমা এবারে সমবেদনারই সুরে বলল, "কী হয়েছে বলুন না।"

"বর্ধমানে আজ বিকালে সভা ছিল। দুটো স্টেশন আগে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে আমার কামরায় উঠে এসে বলল, 'আজ আর মিটিঙে গিয়ে কাজ নেই, সার। একটু গোলমাল অ্যাপ্রেহেন্ড করছি। তাই আগে থেকে আপনাকে বলতে এলুম।' কামরায় আর কেউ ছিল না। আমি তো রেগে আগুন। সাত দিন আগে থেকে সভা ডাকা হয়েছে। সরকারী সভা নয়, কন্‌গ্রেস পার্টির সভা। ডিস্ট্রিক্ট কন্‌গ্রেসকে জানানো হয়েছে, তারা সব ব্যবস্থা করেছে। নিশ্চয়ই মাঠে এখন লোকে লোকারণ্য হয়েছে। আর আমি সেখানে যাব না? সে হতেই পারে না। আমি ডি. এম.কে বললুম, আমি তো মিনিস্টার হিসাবে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি কন্‌গ্রেসম্যান হিসাবে। সেখানে আমরা জনতাকে ভয় করিনে। জনতার সঙ্গে সেখানে আমরা এক। ডি. এম.কে বললুম সেকথা।"

সুরমা বলল, "বর্ধমানে তো এখন গুপ্ত আছে, তাই না? কী বলে গুপ্ত সেকথা শুনে?"

"কী আবার বলবে? ওদের যা মামুলি বুলি। বললে, 'তাহলেও সার, আপনার সিকিউরিটির ভার আমাদের উপর। আমি যেতে অ্যাডভাইস করতে পারব না।' আমি বললুম, 'আপনার উপদেশে আমার দরকার নেই।' গুপ্ত বলল, 'আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি।' আমার তখন রোখ চেপে গেছে। বর্ধমান এক সময়ে আমার কনস্টিট্যুয়েন্সি ছিল। সেখান থেকে আমি তিন তিনবার অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছি। একবার তো ওখানে যেতেও পারিনি, কেননা জেলে ছিলুম। সেখানে আজ গিয়ে আমি একটা কন্‌গ্রেস মীটিঙে বক্তৃতা দিতে পারব না? হতেই পারে না। পুরানো আই. সি. এস. অফিসারদের এই সিকিউরিটি নিয়ে বাড়াবাড়ি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গুপ্তকে বললুম, 'আমি যাবই।' বললুম ওর সঙ্গে যাবার দরকার নেই। মীটিঙ হবে, এবং আমি সেখানে বলব, যেমন ঘোষণা করা হয়েছে।"

"তারপর?" সুরমা সদানন্দের সাহসিকতায় সত্যি যেন একটু গর্ব অনুভব করছিল। যদিও সদানন্দের নিজের বর্ণনায় গর্বের বাষ্পমাত্র ছিল না।

সদানন্দ নিশ্বাস নিয়ে বলল, "তারপর? তারপর আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। গুপ্তর সঙ্গে আমার এক পুরানো কন্‌গ্রেসী বন্ধুও এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তার গাড়িটা চেয়ে নিলুম। তার ড্রাইভারকে পর্যন্ত নিলুম না। নিজে, একা রওনা হলুম সেই সভার দিকে।"

এতক্ষণ পর্যন্ত সদানন্দ দর্পের সঙ্গে না হলেও বেশ জোরে কথা বলছিল; এবার গলার স্বরটা অনেক নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "হাতে বেশ খানিকটা সময় ছিল। তবু মানসিক উত্তেজনাবশে বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলুম। সভার জায়গাটা থেকে অনেকটা দূরে একটা জায়গায় পেঁছে হঠাৎ আমার গাড়ির স্পীড আপনি যেন কমে গেল। আমার আর কোনো গুণ না থাক, সাহস ছিল বরাবর। জীবনে এই প্রথম সন্দেহ হোলো সত্যি আমি সাহসী কিনা। মনকে অনেক করে

বোঝালুম, একদিন বিদেশী পুলিশের গুলিকে ভয় পাইনি। আজ তো এরা আমার আপনার লোক। এদের ভয় পাব? এদের জন্যে আমার পার্টি কী না করেছে? স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আমি নিজেও সেই স্বাধীনতা-আন্দোলনে একেবারে অকর্মণ্য থাকিনি। আমি এদের চিনি, এরা আমায় চেনে। একদিন এরা আমার কথায় জেলে গেছে। আমার নির্দেশে সহস্র অত্যাচার সত্ত্বেও বিদেশী সরকারকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেছে। আজ কি এরা সে সব ভুলে গেছে? এত অকৃতজ্ঞ এরা? হতেই পারে না। নিজেকে বারবার এই কথাগুলি বলে মনে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু তবু পথের পাশে একবার গাড়িটা থামিয়ে কন্‌গ্রেস পতাকাটা খুলে ফেলে পকেটে পুরে রাখলুম।"

সদানন্দ সত্যি পকেট থেকে পতাকাটা বের করে সুরমার সামনে টেবিলটার উপর রাখল। পকেটে থেকে ওটায় ভাঁজ পড়েছিল অনেকগুলি। সস্নেহে, সযত্নে সেই ভাঁজগুলি সদানন্দ সোজা করতে লাগল হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। পরিত্যক্ত প্রেমিক যেমন নিষ্ঠুরা প্রণয়িণীর পুরানো চিঠিগুলি সান্ত্বনাহীন বেদনার সঙ্গে বারবার সযত্নে পড়ে আর তুলে রাখে। মা যেমন রুগ্ন শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে মুহূর্তে সদানন্দকে নিতান্ত রুগ্ন, দুর্বল ও অসহায় মনে হোলো। সুরমার দৃষ্টিতে অনুকম্পা ছিল।

"সুরমাদেবী, যে পতাকার জন্যে একদিন এত লোক প্রাণ দিয়েছে, আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলুম, আজ আমার প্রাণরক্ষার জন্যে সেই পতাকাই আমাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে! কিছুতেই সাহস পেলুম না সগর্বে সেই জনতার সম্মুখীন হতে।"

সুরমা সদানন্দের আত্মধিক্কারে ছেদ টানবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল, তার খবরের কাগজে পড়া পরিভাষায়, "মব্ বুঝি খুব হস্টাইল হয়ে পড়েছিল?"

'মব্' কথাটা সদানন্দের আজো ভালো লাগে না। তার মনে আছে কতবার সে সুসংহত শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে গেছে, পুলিশ তার উপর বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে—পর দিন খবরের কাগজে পুলিশের ইস্তাহারে বলা হয়েছে 'জনতা অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠাতে পুলিশ

দুবার মৃদু যষ্টিচালনা করতে বাধ্য হয়।' সদানন্দ সেদিন সেই 'হস্টাইল মব্'-এর গর্বিত অগ্রভাগে ছিল। 'ক্ষিপ্ত জনতা'—এই বর্ণনাটার প্রতি তাই তার ব্যক্তিগত ঘৃণা ছিল। প্রতিপক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হলেও কথাগুলি সদানন্দের ভালো লাগল না।

একটু থেমে সুরমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, "এর আগে যতবার জনতা দেখেছি আমি তখন তার অংশ ছিলুম। তাই ভালো করে কখনো জানিনি জনতার স্বরূপ, ভালো করে কখনো শুনিনি তার কণ্ঠ। এবারে দূর থেকে জনতা দেখেছি, তার স্বর শুনেছি। প্রথম সেই জনতা দৃষ্টি-পথে ও শ্রুতিপথে আসতেই বুঝতে পারলুম, আমি ওই জনতার অংশ নই। আমি ওই জনতার নেতা নই। ওদের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মিল নেই। আমি ওদের চিনিনে, ওরা আমাকে চেনে না। আমি ওদের ভয় করি, ওরা আমাকে ঘৃণা করে।"

"তবু গেলেন বুঝি ওদের সামনে?" সুরমা জানতে চাইল।

"গেলুম। একটা মর্বিড কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। ফ্ল্যাগটা আগেই খুলে নিয়েছিলুম। এবারে মাথার টুপিটাও খুলে পকেটে রাখলুম। যাতে কেউ না সদানন্দ ঘোষকে চিনতে পারে। ভাবলুম, একবার শুধু ওদের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রাইভ করে যাব, দেখব ওরা সত্যি কত ভয়ংকর, শুনব ওরা সত্যি আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবে।"

সদানন্দের গলায় এমন মর্মস্পর্শী আবেদন সুরমা শোনেনি এর আগে। জিজ্ঞাসা করল, "কী দেখলেন বলুন না?"

"সে আর বলবার নয়, সুরমা দেবী," সদানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি নিজেও জীবনে আন্দোলন্ অ্যাজিটেশন কিছু কম করিনি। সাইমনকে ফিরে যেতে বলেছি, প্রিন্স অব ওয়েলসকে কালো নিশান দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। সেই আন্দোলনের সময় দেখেছি জনতার চিত্তে ইংরেজের বিরুদ্ধে কী অপরিসীম ক্ষোভ, কী সাংঘাতিক উত্তেজনা সঞ্চিত ছিল।

"আর আজ দেখলুম ওই ভয়াবহ জনতার চেহারা। নিজের দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে, গতকালের নেতাদের বিরুদ্ধে—যারা ওদের জন্যে কী

না করেছে?—তাদের সমস্ত সেবা যে ওরা এমন দু'দিনে ভুলে গিয়ে আজই আমাদের অস্বীকার করবে, প্রত্যাখ্যান করবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমাকে ওরা কেউ চিনতে পারেনি, কিন্তু চিনতে পারলে কী যে হোতো ভাবতেও ভয় লাগছে।"

সুরমার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল সদানন্দের জন্যে। সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, "সত্যি, জনতার লয়্যালটি বলে কোনো বোধ নেই।"

কিন্তু সদানন্দ রাজনীতিক কর্মী। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে একমত না হলেও সে বোঝে তাদের সংগ্রামলিপ্সা। সে নিজেও এ লিপ্সার ঊর্ধ্বে নয়। বস্তুত, সদানন্দের জীবন রাইটার্স বিল্ডিংসে এখন এমন একঘেয়ে মনে হয় তো এই জন্যেই যে এতে সংগ্রাম নেই। আজ সদানন্দ সেই পুরানো দিনের স্বাদ একটু ফিরে পেয়েছে। তাই সে এতক্ষণের নৈরাশ্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। আবার তার পরিচিত বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, "না, সুরমা দেবী, ওটা একটু ওভারসিমপ্লিফিকেশন হোলো। পলিটিক্সে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো পদার্থ নেই, ওটা আশা করাই মূঢ়তা। যুদ্ধের পরে চার্চিলের কী হলো? ট্রট্স্কি কোথায় গেলেন? আমাদের নিজেদেরই দলে তো নরীম্যান, ভুলাভাই দেশাইর অবস্থা স্বচক্ষে দেখলুম। লয়্যালটি আছে হিন্দু বিয়েতে, স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে আনুগত্য অক্ষুণ্ণ। তাছাড়া আর কোথাও ও বস্তু নেই।"

সুরমা বুঝতে পারল না সদানন্দের সঙ্গে কোথায় তার মতভেদ। বলল, "আমিও তো তাই বলছিলুম। লয়্যালটি নেই।"

সদানন্দ ঘাড় নেড়ে বলল, "ঠিক তাই। নেই। কিন্তু আমি বলি কি, থাকা উচিতও নয়।" সদানন্দ ইতিমধ্যে তার নিজের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। সে বিমূর্ত একটা রাজনীতিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করছিল, বলল, "রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নেই। ব্যক্তিজীবনে বৈধব্যের দুঃখবরণ আর আনুগত্য যতই স্বার্থপর পুরুষদের প্রশংসা অর্জন করুক না কেন, কোনো সমাজ বা জাতি দীর্ঘকাল বিধবা হয়ে থাকতে পারে না। জাতির কালকের স্বামী যদি আজ স্বামিত্বের দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে জাতি অন্য স্বামীকে গ্রহণ করবেই। কেননা জাতি অনন্তযৌবন। তার জরা নেই। সে কেন অপেক্ষা করে বসে

থাকবে কৃতজ্ঞতার পুণ্যের জন্যে? অবসন্ন কন্‌গ্রেস যদি বাহুবলে তার নেতৃত্ব বজায় না রাখতে পারে, তবে জাতি কি বসে থাকবে কন্‌গ্রেসের শিয়রে? হিন্দু স্ত্রী যেমন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীর শিয়রে জেগে থাকে? পলিটিক্সে ওটা হয় না, সুরমা দেবী।"

সুরমা বিপদে পড়ল। সে এতক্ষণ সদানন্দের সব কথায় সস্নেহে সমর্থন জানিয়ে আসছিল। এবারে কী করবে? যদি বলে সত্যি পলিটিক্সে কৃতজ্ঞতা নেই, এবং থাকা উচিত নয়, তাহলে সদানন্দ কী মনে করবে? সদানন্দ কি কালকের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামী—আজ যার একমাত্র ভরসা হিন্দু স্ত্রীর অভিশপ্ত আনুগত্য? না কি আজকের স্বামী হবার যোগ্যতা তার আছে? তাহলে সে যায়নি কেন এসভায়? কেন পালিয়ে এসেছে? সুরমা বলবার কিছু না পেয়ে চুপ করে রইল।

সদানন্দ নিজেই পকেট থেকে গান্ধীটুপীটা বের করে আশারিক্ত অসহায় কণ্ঠে স্বগতোক্তি করল, "আমরা কালকের নেতা, সুরমা দেবী। আজ স্বেচ্ছায় কেউ আমাদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবে না।" সদানন্দ এত বলে চুপ করল।

চা অনেকক্ষণ আগে এসে জুড়িয়ে গেছে। দুজনের কারোই সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সদানন্দ আবার বসে পড়ে সুরমার দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে বলল, "একটু গলা জুড়োবার জন্যে চা চেয়েছিলুম। এবারে জ্বালা জুড়োবার জন্যে একটু অন্য কিছু চাইব, সুরমা দেবী, যদি কিছু মনে না করেন।"

সুরমা বুঝল। "এক্ষনি আনছি," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে একটা গ্লাস আর ডিকেণ্টরটা সদানন্দের সামনে রাখল।

সদানন্দ আপত্তি জানাল। পরে সুরমাকে আরেকটা গ্লাস আনতেই হোলো।

সদানন্দ এবস্তুতে অভ্যস্ত নয়। তাই প্রায় এর আবির্ভাবেই তার উপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। তাই হোলো। সদানন্দ একটা খেয়েই আবার তার স্বাভাবিক সদর্প কণ্ঠ ফিরে পেল। বলল, "আমি কালকের লোক, না? আমার দিন ফুরিয়ে গেছে, তাই নয়?"

সুরমা এই স্বগতোক্তির উত্তরে বলল, "বারে, আপনার কথা শুনলে মনে হবে আমিই যেন এই অভিযোগ করেছি আপনার বিরুদ্ধে!"

সদানন্দ সুরমার অনুযোগ উপেক্ষা করে বলল, "কিন্তু আমরা ছাড়ব না। সারা জীবন সংগ্রাম করে যে স্বাধীনতা এনেছি তার ফল স্বেচ্ছায় অপরের হাতে তুলে দেব না। এত দিন এত কষ্ট সহ্য করে যে ক্ষমতার আসনে পৌঁছেছি তা আঁকড়ে থাকব প্রাণপণ।"

এতক্ষণ সদানন্দের জন্যে সুরমার করুণার অন্ত ছিল না। এবারে সদানন্দের নগ্ন ক্ষমতালোভ প্রত্যক্ষ করে সুরমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। রাজনীতির আলোচনায় তার অধিকার নেই, তবু না বলে পারল না, "সে কী কথা, মিস্টার ঘোষ? জোর করে কি কারো শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায়?"

সদানন্দ এতক্ষণে আরো উত্তেজিত হয়েছে। বলল, "কিন্তু ওরা যে আমাদের জোর করে সরিয়ে দিতে চাইছে। ইংরেজের জোরের কাছে নতিস্বীকার করিনি। ওদের জোরও মেনে নেব না।"

সুরমার মনে পড়ল লিলির মুখে সেই ছুরিকার আবির্ভাবের কথা। সদানন্দের অভিযোগ তাই অস্বীকার করতে পারল না। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, "কিন্তু সত্যি কি আপনারা গতকালের লোক? বর্তমানকে কি আপনাদের কিছুই দেবার নেই?"

সদানন্দের নিজেরই মনে সন্দেহ ছিল। তাই স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, বলল, "গত পাঁচ বছরে কি কিছুই দিইনি?"

"তবে ওরা আপনাদের চায় না কেন?" এমন সরল প্রশ্ন সুরমাই জিজ্ঞাসা করতে পারতো, কেননা রাজনীতির সঙ্গে তার যোগ নেই।

সদানন্দ বলল, "ওরা বোঝে না কত বাধার মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। ওরা শুধু মনে করে বসে আছে কবে আমরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আর তাই আশা করে বসে আছে।"

এবারে সুরমা না হেসে পারল না। বলল, "সত্যি, ভারি অন্যায় তো ওদের!"

সদানন্দ হাসিতে যোগ দিল না। বলল, "কিন্তু আমরাই একদিন

ওদের চাইতে শিখিয়েছিলুম যা আজ ওরা না পেয়ে আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে।"

"তা বুঝি পাবারই নয়? যখন সেসব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তখনই কি জানতেন যে ওগুলো অসম্ভব? তাহলে—" আবার সেই অর্বাচীন প্রশ্ন।

এবার সদানন্দ যেন ভেঙে পড়ল। বলল, "অসম্ভব কিনা জানিনে, সুরমা দেবী। গত পাঁচ বছরে শুধু এইটুকু বুঝেছি, আপনার কাছে কবুল করছি, তা দেবার সাধ্য আমাদের নেই। একদিন সেবার যে উন্মাদনা ছিল আজ তা নেই। আজ আমরা জিরোতে চাই, আর সবাইকে কাজ করতে বলি, এবং কিছু না হলে দেশের লোকের অনুৎসাহকে গাল দিই। কিন্তু উৎসাহ তো একদিন ছিল। কোথায় তা উবে গেল স্বাধীনতার পরদিন? কে দায়ী এর জন্যে?"

সদানন্দ শুধু কতগুলি প্রশ্ন করে গেল। একটারও উত্তর দিল না। সুরমা কিছু না বলে অপেক্ষা করাই শ্রেয় জ্ঞান করল।

কিন্তু উত্তরের সময় আসেনি। সদানন্দের প্রশ্নই আরো অনেক বাকি ছিল। বলল, "আমরা পারব কী করে? আমাদের সেই শক্তি কই নেতৃত্বের? আমরা আজ পর্যন্ত কোনো একটা দিকে এক ইঞ্চি এগুতে পারলুম না। আজো বড়াই করে চলেছি দেশীয় রাজ্যের তাসের ঘর ভেঙে। আজো শুধু বলি, আমরা আইন আর শৃংখলা বজায় রেখেছি। আর কিছু বলবার নেই। অথচ পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেল। কাটল শুধু জোড়াতালি দিয়ে। আমাদের দিয়ে হবে না, সুরমা দেবী, আমরা ফুরিয়ে গেছি।" ওই স্থূলকায় লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল।

সুরমার আবার মায়া হোলো। সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, "আপনি এখন বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এত খেটে। বরং কিছু দিন বিশ্রাম নিন। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বরং বাইরে কোথাও চলে যান। ওরা যা করবার করুক।"

সদানন্দ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "চলে যাবো কোথায়,

সুরমা দেবী? মন্ত্রিত্ব ছাড়া আর কোন পরিচয় এখন আমাদের অবশিষ্ট আছে? গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ ওড়ে, আগে উর্দিপরা চাপরাশী চলে, তাই লোকে জানে মিনিস্টার সদানন্দ ঘোষ আসছে। আজ ক্যাবিনেট ছেড়ে দিয়ে কাল ট্রামে উঠলে কে চিনবে আমায়? কেউ একটু সরে দাঁড়াবে? কেউ একটু দাঁড়াবার জায়গা ছেড়ে দেবে? কেউ না। একেবারে হারিয়ে যাবো। মন্ত্রিত্বের এই শেষ খড়কুটোটুকু ছেড়ে দিলে একেবারে ডুবে তলিয়ে যাবো। সে অবস্থা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে বলছেন, সুরমা দেবী?"

সুরমার এই নিভে-যাওয়া আগুনের ভস্মস্তূপ দেখে কষ্ট হোলো। কিন্তু আবার বোকার মতো জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "বারে, আপনিই বলছেন আপনি গতকালের লোক, আপনিই বলছেন আজ আপনাদের কাজ করবার মতো শক্তি নেই, আজ আপনাদের কিছু দেবার নেই; অথচ ক্ষমতার আসন আঁকড়ে থাকবেন। তাহলে আগামী কালের হবে কী?"

এমন স্পষ্ট প্রশ্ন সদানন্দের ভালো লাগল না। সময় নেবার জন্যেই এক চুমুক খেয়ে হঠাৎ সশব্দে গ্লাসটা রেখে সদানন্দ বাঙলা ইংরেজিতে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আমরা গতকালের লোক, না? আগামী-কালের কী হবে, তাই না? Tomorrow does not belong to us, we will mortgage it, we will sell it!" সদানন্দের স্বরে একটা অস্বাভাবিক হিংস্রতা ছিল যা শুনে সুরমা ভয় পেল। চুপ করে বসে রইল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। সদানন্দেরও সাহস ছিল না সুরমার দিকে তাকাবার।

পরে এক সময়ে সুরমা নিঃশব্দ চরণে বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরে চলে গেল। সদানন্দ যখন বুঝল সে একা, সে-ও আর কিছু না বলে চলে গেল। সে জানতো সুরমা আর ফিরবে না।

যেমন ফিরবে না গতকাল।

*

সুরমা একা একা অন্ধকারে শোবার ঘরে কতক্ষণ শুয়েছিল খেয়াল ছিল না। যতই মর্মান্তিক রকম আস্তে হোক, মিনিট আর ঘণ্টাগুলির জলবিন্দু প্রতি মুহূর্তে অজানা কোন নিঃসময়ের সমুদ্রে গিয়ে পড়ছিল। মাঝে সুরমা একবার শুধু রান্নাঘরে খবর পাঠিয়েছিল যে সে আজ রাত্রে খাবে না। মেমসায়েব বাইরে ডিনারেও যাবেন না, অথচ বাড়িতেও খাবেন না, এ নিয়ে ভৃত্যদের একজন দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে এনেছিল, কিন্তু সাহস পায়নি।

দুঃসহ এই সন্ধ্যাগুলি, যখন বাইরে কোথাও যাবার নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এমন সন্ধ্যার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু আজ? সুরমা ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়েছিল। ঘড়ির দিকে তাকায়নি একবারও। চারিদিকের কোলাহল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সুরমা শুধু একা জেগে তার বৃহৎ কোমল কণ্টক-শয্যায়। সুরমার নিজের অন্তরের অতি পরিচিত আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু তার শোনবার ছিল না।

একবার সুরমা কান পাতল বাইরের একটা শব্দ শুনতে। গাড়ির শব্দটা দূর থেকে কাছে এলো। ক্রমে একেবারে গাড়ি-বারান্দায়। তার পর গ্যারাজের কাছে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বীরেন চেষ্টা করছিল কাউকে না জাগাতে। চলছিল, সন্তর্পণে, কোনো আলো না জেবলে, বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে পা টিপে টিপে। সে নিজে জানতো অনেক রাত হয়েছে। জানতো যে অফিস থেকে সোজা চলে গিয়েছিল, বাড়িতে কোনো খবর পর্যন্ত দেয়নি। এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, অন্তত গত কয়েক সপ্তাহে। কিন্তু সাধারণত এতে কিছু এসে যায় না। সুরমাও বাইরে থাকে, দেরি করে ফেরে। সুরমাই নিঃশব্দ চরণে এসে শোবার ঘরে ঢুকে দেখে বীরেন ঘুমিয়ে আছে। আজ বীরেন সেই অবস্থায় পড়েছে।

আশা করেছিল সুরমা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা এখনো ফেরেনি। দুটো সম্ভাবনার প্রতিই সে সমান উদাসীন ছিল। এখন তার একমাত্র বাসনা একা থাকা। একা? বীরেন আর একা নয়। একা সে এর আগে ছিল—যখন সে সপ্তাহে পাঁচ সন্ধ্যায় পার্টিতে যেতো। তখন

তার নিঃসঙ্গতার সীমা ছিল না। তখন সে গল্প করতো কত জনের সঙ্গে, তবু তার কান থাকতো তৃষিত। আর আজ? আজ তার সব নিঃসঙ্গতা ঘুচেছে। এখন নিশিদিন তার কানে যে সংগীত বর্ষিত হয় তা শুনে আর অন্য কিছু শুনতে চায় না। কারো স্বর নয়, কারো কথা নয়। এখন বীরেন তাই নেহাৎ নিরুপায় না হলে কথা বলে না। কথা বললে সেই সংগীত ব্যাহত হয়। বীরেনের সমস্ত চিত্ত তার নবলব্ধ সংগীতমাধুরীতে এমন ভরপুর হয়ে ছিল যে তার আর কিছু চাইবার ছিল না, আর কারো সঙ্গের প্রয়োজন ছিল না। যে সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছে, কাজ কী তার বাজে আমোদে? ঈশ্বরের সঙ্গে যার অভিসার, সে কোন দুঃখে সঙ্গ ভিক্ষা করে বেড়াবে এখানে ওখানে? কর্মক্ষেত্রে তাই বীরেনের আর প্রোমোশনের প্রয়োজন ছিল না। বাড়িতে সুরমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ একটা রকমের নিঃশব্দ নিরপেক্ষতায় এসে ঠেকেছিল। এই নিরপেক্ষতা বীরেনের মনঃপূত হয়েছিল। সুরমার মতের খবর বীরেন নেয়নি। এই সম্বন্ধটা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু বীরেন মনে মনে ঠিক করেছিল এটাতে অন্যায় কিছু নেই। বীরেন সুরমাকে কিছু বলে না, কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, সুরমা যা খুশি তাই করতে পারে, জবাবদিহির বালাই নেই; বিনিময়ে বীরেন নিজেও অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে। এর চেয়ে 'ফেয়ার', ন্যায়সংগত ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

কিন্তু সুরমা তো হাকিম নয়। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তার মাথাব্যথা অল্পই। একই বাড়িতে থেকে, স্বামীস্ত্রী বলে পরিচিত হয়ে, অপরিচিতের মতো বাস করবার এই ব্যবস্থা সুরমা নীরবে অনেক দিন সহ্য করেছে। বাইরের উত্তেজনায় ভিতরের নিঃসঙ্গতার ক্ষতিপূরণ খুঁজেছে। কেঁদেছে কখনো কখনো, কিন্তু ঝগড়া করেনি। সব আশা হারিয়েও আশা করেছে বীরেনের বর্তমান ঔদাসীন্য স্থায়ী হবে না। সুরমার কাছে সে আবার ফিরে আসবে। সুরমাকে সে আবার ভালোবাসবে, স্বামী যেমন করে স্ত্রীকে ভালোবাসে।

কিন্তু সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। তাই আজ যখন বীরেন চোরের মতো চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এলো, এসেও শোবার ঘরে এলো না, তখন

সুরমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। কিছুক্ষণ সুরমা শুয়ে থেকে নিদ্রার ভান করল,—যদি বীরেন এসে জাগায়, যেমন আগে সে জাগাতো। কিন্তু প্রতীক্ষা ব্যর্থ হোলো। জাগ্রতা সুরমাকে কেউ জাগাল না।

সুরমাকেই উঠতে হোলো। উঠে সে আলো জ্বালল। ঘড়িতে দেখল সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু বীরেন গেল কোথায়? ড্রেসিং রুমটা দেখল, ড্রয়িং রুমটা দেখল। বীরেন নেই। দ্বিতীয় ঘরটা থেকে ফেরবার পথে মাঝের পরিত্যক্ত ঘরটায় আলো জ্বালল, অমনি, বীরেনকে আশা করে নয়; ও ঘরটায় আজকাল কেউ পা দেয় না।

বীরেন সেই পুজোর ঘরেই বসে আছে। মেঝের উপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে।

আলো জ্বাললেও বীরেনের খেয়াল হতে সময় লাগল। তার চোখ খোলাতে সুরমাকে চটি দিয়ে শব্দ করতে হোলো। সুরমা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল যেখানে দরজার পাশে বীরেন একদিন দাঁড়িয়েছিল সুরমার পথ রোধ করে। বীরেন সেইখানে বসেছিল যেখানে সুরমা একদিন বসে কেঁদেছিল, বীরেনের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিল।

বীরেনের সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হোলো। যেন বলবার কিছু নেই। যেন বীরেনের রাত সাড়ে বারোটায় ওইখানেই বসে থাকবার কথা। যেন সুরমার কৌতূহলের কোনো কারণ নেই।

সুরমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "এখানে বসে ছিলে কেন?"

বীরেন বলল, "অমনি।"

"অমনি মানে?" সুরমার ক্ষোভ বাড়ল এই ঔদাসীন্যে।

"অমনি।" বীরেনের কণ্ঠে ক্রোধ কেন, কোনো অনুভূতিরই রেশ ছিল না। 'অমনি' ছাড়া আর কিছু বলেনি, কেননা আর কিছু বলবারই ছিল না। ওই ঠাকুরঘরে নির্জনে অন্ধকারে বসে থাকতে তার ভালো লাগছিল, আর কী কারণ থাকবে ওখানে বসবার? এবং এই কথাটা এতই সরল ও পরিষ্কার যে সুরমাকে তা সবিস্তারে বোঝাবার নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজন নেই।

সুরমা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে অন্য প্রশ্ন চেষ্টা করল, "কোথায় গিয়েছিলে যে ফিরতে এত রাত হোলো?"

অন্য সময় হলে একে অপরের গতিবিধিতে হস্তক্ষেপ না করবার অনুক্ত চুক্তির লংঘনে বীরেন বিরূপ হোতো। কিন্তু এখন তার মন অন্য কোনো লোকে বিচরণ করছিল যেখানে এসব ক্ষুদ্র বিবেচনার স্থান নেই। সমান নির্বিকার কণ্ঠে বীরেন তাই সুরমার দিকে না তাকিয়েই বলল, "এই একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। কলকাতার একটু বাইরে।" বরানগরের নামটা বীরেন বলল না, কেননা তাহলে সত্য অনুক্ত রেখে মিথ্যার ইঙ্গিত দেয়া হোতো। সুরমা মনে করতো বীরেন তার বাবার কাছে গিয়েছিল। ওটা মিথ্যা বলারই সামিল হোতো।

সুরমা লক্ষ্য করল যে বীরেন ঠিক কোথায় গিয়েছিল তা গোপন করা হয়েছে। তার ক্ষোভ এবার ক্রোধের পর্যায়ে উঠল। আবার তাই প্রথম প্রশ্নটা আরো জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "তারপর অন্ধকারে এই অপরিষ্কার ঘরটার মেঝেতে এসে বসেছিলে কেন? শোবার ঘরে আসোনি কেন?"

বীরেন আবার প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলল, "ঘুম পায়নি। তুমি শুয়ে পড়োগে। আমি একটু পরে শোবো।" এখনো বীরেন সুরমার দিকে তাকায়নি। কণ্ঠেও কোনো বিরক্তি প্রকাশ করেনি। সত্যি সে বিরক্ত হয়ওনি। শুধু আলোচনাটায় ছেদ টানতে চাইছিল। সে কোথায় গিয়েছিল, কেন দেরি হয়েছে, কেন এসে ঠাকুর-ঘরে বসে ছিল—এসবের একটি মাত্র উত্তর ছিল, এবং সে উত্তর এমনই ব্যক্তিগত যে কারো কাছে তা বলবার নয়। সুরমার কাছেও নয়। ভাষায় সেকথা প্রকাশ করলেও যেন তার পবিত্রতার হানি হবে। কথার ছোঁয়া লাগলে সে-ভাব যেন অশুচি হয়ে যাবে।

সুরমাকে আঘাত করল এই কথাটা যে বীরেন তার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকোতে চাইছে। সুরমাকে তাহলে বীরেন বিশ্বাস করে না? না কি, বীরেনের সত্য উত্তরটা এমন যা স্ত্রীকে বলবার উপায় নেই! কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই সুরমা স্মরণ করল ললিতার ইঙ্গিতটা।

কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার আগে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলে বলছ না কেন?"

"বললুম তো। বেড়াতে, কলকাতার একটু বাইরে।"

এবারে সুরমা আরো না রেগে পারল না। বলল, "ললিতা তাহলে ঠিকই বলেছিল।"

বীরেন ভালো করে সুরমার কথা শুনছিলই না। তাই বুঝতে পারেনি সুরমা কতটা উত্তেজিত হয়েছে। হেসে বলল, "কী বলেছিল ললিতা?"

"দ্যাট দেয়ার্'স্ এ উওম্যান সামহোয়্যার।" সুরমা ললিতার কথাটা ছুঁড়ে মারল।

বীরেন হো হো করে হেসে উঠল। "সত্যি? ললিতা তাই বলেছে বুঝি? হা—হা—"

বীরেনের চোখে ভেসে উঠল মহামায়ার ধ্যানস্থ মূর্তি। মহামায়া কি নারী? না দেবী? বিশেষ করে যখন তিনি ধ্যানে বসেন, আরতি করতে করতে যখন তাঁর হাত থেকে ঘণ্টাটা আস্তে পড়ে যায়, ধূপের ধোঁয়ায় যখন মনে হয় তিনি সদ্য আগুন থেকে উত্থিত হলেন, দেবতার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটি যখন ভক্তিতে আপনি নিমীলিত হয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, যখন তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ থেমে যায় আর ক্ষুদ্র ওই মন্দিরটি নীরব সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে—আহ্, চোখ মুদে ভাবতেও ভালো লাগে, মনে হয় মহামায়ার কৃপায় তাঁর পায়ের আরো একটু কাছে আসছি—সেই মহামায়া কি 'এ উওম্যান?' বীরেন ভাবল, কী সংকীর্ণ এই মেয়েদের কল্পনা! কী অন্তহীন আত্মম্ভরিতা—পুরুষের যেন নারী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তা থাকাই অসম্ভব! বীরেনের আবার হাসি পেল। আবার সে হাসল।

সুরমা আরো রেগে আরো চেঁচিয়ে বলল, "হাসিটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।"

বীরেন সুরমার এই সমস্ত ভয়ংকর অভিযোগে সামান্যতম গুরুত্ব আরোপ করছিল না। সুরমার ক্রোধের অন্তরালে যে স্বাভাবিক অভিমান ও অপরিসীম বেদনা ছিল, সেকথাও বীরেনের মনে হয়নি।

তার নিজের মন এমন অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল যে আর কারো মনে বেদনা আছে কি নেই তার খবর নেবার কথা বীরেনের মনেই হয়নি। মনে হলেও কথাটা হাঁসের গায়ে জলের মতো ভেসে যেতো। বীরেন ভাবতো, এরা যদি হাতের কাছে পেয়েও আমার আনন্দের অংশ না নেয়, যদি সংসারের ক্ষুদ্রতায় ডুবে থাকবে বলেই এরা প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে, যদি এরা একবার চোখ মেলে না দেখে যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যদি এরা একবার কান পেতে না শোনে যা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, যদি এরা একটু হাত বাড়িয়ে তাঁর চরণ না স্পর্শ করে যেখানে আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই,—তবে কে এদের বাঁচাবে সামান্য সুখ-দুঃখে বিচলিত হওয়া থেকে?

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভক্তকে মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন করেছে, এটাই তার প্রথম দৃষ্টান্ত নয়। এবং ইতিহাসে এটাই তার শেষ দৃষ্টান্ত হবে, সে আশাও বৃথা।

বীরেন তাই একান্ত অনুদ্বিগ্ন চিত্তে হাসতে হাসতে বলল, "ললিতা যখন এত গবেষণা করেছে আমার জীবন নিয়ে, তাহলে সে বাকি খবরগুলিও তোমাকে নিশ্চয়ই দিয়েছে বা দিতে পারবে। ওকেই না হয় জিজ্ঞাসা করো।"

বীরেন সেইখানেই আলোচনাটা শেষ করে দরজার কাছে এলো বেরুবে বলে। সুরমা বাধা দিতে সাহস করল না, কিন্তু লক্ষ্য করল যে, বীরেন এমনভাবে পাশ কাটিয়ে গেল যে বুঝতে বাকি রইল না বীরেন চেষ্টা করে সুরমার স্পর্শ এড়িয়ে গেল। সুরমার মন ক্ষোভে, অপমানে, অভিমানে, ক্রোধে ভরে উঠল। কিছু বলতে পারল না পর্যন্ত।

বাকিটা রাত দুটো ঘরের মাঝের জায়গাটায় অন্ধকারে বসে রইল। বীরেনের শয্যাত্যাগের পরে সুরমা যখন শুতে গেল তখন তার আশু কর্মপদ্ধতি শেষ বিবরণ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। কোথাও সে থামবে না। অনেক সে সহ্য করেছে। আর নয়। অপরা নারীর হাতে এই চরম অপমান সে নিঃশব্দে মেনে নেবে না।

কে এই মেয়ে?

*

"কে?"

শোভনতার সকল প্রশ্ন বিসর্জন দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হোলো।

কলকাতার চীনা উপকণ্ঠ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। সে নিদ্রা ভঙ্গ করা মাও-ৎসে-টুঙের সাধ্যাতীত। সারা দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় সে নিদ্রার আয়োজন করেছে। সে আয়োজনে সাহায্য করেছে অপরিমেয় অহিফেন। আমরা যে দোকানটায় বসেছিলেম তার মালিক দোকানের দরজাটা বন্ধ করে কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিল। আমাদের টেবলের তলায় বাক্সটা খুলে রেখেছিল—আমাদের যখন যা দরকার হয় যেন ওর ঘুম না ভাঙিয়ে নিজেরাই নিতে পারি। ওর এক্সাইস লাইসেন্স নেই। তাই লোকে ওর ওখানে বিশ্বাস করে যায়, ও-ও একটু চেনা হয়ে গেলেই কাউকে আর অবিশ্বাস করে না। ঘুমুতে যাবার আগে কী একটা চীনা প্রবাদ উদ্ধৃত করে আমাকে বুঝিয়েছিল যে অবিশ্বাস করে অশান্তি পাওয়ার চাইতে বিশ্বাস করে ঠকেও শান্তি। মানুষের এমন কার্য নেই যা কোনো না কোনো প্রবাদ দিয়ে সমর্থন না করা যায়।

সুরমা দীর্ঘ বর্ণনার পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি প্রতিশ্রুতি মতো একবারও বাধা দিইনি। আমি শুধু শুনছিলেম। সুরমা যা বলছিল। আর সুরমা যা বলছিল না।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সুরমা বলল, "ঠিক কে, সেইটেই এখনো জানিনে। ঠিকানাটা জেনেছি, কোন পথে যেতে হয় তাও জানি। চলুন। বের করিগে আমার সতীনকে। সতীদাহ আইনবিরুদ্ধ, সতীনদাহ নয়।" সুরমার ম্লান পরিহাসে হাসি ছাড়া সব কিছু ছিল।

সুরমা শাড়ি থেকে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে গ্লাসটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। আমার দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির উল্লেখ করে সুরমাকে বললেম, "অনুমতি করেন তো আমি বাড়ি যাব। আর ঘণ্টা চারেক পরে আমার দমদম গিয়ে প্লেন ধরতে হবে।"

আসল কথা, বীরেন-সুরমা নাটকের কলহপর্বে অংশ গ্রহণ করতে

আমার বিন্দুমাত্র অভিলাষ ছিল না। আমি অনুমান করেছিলেম যে সুরমার সন্দেহটা অন্তত অংশত অমূলক। কিন্তু কে জানে? সত্যি হয়তো বীরেনের বরানগরে কেউ আছেন। মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিবাহিত পুরুষের অপরা নারীতে আসক্ত হওয়া আর যাই হোক অভূতপূর্ব নয়। গল্পেও পড়েছি। জীবনেও যে কখনো দেখিনি, এমন নয়। কে বলবে বীরেনের তা হয়নি?

কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টানা কেন? আমি কাল উত্তর ভারতে ছিলেম, আগামী কাল—আগামী কাল কেন?—আজই, রাত যে এখন দুটো, আর ঘণ্টা কয়েক পরে—থাকব দক্ষিণ বর্মায়। একদিনের জন্যে কলকাতায়। থাক, কাজ নেই বীরেনের সঙ্গে দেখা করে। ওদের ভাবনা ওরা ভাববে। আমি নিজেকে বাঙলা দেশ থেকে নির্বাসিত করে নিয়েছি, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থাই আমার ভালো। বীরেন আমার বন্ধু ছিল। সুরমার সঙ্গে আমার কয়েক ঘণ্টার মাত্র পরিচয়। আমার অধিকারই বা কী আর দরকারই বা কী এদের ব্যাপারে জড়িত হবার?

সুরমা আমার আপত্তি কানেই তুলল না। বলল, “চলুন, বিমলের বাড়ি থেকে আপনার জিনিস পত্তর তুলে নিই গে। তারপর বরানগর হয়ে আপনাকে দমদমে তুলে দিয়ে আসব।” হেসে যোগ করল, “আর কী আশা করেন বন্ধুপত্নীর কাছে?”

আমি বললেম, “না, না, তা নয়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক, অনেক ধন্যবাদ।”

দোকানীর ঘুম না ভাঙিয়ে সব কিছুর দাম রেখে দিলেম টেবলের উপর। আস্তে বেরিয়ে এসে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেম। নিশ্চয়ই এমন কোনো চীনা প্রবাদ আছে যাতে দরজা বন্ধ না করবার বিধান আছে।

রাস্তার অন্ধকারে এসে সুরমা আমায় বলল, “আপনার রাত্রির ঘুমটা মাটি করলুম বলে ক্ষমা চাইব না।”

“আমি তা চাইনি। কিন্তু কেন বলুন তো?”

“আমার এমন অনেক নিদ্রাহীন রাত কেটেছে আপনার বন্ধুর

একটি কথাও কাউকে বলব না। শুধু সতীনটিকে দেখে আসব। পরে যা হবার হবে।"

বড়ো রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আলো ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ভোর হয়ে আসছিল। তাই পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল না।

একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সুরমা নেমে বলল, "এবারে ওই ডান দিকে। ওই মাঠটা পেরিয়ে ল্যাম্পপোস্টটা ছাড়িয়ে যে ছোটো মন্দিরটা ওটাই। চলুন।"

দু পা এগিয়ে সুরমা ভেঙে পড়ল।

বলল, "এত দূর এসে আর পারছি না। মনে আর অত জোর নেই। কী জানি কী দেখব। কী দেখে কী কাণ্ড করে ফেলব। শেষে লজ্জার সীমা থাকবে না। হয়তো অপমানের শোধ নিতে গিয়ে আরো অপমানের বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরব। তার চেয়ে, প্লীজ, আপনি একা গিয়ে দেখে আসুন। ওদিকের জানালাটা খোলা আছে দেখছি, ভিতরেও আলো জ্বলছে। আপনি বরং চুপিচুপি জানালাটা দিয়ে দেখে আসুন। ওরা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটুও টের পাবে না। প্লীজ্। কিচ্ছু বলবেন না। শুধু দেখে এসে আমায় বলবেন কী দেখলেন। আর কাউকে নয়।"

কৌতূহল আমার কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু এ কী অন্যায় অনুরোধ? যদি ওরা জেগে থাকে? যদি আমার পায়ের শব্দ শুনে চোর বলে চেঁচিয়ে ওঠে?

সুরমা খালি বলছিল, "প্লীজ্। আর তো দ্বিতীয় অনুরোধ করব না আপনার কাছে। প্লীজ—"

যেতেই হোলো।

দেখতে কিছু অসুবিধা ছিল না। পাঁচ পাঁচটা প্রদীপ জ্বলছিল। কারো টের পাবারও সম্ভাবনা ছিল না। বীরেন সে অবস্থায় ভূমিকম্প হলেও জানতো কিনা সন্দেহ।

এ দৃশ্য আমি বর্ণনা করতে পারব না।

আমি দূর থেকে হাত নেড়ে সুরমাকে আসতে বললেম। দুয়েক বার আপত্তি জানিয়ে সুরমা আস্তে আস্তে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। সুরমা আর আমি এক সঙ্গে দেখলেম।

ঘরে বীরেন ছাড়া আর কেউ ছিল না। চাদর গায়ে সে পদ্মাসনে সোজা হয়ে বসেছিল কালীমূর্তির সামনে। প্রদীপের আলোয় কালী-দেবীর প্রশস্ত নয়ন আর প্রসারিত জিহ্বা জ্বলজ্বল করছিল। যেন জীবন্ত। বীরেনের ধ্যানমগ্ন আননে যে প্রগাঢ় প্রশান্তির তন্ময়তা ছিল তা আলোয় আরো উজ্বল হয়ে উঠেছিল।

হয়তো মোহ। হয়তো নয়। কিন্তু প্রশান্তিটা প্রত্যক্ষ।

সুরমার চোখে জল ঝরছিল।

আমাদের কারোই কিছু বলবার শক্তি ছিল না। বীরেনের ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটাবার ভয়ে যেমন নিঃশব্দ পদক্ষেপে আমরা ওখানে গিয়েছিলেম, তেমনি নিঃশব্দে চলে এলেম।

দু'জনের একজনেও একটি কথাও না বলে দমদম এয়ারপোর্টে এসে দেখি আমার প্লেন ছাড়তে আর দেরি নেই। সুরমা চোখ মুছে নিয়েছিল, কিন্তু তার অশ্রুধৌত মুখখানি থেকে বেদনা তখনো মিলিয়ে যায়নি।

আমি বিদায় নেবার আগে কোনো হাসির গল্প মনে করতে চেষ্টা করলেম। কিন্তু মনে এলো না। আমি শুধু ভাবছিলেম বীরেনের বিবর্তনের কথা। বুদ্ধি থেকে, বিচার থেকে, বিদায় নিয়ে ভক্তির কোলে ঘুমিয়ে পড়া। সংসারের জটিলতায় শ্রান্ত হয়ে সংসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্যলোকে শান্তির সন্ধান।

হৃদয়ের কাছে মস্তিষ্কের এই পরাজয় পূর্বেও একাধিকবার দেখেছি; আমার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বুদ্ধি এই ক্লীব নতিস্বীকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আশা করেছিলেম, বীরেন অন্তত আমায় নিরাশ করবে না। সুরমাকে আমার এ নৈরাশ্য বোঝাতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম, সে পুরুতের মেয়ে। এখন তার ঈর্ষার অবসান হয়েছে। এখন শুধু সুরমার সুখটুকু

বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যেই চেষ্টিত হাসির সঙ্গে বললেম, "দেখলেন তো? মিছেই এত কষ্ট পেয়েছিলেন। নিবারণ পুরুতের কন্যার গৃহে আবার ঠাকুরঘর হবে, আবার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার সুরমা দেবী পূজারিণী হবেন। সহপূজারী হবে বীরেন চ্যাটার্জি, আই সি. এস."

সুরমা আমার বর্ণনায় একটুও না হেসে একেবারে অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "নিবারণ পুরুতের মেয়ে মরে গেছে। আমার ঠাকুর ঠাকুরঘরে থাকবেন। তিনি আমার শোবার ঘরে আসতে চাইলে তাকে ঠিক তেমনি নির্দয়ভাবে বের করে দেব, যেমন দিতুম অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে।"

আমার তখন 'নমস্কার' ছাড়া আর কিছু বলবার সময় ছিল না।

অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৫৯॥